মেজর ডালিম

বাংলাদেশের ইতিহাসের না বলা সত্যকে জানুন

ডালিম বলছি...

অসীম শ্রদ্ধা এবং প্রত্যয়ের সাথে এই ওয়েব সাইট বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের তাদেরকেই উৎসর্গ করলাম; যারা স্বাধীনতা, সত্য, ন্যায় এবং অধিকারের জন্য সংগ্রাম করার সাহস রাখবেন।

বাংলাদেশ এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হলেও পুরো সত্য এখনো উদঘাটিত হয়নি। যারা প্রথম থেকেই ভারতীয় নীল নকশা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং শেখ মুজিবের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা তেমন কঠিন ছিল না যে দেশের সার্বিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে চরম পরিণতির দিকেই ধাবিত হবে। কিন্তু যারা শেখ মুজিবের উপর অগাধ বিশ্বাস রেখেছিলেন তাদের পক্ষে তেমনটি যে ঘটবেই সেটা মেনে নেয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

শেখ মুজিব সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেটাও ছিল অসাধারণ। সমভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিও ছিল অত্যন্ত জটিল। সেদিক থেকে বিচার করলে এই ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বেরিয়ে আসা প্রত্যেকটি ইস্যুই বিশদ বিশ্লেষনের দাবিদার। আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব ছিলেন অতি জনপ্রিয় একজন কাংখিত নেতা কিন্তু স্বাধীনতাত্তোরকালে তিনিই হয়ে উঠেন জনধিকৃত নিকৃষ্টতম এক স্বৈরাচারী শাসক। তার এই দুই বিপরীত চরিত্রের মাঝে রয়েছে এক হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র। শেখ মুজিবের এই চারিত্রিক দ্বৈততাকে এক সূত্রে বেধেঁছিল কোন একটি বিশেষ তাড়নায় –
রাজনীতি? আদর্শ? ভীতি? হীনমন্যতা? আত্মম্ভরিতা? উচ্চাভিলাস? পাঠক বিষয়টিকে কিভাবে দেখবেন তার উপরেই নির্ভর করবে এর জবাব। ওয়েব সাইটের বিষয়বস্তুগুলো ঐ সমস্ত লোকদের জীবন থেকে নেয়া যারা শুধুমাত্র নিস্ক্রিয় নিরব দর্শক ছিলেন না। তারা সবাই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা। তখনকার ঘটনাপ্রবাহ এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতির সাথেও তারা ছিলেন স্বাভাবিক কারণে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই যুক্তিঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশ সম্পর্কে কর্তৃত্বের সাথে কথা বলার অধিকার রয়েছে তাদের। জনগণের একাংশের মাঝে ঐ সমস্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে অস্বচ্ছতা রয়েছে তা দূর করার জন্য অনেক শ্রদ্ধেয়, পদস্থ, প্রতিষ্ঠিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বক্তব্য এবং মতামতও এই ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। পাঠকের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে এই ওয়েব সাইট প্রকাশ করা হয়নি। এর মূল লক্ষ্য হল পাঠকদের জন্য কিছু চিন্তার খোরাক যোগানো। তথ্যবহুল ঘটনাসমূহের আলোকে তারা যেন সত্যকে খুঁজে নিতে পারেন।

পাকিস্তানের রাজনীতির পরিণাম - স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং আমাদের সিদ্ধান্ত

জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের চুড়ান্ত পর্যায়েই শুরু হয়েছিল ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ

এ অঘটন এড়ানো সম্ভব ছিল।
পাকিস্তানের মত একটি বহুজাতিক দেশের জন্য শুরু থেকেই প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন জাতিসত্বার এলিট শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে একটি কার্যকরী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল এবং পরিকল্পনা নির্ধারনের জন্য যে সহযোগিতা অতি আবশ্যক ছিল তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নে বর্নিত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল জাতীয় পরিসরে :-

১. সব জাতীয় এলিট শ্রেণীর সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিত্বকারী সরকার কায়েম করা।
২. বিভিন্ন জাতিসত্বার মধ্যে ঐক্যমত্য এবং একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
৩. সর্বক্ষেত্রে একতা ভিত্তিক সহজলভ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
৪. জাতির লক্ষ্য এবং আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন জাতিসত্বার এলিট শ্রেণীর জনগণকে অনুপ্রানিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করা।
৫. যে কোন বিচ্ছিন্নবাদী প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া; বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয় এবং তা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই।
৬. অর্থনৈতিক সুবিধাদি যাতে জনগণ পর্যন্ত পৌঁছে তা নিশ্চিত করা। আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নের সুফল সমভাবে যাতে সব জাতিগোষ্ঠিই উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। জাতীয় এলিট শ্রেণীগুলো কর্তৃক বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির জনগণের মাঝে জাতীয় সম্পদ ও সুবিধাদির সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।

এ ধরণের কৌশল এবং পরিকল্পনা সব সমস্যার সমাধান অবশ্যই ছিল না, কিন্তু এর ফলে আশা করা যেত জাতীয় রাজনৈতিক অবকাঠামোতে বর্জনের পরিবর্তে ঐক্যের মাধ্যমে বহুজাতিক দেশের অখন্ডতা বজিয়ে রাখা।

ধারণা করা চলে, ন্যায্য অধিকার পাবার জন্য বিভিন্ন জাতিসত্বার জনগোষ্ঠি কিছুকাল হয়তো বা প্রলম্বিত শিল্পায়নের পরিকল্পনা এবং স্তিমিত আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকেও মেনে নিত। যে কোন ব্যক্তির পক্ষে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজে দরিদ্র হয়ে থাকাটা সহনীয় হয় তখনই যখন তার পড়শীরা সমাজে অর্জিত ধন-সম্পদের বড়াই করার সুযোগ না পায়। একটি দেশ উন্নত হতে পারে শুধুমাত্র ঐক্যের ভিত্তিতে। বৈষম্য এবং বিভক্তি এক অথবা একাধিক জাতিগত রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠিরই হয় সমূহ ক্ষতি।

এ জন্যই বহুজাতিক একটি দেশের এলিট শ্রেণীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা অপরিহার্য হয়ে দাড়ায় শ্রেণী স্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থ দু'টোই বজিয়ে রাখার জন্য। কোন এক বিশেষ পর্যায়ে তারা অবশ্যই নিজ নিজ জাতি স্বার্থে একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারেন। কিন্তু কোনক্রমেই তাদের একে অপরের সহাশক্তি ও বোঝাপড়ার ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। তেমনটি হলে বিচ্ছিন্নবাদের বিপদসংকুল একতরফা রাস্তা অবশ্যই খুলে যাবে।

তথাকথিত ইসলাম ও ইসলামিক রাষ্ট্রের ধ্বজাধারী পাঞ্জাবী-মোহাজের নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকার শুরু থেকেই বাঙ্গালীদের নিঃস্ব, হীনমনা এবং পশ্চাদমূখী জনগোষ্ঠি হিসাবে গন্য করে আসছিলেন। তারা মনে করতেন বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি পশ্চিম পাকিস্তানের উপর একটি বোঝাস্বরূপ। তারা বিশ্বাস করতেন পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে বাঙ্গালীর জাতিগত চেতনা এবং তাদের হিন্দুয়ানী মনোভাব সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

যাই হোক না কেন, এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে আইয়ূব খানের প্রণীত অর্থনীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প উদ্যোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐ সমস্ত উদীয়মান শিল্প উদ্যোগীরা সরকারি মদদ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠা পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ যারা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তাদের সাথে হাত মেলান। সমস্তস বাঙ্গালী শিল্পপতিরা ইম্পোর্ট লাইসেন্স এবং বৈদেশিক মুদ্রার কোটা বাড়াবার জন্য ঐ আন্দোলনকে কেন্দ্রের উপর চাপ প্রয়োগকারী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন। শেষ পর্যায়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন শ্রেণীকে একক একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী এলিট শাসক শ্রেণী অসঙ্গতভাবে তাদের বাঙ্গালী দোসরদের হীনমন্য, পশ্চাদমূখী এবং হিন্দু মনোভাবাপন্ন বলে চিহ্নিত করেন। এই ধরণের মনোভাব বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তদপুরি শেখ মুজিবের বিচার দেশের নাজুক ঐক্যের উপর হানে চরম আঘাত। এখানে আবারও উল্লেখ করতে হয় মুজিবের ৬ দফায় কোন নতুন কিছু ছিল না। অতীতে বহুবার এ ধরণের দাবিসমূহ বাঙ্গালী সাংসদগন কেন্দ্রীয় সংসদে উত্থাপন করেছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্রের ঘোষণার সময়টি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ন। এ ঘোষণাটি করা হয় এমন এক সময় যখন সারা দেশ জুড়ে এক জটিল রাজনৈতিক সমস্যা বিরাজমান। দেশ জুড়ে জনগণ তখন আইয়ূব শাহীর নিষ্পেষন এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

আইয়ূব শাহী আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের কোন প্রচেষ্টাতো করেইনি বরং পাঞ্জাবী-মোহাজের এলিট শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থকে লালন করে তাদের আধিপত্যকে আরো সুসংহত করে তোলে। সামরিক শাসনকালে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে বাঙ্গালীদের প্রতিনিধিত্ব একরকম ছিলনা বললেই চলে। ষাটের দশকে যখন বাঙ্গালীদের ধৈর্য্যের বাধঁ প্রায় ভেঙ্গে পড়ছিল ঠিক তখনই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক বাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রুশক্তি ভারতের দালাল হিসাবে আখ্যায়িত করার ফলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। বাংলাভাষী জনগণ যারা দ্ব্যার্থহীনভাবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন তারা পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠির কাছ থেকে এ ধরণের ব্যবহার কখনোই প্রত্যাশা করেনি। পাকিস্তানের সৃষ্টিতে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। এ সত্যটিই অতি সহজে ভুলে গিয়েছিলেন পশ্চিমা শাসকগন। যদিও বাহ্যিকভাবে মুজিবের দাবিগুলো ছিল চরম প্রকৃতির। পাকিস্তান তখনও ছিল অতিপ্রিয় প্রতিটি বাঙ্গালীর কাছে। বাঙ্গালী জনগণ শুধু চেয়েছিল রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মত প্রকাশের ন্যায্য অধিকার। তারা চেয়েছিল সাম্য ও সংহতির উপর একটি রাজনৈতিক কাঠামো।

তারা চাইছিল স্বৈরাচারী একনায়কত্বের পরিবর্তে একটি গণতান্ত্রিক সরকার। স্বৈরাচারী একনায়কত্ব তাদের অতীতের হিন্দু আধিপত্য ও অত্যাচার এবং ঔপনিবেশিক শোষণকেই জোরালোভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিল। এ থেকে এটাই পরিষ্কারভাবে বলা চলে, বাঙ্গালীরা সুচিন্তিত কতগুলো লক্ষ্যের বাস্তবায়নের জন্যই মূলতঃ সংগ্রাম করছিল। কোন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করার জন্য নয়। এটা জোর দিয়েই বলা চলে যে, আইয়ূব শাহীর পতনকালে পূর্ব পাকিস্তনের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা মোটেই অবধারিত পরিণতি ছিল না। জাতীয় রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বাঙ্গালীদের অংশদারিত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে ক্ষমতাধর শাসকচক্র বাঙ্গালী এলিট শ্রেণীকে জনগণের আন্দোলনের প্রতিই ঠেলে দিয়েছিল এবং তাদের নৃতাত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বৈষম্যকে পুর্নঃজীবিত

করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে বাধ্য করেছিল জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে। এ থেকে পরিশেষে এটাই বলা চলে যে অসম উন্নয়নই বাধ্য করেছিল বাঙ্গালী এলিট শ্রেণীকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিবর্তে বাঙ্গালীত্বকে উস্কে দিতে।

বাঙ্গালীত্বের চেতনাই তখন আঠারমত বাঙ্গালী এলিট শ্রেণীকে জনগণের সাথে এক অটুট বন্ধনে বেধেঁছিল। অসম উন্নয়ন, শোষণ, বঞ্চনা, এবং নৃতাত্বিক চেতনা ঐ ধরণের লোভী জোঁক যা একে অপরকে শুষে বেচে থাকে সেই সময় অব্দি যখন সশস্ত্র সংঘাত অথবা গণঅভ্যুত্থানের বিকল্প কোন পথই খোলা থাকে না। দুঃখজনক হলেও সত্য পাকিস্তানও ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে পৌঁছে অপরিহার্য এক মহা বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছিল ষাটের দশকের শেষে। অন্তিম অবস্থায় সামরিক জান্তা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বন্দুকের জোরে করার সিদ্ধান্ত নেয়। শুরু হয় ২৫-২৬শে মার্চ ১৯৭১ এর আর্মি ক্র্যাকডাউন। পাকিস্তান সেনা বাহিনী বাঙ্গালীদের আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য বর্বরোচিত সশস্ত্র অভিযান শুরু করে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে। এভাবেই অনিবার্য হয়ে উঠে দেশ বিভক্তি।

পাকিস্তান ১৯৪৭-১৯৭১

১৯৭১ এর মুক্তি সংগ্রাম পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহ।

পাকিস্তানের গঠন প্রকৃতিটিই ছিল কিছুটা অস্বাভাবিক। ভৌগোলিকভাবে এই দেশের দুই অংশের মধ্যে ১০০০ মাইল এর ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছিল ভারত। গৃ-তাত্বিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা এবং আর্থ-সামাজিক দিক দিয়েও এই দুই অংশের মাঝে ছিল বড় ধরনের ব্যবধান। এই সমস্ত ব্যবধানগুলো ক্রমশঃ বেড়ে যায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠিদের ছলে-বলে, কৌশলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নীতি গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি অন্যায়ভাবে গায়ের জোরে অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে চায় যাতে করে রাজনৈতিকভাবে পুরো দেশের উপর তাদের প্রাধান্য বজিয়ে রাখা সম্ভব হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে শোষণ কায়েম রাখা যায়।

পাকিস্তান সৃষ্টির জন্মলগ্নেই সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে যখন ১৯৪৮ সালে জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গর্ভণর জেনারেল হিসেবে ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা দেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিবাদ জানানো হয় বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠির পক্ষ থেকে যা পরবর্তিকালে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। এরপর ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় রক্তের বিনিময়ে পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার দৃঢ়তা ব্যক্ত করেন। যার ফলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ইউনাইটেড ফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতাসীনরা এদের হাতে ক্ষমতা দিতে নারাজ হয়ে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা চালায়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। একের পর এক সরকারের পতন ঘটানোর তামাশা শুরু করা হয় অতি চতুরতার সাথে; যার অজুহাতে পরে ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ূব খান ক্ষমতা দখল করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন।

ষাটের দশকের ঘটনাবলী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয় যে, পূর্ণ সায়ত্ব শাসন অর্জন করা ছাড়া আর অন্যকোন উপায়েই তারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্টা করতে পারবে না। সবক্ষেত্রেই পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের উপর চলতে থাকে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠিদের অবারিত শোষণের ফলে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চাদভূমি হিসেবে দেউলিয়া হয়ে পরে পূর্ব পাকিস্তান।

১৯৬১-৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রচন্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

১৯৬৬ সালে সায়ত্বশাসন এবং ন্যায্য অধিকার অর্জন করার জন্য শেখ মুজিবর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগ তাদের ৬ দফা প্রোগাম পেশ করে। এতে জাতীয়তাবাদী চেতনায় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। ৬ দফা ছিল পাকিস্তানের অবকাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ সায়ত্বশাসনের অধিকার আদায়ের দাবি। এতে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠি আতংকিত হয়ে উঠে শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাথে জড়িত কর দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবন্দী করে। কিন্তু বাংলাদেশের সিংহপুরুষ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সারা দেশব্যাপী এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন যার ফলে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আইয়ূব সরকার তাকে ও তার সহকর্মীদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মার্চ মাসে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম দুই অংশেই আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনের চাপে জেনারেল আইয়ূব ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে জাতীয় এবং প্রাদেশিক নির্বাচন করান। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক সরকার গঠনের দাবিদার হয়ে উঠে। কিন্তু সামরিক জান্তা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ধূর্ত রাজনৈতিক নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর যোগসাজসে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফন্দি-ফিকির করতে থাকেন। তাদের এ ধরনের কুটকৌশলের জবাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে ১৯৭১ এর ৩রা মার্চ থেকে। ২রা মার্চ পূর্ব বাংলার ছাত্র ও যুব সমাজের পক্ষ থেকে আসম আব্দুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। তার এই উদ্যোগের জন্য শেখ মুজিব জনাব রবকে তিরষ্কার করেছিলেন। এর চাক্ষুষ সাক্ষী আজো অনেকেই বেচেঁ আছেন। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেন শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনার ফলে শেখ মুজিব ক্ষুদ্ধ হন এবং সভাশেষে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘোষিত হয়েছিল সভাশেষে গণমিছিলের নেতৃত্ব দেবেন শেখ মুজিব। ৭ই মার্চ রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে তার বহুল প্রচারিত বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এবারের সংগ্রাম- আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম- আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।" কিন্তু বক্তৃতা শেষ করার সময় তিনি ঘোষণা দেন, "জয় বাংলা, জয় পাঞ্জাব, জয় সিন্ধু, জয় বেলুচিস্তান, জয় সীমান্ত প্রদেশ এবং জয় পাকিস্তান।" তার ঐ বক্তৃতা পরদিন সবক'টি দৈনিক পত্রিকাতেই ছাপানো হয়। অবশেষে ক্ষমতা হস্তান্তরের সব আলোচনাই যখন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তখন সামরিক জান্তা অস্ত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের উপর ২৫-২৬শে মার্চ ১৯৭১ এর কালোরাতে। চালানো হয় পাশবিক শ্বেত সন্ত্রাস।

ছয় দফা

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ম্যানিফেষ্টো।

৬ দফা :

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।
সংশোধিত: সরকারের চরিত্র হবে ফেডারেল এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক। জাতীয় এবং ফেডারেটিং ইউনিটসমূহতে প্রত্যক্ষ গণভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে ফেডারেল সংসদে প্রতিনিধিত্ব করা হবে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুইটি বিষয় থাকিবে। প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট বিষয়সমূহ স্টেট বা প্রদেশসমূহের হাতে থাকিবে।

৩. পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দুইটি পৃথক অথচ বিনিময় যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকিবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার না হইতে পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।
সংশোধিত: ফেডারেল সরকার শুধুমাত্র পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং নিম্মে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে মুদ্রা সম্পর্কিত বিষয়াদির জন্য দায়ী থাকিবেন। বিষয়গুলো হল:-
ক) দুই উইং এর জন্য দুইটি ভিন্ন কিন্তু পরিবর্তনশীল মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করতে হইবে অথবা
১। সারা দেশের জন্য একটি মুদ্রা ব্যবস্থাও রাখা যাইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক আইন প্রবর্তন করিতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ ও অর্থ পাচাঁর হইতে না পারে।
খ) আলাদা ব্যাংকিং রিজার্ভ সৃষ্টি করিতে হইবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য; আলাদাভাবে আর্থিক এবং আয়-ব্যয় এবং হিসাব-নিকাশের ক্ষমতা থাকিবে পূর্ব পাকিস্তানের।
১। দুইটি ভিন্ন কিন্তু পরিবর্তশীল মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন করা প্রতিটি অংশে কিংবা অঞ্চলের জন্য অথবা একটি মুদ্রা ব্যবস্থাই চালু থাকিবে তবে কেন্দ্রিয় রিজার্ভ ব্যাংকিং সিষ্টেমের ভিতর আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক সৃষ্টি করিতে হইবে এবং এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে যাতে এক অঞ্চলের সম্পদ কিংবা অর্থ অন্য অঞ্চলে পাচাঁর করা সম্ভব না হয়।

৪. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রেভিনিউর একটি অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের মূলধন হইবে।
সংশোধিত: আর্থিক লেনদেন, আয়-ব্যয় এবং পরিকল্পনা হইবে ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর। ফেডারেটিং ইউনিটগুলো কেন্দ্রিয় সরকারকে বরাদ্দকৃত অর্থের যোগান দিবে প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক কর্মকান্ডের জন্য। দেশের সংবিধানে নির্ধারিত বরাদ্দ আয় কেন্দ্র পাইবে যথাযথভাবে নির্ধারিত অনুপাতে। সংবিধানে এমন বিধান নির্ধারন করা হইবে যাতে কেন্দ্রিয় সরকার ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ পায় যাতে করে ফেডারেল ইউনিটগুলোর আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতিগুলোর উপর ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রন রক্ষা করা সম্ভব হয়।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আদায়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে। এইসব অর্থ আঞ্চলিক সরকারের এখতিয়ারে থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল সমানভাবে দিবে অথবা সংবিধানের নির্ধারিত হারে আদায় হইবে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানি-রপ্তানীর অধিকার আঞ্চলিক সরকারের থাকিবে।
সংশোধিত: বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সব হিসাব প্রতিটি ফেডারেটিং ইউনিটের নিয়ন্ত্রনে পৃথক পৃথক ভাবে রাখার বিধান সংবিধানে রাখা হইবে। কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা প্রতিটি ফেডারেটিং ইউনিট কি অনুপাতে প্রদান করে সেটা সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত থাকিবে। দেশের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারনের দায়িত্ব হবে কেন্দ্রিয় সরকারের। কিন্তু সেই নীতির আওতায় আঞ্চলিক সরকারগুলো বর্হিবাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সর্ম্পকে সরাসরি আলোচনা এবং চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে সেই বিধানও সংবিধানে থাকতে হইবে।

৬. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠন করা হইবে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে।
সংশোধিত: জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ফেডারেটিং ইউনিটগুলো নিজস্ব মিলিশিয়া অথবা প্যারামিলিটারী ফোর্স গঠন করিতে পারিবে।

পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারনের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটেছিল ৬ দফায়। ৬ দফার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল কিভাবে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করেছিল। যাই হউক তবুও বলতে হয় ৬ দফার ঘোষণার সময়টা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পরই ৬ দফা ঘোষিত হয়। সামরিক চুক্তি থাকা সত্বেও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা পাকিস্তান সরকারের মনঃপুত ছিল না। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান আমেরিকান সরকারকে তার অসন্তুষ্টি জানিয়েছিল তাই নয়; বিকল্প উপায় হিসেবে আইয়ূব খান আমেরিকার শত্রু গণচীনের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

তার এই উদ্যোগকে আমেরিকান সরকার তাদের স্বার্থবিরোধী বলে মনে করে। তাই আইয়ূবের ঔদ্ধত্বের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য আমেরিকা আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা দিতে থাকে। এই চক্রান্তে মদদ যোগাবার জন্য যারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিদগ্ধ হারুণ পরিবারের আলফা ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ভাতাপ্রাপ্ত সদস্য শেখ মুজিব ছিলেন অন্যতম। ঐ চক্রান্তের ফসল হিসেবেই বেরিয়ে আসে ৬ দফা। যদিও বলা হয়ে থাকে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি এবং অর্থনীতিবিদ যথা: ডঃ কামাল হোসেন, ডঃ রেহমান সোবহান, ডঃ নুরুল ইসলাম, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখরাই ছিলেন ৬ দফার জন্মদাতা। কিন্তু যে সত্যটি কখনোই প্রকাশ করা হয়নি সেটা হলো ৬ দফা প্রণয়নে আমেরিকার কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মদদপুষ্ট হয়ে এই ৬ দফা দাবি প্রণয়নে কাজ করেছিলেন। ৬ দফা পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার জন্য নয় শুধুমাত্র আইয়ূব খানকে তার বেয়াদবীর উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যই প্রণিত হয়েছিল। পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করতে কখনো কাউকে কোনরূপ সাহায্য আমেরিকা করেনি কারণ তারা কখনোই পাকিস্তান দ্বি-খন্ডিত হোক সেটা চায়নি। এ ব্যাপারে তৎকালীন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জে ফারল্যান্ড পরিষ্কারভাবে মুজিবকে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক অবমূশ্যতা থেকে একচ্ছত্র নেতায় পরিণতঃ
৬ দফা দাবির বর্হিপ্রকাশ ঘটার আগ পর্যন্ত শেখ মুজিবের ভূমিকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।
১৯৫৪ সালে রাজনীতিতে এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়ে মুজিব আকস্মিকভাবে রাজনীতিতে আলোচ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। হক-ভাসানীর যুক্তফ্রন্টের সংসদ অধিবেশন চলাকালে হঠাৎ করে শেখ মুজিব তার গুন্ডাপান্ডা নিয়ে অতর্কিতে অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করে হৈ চৈ শুরু করে লাঠিবাজী

এবং চেয়ার-টেবিল ছোড়াছুড়ি করে অধিবেশন পন্ড করে দেয়। ঐ তান্ডবলীলায় সংসদের স্পীকার মারা যান গুরুতররূপে আহত হয়ে। এই অপকর্মের নেপথ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ছিল। এই ঘটনা পরবর্তিকালে আইয়ূব খানকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার বিলুপ্ত করে সামরিক শাসন জারি করতে সুযোগ করে দেয়। ৬ দফায় কেন্দ্রিয় সরকার দেশদ্রোহিতার গন্ধ পায়। তাদের ধারনা হয় ৬ দফা দেশকে দ্বি-খন্ডিত করারই একটা কুটকৌশল। যদিও ৬ দফা ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির সনদপত্র। ৬ দফায় পরবর্তিকালে বর্ণিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রিয় শাসকদের দ্বারা কী ধরনের শোষণ চালানো হচ্ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই। যা হোক, শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের বেশকিছু শীর্ষস্থানীয় নেতাদের জড়িত করা হয় বিখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়'; যদিও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিব কিংবা তার দলীয় নেতারা কেউই জড়িত ছিলেন না। নেতাদের গ্রেফতারের ফলে ৬ দফা আন্দোলনে ভাটা পড়ে। সেই ক্রান্তিলগ্নে আবারও অগ্রণীর ভূমিকায় এগিয়ে আসে জাগ্রত ছাত্রসমাজ। বাংলার সিংহপুরুষ মাওলানা ভাসানীর পৃষ্ঠপোষকতায় তারা গঠন করেছিল 'ইউনাইটেড এ্যাকশান কমিটি' এবং এর নেতৃত্বে ১১ দফার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলে দেশব্যাপী এক দুর্বার গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। ১১ দফা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কারণ এর মূল বিষয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের দাবি। সারা পূর্ব পাকিস্তানে ১১ দফাকে কেন্দ্র করে সরকার বিরোধী আন্দোলনের যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রচন্ডতায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল আওয়ামী লীগের ৬ দফা। মাওলানা ভাসানী এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার জন্য সামরিক শাসকরা শেখ মুজিব এবং তার দলীয় নেতাদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তি পেয়ে রেসকোর্সে এক বিশাল জনসভায় মুজিব তার ভাষণে বলেছিলেন, "জেল থেকে মুক্তি পাবার পর আমি দেখলাম আওয়ামী লীগের ৬ দফা ছাত্রদের ১১ দফায় বিলীন হয়ে গেছে।"

জনগণের চাপে মুক্ত হয়ে মুজিব নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন। তিনি নিজেকে পেলেন সমগ্র বাংলাদেশী জনগণের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে। কিন্তু এমনটি হওয়ার পেছনে তার নিজস্ব কোন অবদান ছিল না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নেতারা সবাই সবকালে চলেছেন পেছনে কিন্তু জনগণ কখনোই কোন ক্রান্তিলগ্নে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা যার আবর্তে জাতি আজও ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই সময় জাতি উন্মুখ হয়ে উঠেছিল স্বাধিকার ও সায়ত্বশাসন পাওয়ার জন্য। তারা হয়ে উঠেছিল অস্থির, ধৈর্যহারা এবং বিষ্ফোরন্মুখ। কিন্তু তাদের প্রত্যাশাকে বাস্তবায়িত করার মত আস্থাভাজন কোন জাতীয় নেতা ছিল না সামনে। বিষ্ফোরন্মুখ জাতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নিঃস্বার্থ চরিত্রের পরিক্ষিত একজন বিচক্ষণ নেতার প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল বিকল্পহীন। মাওলানা ভাসানী ছিলেন তেমন মাপের একমাত্র নেতা। কিন্তু বয়সের ভারে তিনি তখন অনেকটাই দুর্বল। নেতা হিসেবে তাকে জনগণ অবশ্যই জেনে এসেছে আপোষহীন বৃহত্তর গরীব জনগোষ্ঠির বন্ধু হিসেবে। তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞতারও অভাব ছিল না। কিন্তু তার ছিল না সংগঠনভিত্তিক শক্তি। এ কারণেই এই বর্ষিয়ান নেতার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না গণআন্দোলনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আন্দোলনকে ক্রমান্বয়ে বিপ্লবে রূপান্তরিত করে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চরম বিজয় অর্জন করা তার পক্ষে শ্রদ্ধার ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেও এটা কার্যকরী করা তখন তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দৈবক্রমে শেখ মুজিবকে রাতারাতি এক কিংবদন্তির নায়কে পরিণত করেছিল। ভাসানীর সক্ষমতার মাওলানা নিজেই সবচেয়ে বেশি বুঝতেন তাই তারই আহ্বানে দেশের জনগণ মুজিবকেই একচ্ছত্র নেতা হিসেবে তখন গ্রহণ করে নিয়েছিল একান্ত বাধ্য হয়ে কোন বিকল্প না থাকায়।

স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তা করেছিলেন মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও। কিন্তু শেখ মুজিব কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কথা চিন্তা করেননি। তিনি স্বায়ত্বশাসনের দাবি জানিয়েছিলেন মাত্র।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ধারা বিবরণী খবরের কাগজে প্রকাশিত করতে থাকে আইয়ুব-মোনেম চক্র। তারা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী মুসলমানদের ভারত বিরোধী মনোভাবকে তাদের স্বার্থে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন, মানুষ যখন জানতে পারবে শেখ মুজিব ভারতের দালাল হয়ে পাকিস্তানের অখন্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখন তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। কিন্তু পরিণাম হল সম্পূর্ণ উল্টোটাই। প্রকাশিত ধারা বিবরণীর মধ্যেই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠল আইয়ুব-মোনেম চক্রের ঘৃণ্য চক্রান্ত। এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলাকে তখন বাঙ্গালীরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলেই ধরে নেয়। ফলে সারা বাংলার মানুষ আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে রুদ্র আক্রোশে ফেটে পড়ল। এখানে আবারও উল্লেখ করতে হয় যে, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানেও মুখ্য এবং অগ্রণী ভূমিকা ছিল ছাত্র সমাজের। তারা ইতিমধ্যেই সংগ্রামকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামে রূপ দেবার লক্ষ্যে ১১ দফার ভিত্তিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। ১১ দফার ভেতরেই বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রকৃত রূপ ফুটে উঠে। ১১ দফার ভিত্তিতেই বাংলার মাটিতে ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের জোয়ার এক প্রচন্ড রূপ ধারণ করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবিঃ

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘ দিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শাসন শোষনের নিপীড়নে অতিষ্ট ছাত্র-জনতা আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন। আমরা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফা দাবিতে ব্যাপক ছাত্র গণআন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি -

১। ক) স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আইএ, আইএসসি, আইকম ও বিএ, বিএসসি, বিকম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এমএ ও এমকম ক্লাশ চালু করিতে হইবে।

ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার ৫০ ভাগ সরকারি সাবসিডি হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

চ) হল ও হোস্টেলের সমস্যা সমাধান করিতে হইবে।

ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষ বর্ষেও ক্লাশ লইতে হইবে।

ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের কন্ডেন্স কোর্সের সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিষ্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আইইআর ছাত্রদের ১০ দফা, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এমবিএ ছাত্রদের, ও আইন ছাত্রদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা ফ্যাকাল্টি করিতে হইবে।

ড) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের কন্ডেন্স কোর্সের দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ঢ) ট্রেনে, স্টীমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের আইডেন্টিটি কার্ড দেখাইয়া শতকরা ৫০ ভাগ কন্সেসনে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকেটেও এইরূপ সুবিধা দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলেও বাস যাতায়াতে ৫০% কন্সেসন দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুলে ও কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধা সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের ৫০% কন্সেসন দিতে হইবে।

ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ন বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্বশাসন দিতে হইবে।

থ) শাসক গোষ্ঠির শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামান্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ন বাতিল এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হবে।

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পুর্ন স্বায়ত্বশাসন দিতে হইবে।

ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ। এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতির প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সংগে সংগে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বর্হিবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বর্হিবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মান ও নৌ বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন প্রদানকরতঃ সাব ফেডারেশন গঠন।

৫। ব্যাংক, বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ ভারী শিল্প জাতীয়করন করিতে হইবে।

৬। কৃষকদের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋন মওকুফ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মনপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারন ও আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কায়দা-কানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রন ও জন সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা ও আন্যান্য নির্যাতনমুলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বর্হিভূত স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে ।

ইতিহাস বিকৃতির প্রথম পদক্ষেপ আওয়ামী লীগই গ্রহণ করে

শেখ মুজিবের নির্দেশেই মেজর জিয়া তার ঐতিহাসিক ঘোষণা দেয় এ দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ আষাঢ়ে গল্পের উপস্থাপন করে।

সেই লোমহর্ষক ক্রান্তিলগ্নে নেমে আসে ২৫-২৬শে মার্চের সেই কালোরাত্রি। পাকিস্তান সেনা বাহিনী নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙ্গালী জাতিকে শায়েস্তা করার জন্য। ২৫শে মার্চের বর্বরতা আধুনিককালের সব নজীরকেই ছাড়িয়ে যায়। হাজার হাজার নারী, পুরুষ, শিশুকে হত্যা করা হয় নির্বিচারে। সামরিক বাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বাঙ্গালী সদস্যগণও রেহাই পাননি শ্বেত সন্ত্রাসের হত্যাযজ্ঞ থেকে। ঢাকা, চিটাগাং এবং খুলনাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই অভিযান চালানো হয়। নিষ্ঠুর অভিযান। প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয় বাঙ্গালী জাতি। জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে অনেক অনুরোধ ও আকুতি জানানো হয় শেখ মুজিবকে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য। কিন্তু সব অনুরোধ উপেক্ষা করে জাতিকে মৃত্যু ও অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে কাপুরুষের মতই তিনি কারাবরণ করে চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে। আত্মরক্ষার জন্যই অনন্যোপায় হয়েই শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়। প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দানে অসম্মত শেখ মুজিব বলেছিলেন, "আমি গণতন্ত্রের রাজনীতি সারাজীবন করেছি, অস্ত্রের রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না।"

এ কি পরিহাস! সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যার কথায় বিশ্বাস করে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, তাকে মেনে নিয়েছে একমাত্র নেতা হিসাবে; দীর্ঘ সংগ্রামে চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে নির্দ্বিধায়; সে নেতাই ক্রান্তিলগ্নে জাতিকে পিছে ফেলে রেখে খোঁড়া যুক্তি তুলে বহাল তবিয়তে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমালেন। ক্ষনিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল বাঙ্গালী জাতি। মুজিবের সুবিধাবাদী আচরনে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিল মুক্তিকামী জনতা। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য মাত্র। আওয়ামী লীগের নেতারাও সব যার যার মত গা ঢাকা দিলেন প্রাণ বাচাঁবার প্রচেষ্টায়। মুজিব গ্রেফতার হওয়ার সাথে তারাও পালিয়ে হাফ্ ছেড়ে বাচঁলেন। এ অবস্থায় জনগণকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রতিরোধ সংগ্রামের দায়িত্ব নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হয়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠে। গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাংলাদেশে। এ অবস্থায় ২৬শে মার্চ রাতে চিটাগাং এ অবস্থিত অষ্টম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক অখ্যাত তরুণ মেজর জিয়াউর রহমান তার তরুণ বাঙ্গালী সহকর্মীদের পরামর্শ ও সহচার্যে তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেতার মাধ্যমে জাতির প্রতি আহ্বান জানান স্বাধীনতা সংগ্রামের। তার আহ্বানে আশার আলো দেখতে পেয়েছিল জাতি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তিকালে স্বাধীনতার লক্ষ্যে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তি সংগ্রাম।

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসে মেজর জিয়াউর রহমানের ক্ষীন কন্ঠ, **"Under circumstances however, I hereby declare myself as the Provisional Head of the Swadhin Bangla Liberation Government."** অবশ্য পরবর্তী ঘোষণায় এর সাথে যোগ করা হয়, **"Under guidance of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman."** স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে সেই সময় চুলচেরা বিশ্লেষন করার ফুরসৎ কারও ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ কালুরঘাট থেকে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা সর্ম্পকে সরকার ও আওয়ামী লীগের তরফ থেকে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি কাহিনী প্রচার করা হয়।

প্রথম গল্পটি ছিল: ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে গ্রেফতারের পূর্বক্ষণে চট্টগ্রামের জহুর আহ্মদ চৌধুরীকে টেলিফোনে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীটি পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু সামরিক

অভিযানের প্রাক্কালে সকল প্রকার টেলিফোন যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। অতএব ঐ গল্প ধোপে টিকেনি।

দ্বিতীয় গল্পে বলা হয়: ওয়্যারলেসের মাধ্যমে (?) চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থানরত একটি অষ্ট্রেলিয় জাহাজের ক্যাপ্টেনকে স্বাধীনতার ঘোষণা জানানো হয়। ঐ ক্যাপ্টেন নাকি জনাব জহুর আহ্মদকে শেখ মুজিবের সেই ঘোষণা বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন! চট্টগ্রামের কোন নোঙ্গর করা জাহাজের সাথে ঢাকায় বসে ওয়্যারলেস সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা কোনভাবেই তখন সম্ভব ছিল না। কারণ ঐ সময় চট্টগ্রাম বন্দরে ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈনিকদের সাথে পাক বাহিনীর লড়াই চলছিল। তাছাড়া ঢাকার ওয়্যারলেস সেন্টারসহ সবগুলো যোগাযোগ কেন্দ্র তখন পুরো মাত্রায় খানসেনাদের অধিনে। সুতরাং এ গল্পও সারহীন প্রমানিত হয়।

শেষ গল্পে বলা হয়: চট্টগ্রাম ইপিআর-কে জানানো হয়েছিল সারা দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা বা বাণী প্রচারের জন্য। 'স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস' নামক প্রকাশনায় এই কাহিনীটিই নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

কিন্তু একটুখানি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষন করলেই বুঝা যায় এ কাহিনীটিও আষাঢ়ে গল্প মাত্র।
প্রথমত: ঢাকার সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যথা:- টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ঢাকা বেতার, ওয়্যারলেস সমস্তই তখন সম্পূর্ণরূপে পাক বাহিনীর নিয়ন্ত্রনে। এবার দেখা যাক ঢাকা ইপিআর এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম ইপিআর-কে নির্দেশ পাঠানোর প্রশ্নটি। ঢাকা ইপিআর যদি শেখ মুজিবের নির্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রাম পৌঁছাতে পারে তাহলে ঢাকা ইপিআর-থেকেইতো সারা বাংলাদেশে ঐ ঘোষণা প্রচার করার জন্য বলা যেত! তাছাড়া সবারই জানা ছিল ঢাকা ইপিআর-এর হেডকোয়ার্টার এবং পিলখানা সিগন্যাল সেন্টার ২৩শে মার্চেই আর্মি দখল করে নিয়েছিল। তারপরও কথা থাকে। চট্টগ্রামের ইপিআর-এর দায়িত্বে ছিলেন তখন বাঙ্গালী তরুণ অফিসার ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম। যে সমস্ত বাঙ্গালী অফিসারদের সাথে একত্র হয়ে মেজর জিয়াউর রহমান ২৬শে মার্চ রাতে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন রফিক ছিলেন অন্যতম। পরবর্তী পর্যায়ে ১নং সেক্টরে তিনি যুদ্ধ করেন। স্বাধীনতার পর তাকে হঠাৎ করে সেনা বাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের উপর ক্যাপ্টেন রফিক একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী ঢাকা থেকে পাবার ব্যাপারে কিছু লেখেননি। কেন? সর্বোপরি স্বাধীনতার ঘোষণা সত্যি সত্যি ঢাকা থেকে পাঠানো হয়ে থাকতো সেই ক্ষেত্রে মেজর জিয়া তার প্রথম ভাষণে নিজেকে অস্থায়ী সরকার প্রধান হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন কোন যুক্তিতে? তারপরও প্রশ্ন থাকে। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন আরেক নেতা আবদুল হান্নান যিনি ৩০ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে একাধিকবার বক্তব্য প্রচার করেছেন, তিনিই বা কেন তার প্রচারণায় একবারও উল্লেখ করলেন না স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী ঢাকা থেকে পাবার কথা? অতএব, ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াই যে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এই ধ্রুব সত্যকে শত চেষ্টা করেও কোন যুক্তি দিয়েই খন্ডানো সম্ভব নয়।

মহা পলায়ন

লেঃ মতি, সেকেন্ড লেঃ নূর এবং আমি সর্বপ্রথম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি।

জাতীয় রাজনীতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমি তখন কোয়েটায় ১৬ ডিভিশনের ৬২ ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্টে পোস্টেড। আমার আবাস কিংস রোডের আর্টিলারী অফিসার্স মেসে। আমি ছাড়াও তখন কোয়েটাতে বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার বিভিন্ন রেজিমেন্ট ও ব্যাটালিয়নে পোস্টেড ছিলেন। কর্নেল দস্তগীর জিওয়ান ডিভ হেডকোয়ার্টার্স, মেজর হাফিজ ৬২ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ক্যাপ্টেন শহীদ ৩৩ ক্যেভারলী, ক্যাপ্টেন শরফুল ৩৩ ক্যেভারলী, ক্যাপ্টেন মহ্সীন বেলুচ রেজিমেন্ট, মেজর মালেক বি এম, মেজর কাদের ইঞ্জিনিয়ার্স, ক্যাপ্টেন মাওলা ইএমই ব্যাটালিয়ন, ক্যাপ্টেন আমছা আমিন ইনফ্যানট্রি স্কুল, ক্যাপ্টেন জাকের, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন শাফায়াত, লেফটেন্যান্ট হারুণ ২৬ ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্ট, ক্যাপ্টেন ইফতেখার, ক্যাপ্টেন মাজহার উদ্দিন মোল্লা, লেফটেন্যান্ট কে বি ৬৩ ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্ট, ক্যাপ্টেন জামাল এএমসি, ক্যাপ্টেন কাসেম এএসসি প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক জেসিও, এনসিও ও জোয়ান ভাইরা স্কুল অফ ইনফ্যানট্রি এন্ড ট্যাকটিকস, ইএমই ব্যাটালিয়ন, সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, ডিভ হেডকোয়ার্টার্স, ষ্টাফ কলেজ এবং ৩৩ ক্যেভারলী রেজিমেন্টে।

কোয়েটায় বাঙ্গালীদের ছোট পরিবার ছিল একটি সুখী পরিবার। আমরা সবাই মিলেমিশে হাসি আনন্দে কাটাতাম দিনগুলো। প্রায়ই আমরা সমবেত হতাম কোথাও না কোথাও। চলতো আলাপ-আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা, গল্প-গুজব। জাতীয় সংকট আমাদের মাঝের ব্যবধানকে কমিয়ে আনলো আরো। সবাই দেশ সম্পর্কে সচেতন, সবাই শংকিত। ভাবনায় আকুল, কি হচ্ছে? ঘটনা প্রবাহের পরিণাম কি? প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ক্ষমতা লিপ্সা কোথায় নিয়ে যাবে দেশটাকে? পাকিস্তান টিকে থাকবে কি করে? অন্যায়, অবিচার, শাসন-শোষণ শেষ হবে কবে? আইয়ুব খানের প্রশাসন র্ব্যথ হয়েছে সম্পূর্ণরূপে। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে তিনি কি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেবেন আলোচনার মাধ্যমে? নাকি ক্ষমতার মোহে দেশকে আরো রসাতলে টেনে নিয়ে যাবেন? গোপনে আমরা মিলিত হই বিভিন্ন জায়গায়। আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে পেতে চাই এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব। খবরা-খবরের আদান-প্রদান হয় নিজেদের মধ্যে। প্রতিটি নতুন খবর পর্যালোচনা করি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। খবর পাই দেশ থেকে আসা চিঠিপত্রের মাধ্যমে। মনযোগ দিয়ে শুনি বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা, অল ইন্ডিয়া রেডিও, ভয়েস অফ অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি। জাতীয় রেডিও এবং টিভি মাধ্যমের প্রচারিত খবর একপেশে হওয়ায় বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। মাঝে মধ্যে সিগন্যালস্ সেন্টারের বাঙ্গালী ভাইরা নিয়ে আসে জিএইচকিউ থেকে প্রেরিত গোপন বার্তাসমূহের সারবস্তু। এ থেকে শাসকচক্রের মন মানসিকতা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সেটাই বা কতটুকু। পূর্ব পাকিস্তানের গণআন্দোলনের প্রতি মুহূর্তের ঘটনাবলী জানার জন্য মন উদগ্রীব হয়ে থাকে তীর্থের কাকের মত। দেড় হাজার মাইল দূরত্বে বসে সীমিত মাধ্যমে ঘটনা প্রবাহের যতটুকু খবরা-খবরই পাচ্ছিলাম, তার চুলচেরা বিশ্লেষন করে অবস্থার সাথে নিজেদের যতটুকু সম্ভব সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করছিলাম আমরা। কিন্তু সবকিছুই করতে হচ্ছিল বিশেষ সতর্কতার সাথে। মনের দাহ ও আক্রোশ অতি কষ্টে চেপে রেখে স্বাভাবিকভাবে দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম সবাই। নিজেদের সংযত রেখে ধৈর্য্য সহকারে অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে সবাইকে; এ সিদ্ধান্তই গৃহিত হয় গোপন বৈঠকগুলোতে। আশা-নিরাশার এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তায় কাটছিল আমাদের প্রতিটা মুহূর্ত।

মার্চের ৩০ তারিখে আমরা বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা, অল ইন্ডিয়া রেডিও, রেডিও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ষ্টেশনগুলো থেকে প্রচারিত নিবন্ধ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটা ২৫-২৬শে মার্চ রাতের ঘটনা

ও পরবর্তী দিনগুলোর ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি। বাংলাদেশে ফেলে আসা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজনদের অবস্থা ভেবে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে মন। পাকিস্তান সরকার ও সেনা বাহিনীর ন্যাক্কারজনক আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। সেই সেনা বাহিনীতেই চাকুরী করছি বলে নিজের প্রতি আত্মধিক্কার জাগে মনে। ভাবি, এ অবস্থায় প্রবাসে বসে আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই? বাঙ্গালীদের ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের কি কোন দায়িত্বই নেই? সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রাখার জন্য আকুল হয়ে উঠে মন। অস্বস্তিকর পরিবেশে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় সময় কাটতে থাকে আমাদের।

ইতিমধ্যে আমাদের কোর্সও প্রায় শেষ হচ্ছে। কোর্সে আগত বাঙ্গালী অফিসারদের মধ্যে ক্যাপ্টেন তাহের, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট নূর চৌধুরী এবং লেফটেন্যান্ট মতির সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। চিন্ত-ভাবনার মিলই ছিল আমাদের এই ঘনিষ্ঠতার প্রধান কারণ। আমি লোকাল অফিসার। এরা প্রায়ই আমার মেসে আসত। দল বেধে আনন্দ-ফুর্তি করে আমরা অবসর কাটাতাম। একসাথে খাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, সিনেমা দেখা, ক্লাবে আড্ডা মারা ছিল আমাদের বিনোদনের উপায়। লেফটেন্যান্ট সুমিও প্রায়ই আমাদের সাথে যোগ দিত। আমরা একত্রিত হয়ে আনন্দ-ফুর্তি করতাম ঠিকই কিন্তু তার ফাঁকে আলোচনা চলত বাংলাদেশ নিয়ে। সবারই একই চিন্তা। আমাদের কিছু একটা করা উচিত। মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করে নির্বিকার হয়ে বসে থাকলে চলবে না। জাতীয় সংগ্রামে আমাদের সাধ্যমত অবদান রাখতে হবে। কিন্তু কি করা সম্ভব! ইতিমধ্যে জানতে পারলাম আমাদের ১৬ ডিভিশনকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হবে। অত্যন্ত সুখবর! ডিভিশন গেলে আমিও ইউনিটের সাথে পূর্ব পাকিস্তানে যেতে পারব। খবরটা পেয়ে তাহের, নূর, মতি এবং সুমি সবাই খুশি। কোর্স শেষ হল। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ আদেশ জারি করলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত কোন অফিসারকে তাদের ইউনিটে ফেরত পাঠানো হবে না। তাদের সবাইকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ইউনিটে পোষ্টিং দেয়া হবে। এ কি ব্যাপার! এমনটি তো হবার কথা নয়। আমরা সবাই বিভ্রান্ত হয়ে পরলাম। কোর্স শেষে ইউনিটে ফিরে যাওয়াইতো নিয়ম; তাহলে এ ধরণের আদেশের উদ্দেশ্য কি? তাহের, নূর, মতি সবার ইউনিটই পূর্ব পাকিস্তানে। তারা সবাই আটকা পড়ে গেল। আর আমি ফিরে এলাম ইউনিটে। কিন্তু ইউনিটে যোগদান করেই বুঝতে পারলাম অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবেশও অনেক বদলে গেছে। ইতিমধ্যে দেশে ইমারজেন্সী ঘোষিত হল।

একদিন আমার কমান্ডিং অফিসার কর্নেল মিয়া হাফিজ আমাকে তলব করে পাঠালেন। তার অফিসে যাওয়ার পর তিনি কিছুটা বিব্রতভাবেই বললেন, "শরীফ ব্যাটারি কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমি তোমাকে এ্যাডজুটেন্ট পদে বহাল করতে চাই। দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে আমার ষ্টাফ অফিসার হিসাবে তোমাকেই আমি মনোনীত করেছি।" তার কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার সাথে কর্নেল হাফিজের সম্পর্ক ছিল খুবই ভাল। ব্যাচেলার হ্যাপিগোলাকি টাইপ কমান্ডো কর্নেল হাফিজ আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। আমি তাই সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "স্যার আমি ইউনিটে সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে একজন। সে ক্ষেত্রে আমাকে ব্যাটারি কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নিয়ে জুনিয়র পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? বেচারা কর্নেল হাফিজ মুখ কাচুমাচু করে বললেন, "দেখ, জিএইচকিউ থেকে অর্ডার এসেছে কোন বাঙ্গালী অফিসারকে দায়িত্বপূর্ন কোন পদে রাখা যাবে না। তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় সব বাঙ্গালীদের উপর নজর রাখার নির্দেশও জারি করা হয়েছে। তোমার শুভাকাঙ্খী হিসাবে এই গোপনীয় নির্দেশের কথা তোমাকে বিশ্বাস করে বললাম। আমার অনুরোধ সব বুঝে তুমি চোখ-কান খোলা রেখে সতর্কতার সাথে চলবে। তোমার কোন কিছু হলে ব্যক্তিগতভাবে আমি কষ্ট পাব। বোঝার চেষ্টা কর, নেহায়েত অপারগ হয়েই আমি এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।

তার সিদ্ধান্তে কষ্ট পেলেও তার আন্তরিক স্বীকারোক্তি শুনে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। তার সতর্কবাণী সবাইকে জানাবার জন্য ছুটে গেলাম ক্যাপ্টেন তাহেরের

মেসে। সেখানে ডেকে পাঠালাম নূর এবং মতিকে। সব শুনে সবাই ঠিক করলাম আমাদের সবকিছুই করতে হবে অতি সাবধানে। পশ্চিমারা আমাদের সব বাঙ্গালীকেই অবিশ্বাসের চোখে দেখছে। তাই এতটুকু অসতর্ক হলে আর রক্ষা নাই। মহাবিপদে পড়তে হতে পারে। সিদ্ধান্ত নিলাম স্বাভাবিকতা বজিয়ে চলতে হবে আমাদেরকে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপনে মিলিত হব আমরা। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বস্ত লোক ছাড়া অন্য কারো সাথে আলোচনা করা ঠিক হবে না। কর্নেল মিয়া হাফিজের সাথে আলাপের পর ঠিক বুঝতে পারলাম ইউনিটের সাথে আমার আর বাংলাদেশে যাওয়া হবে না। ঘটনা প্রবাহ এগিয়ে চলল অতি দ্রুতগতিতে। হঠাৎ করে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারসের জিওয়ান বাঙ্গালী অফিসার কর্নেল দস্তগীরকে বদলি করে দেয়া হল জিওয়ান মুজাহিদ কোর হেডকোয়ার্টারস লাহোরে। তার এ বদলিতে আশ্চর্য হয়ে গেল কোয়েটাতে অবস্থিত সব বাঙ্গালী। আমাদের কাছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু অন্যান্য বাঙ্গালীরা অবাক হয়ে গেল তার এ অস্বাভাবিক পোস্টিং এ। ডিভিশনের বাঙ্গালীরা যারা বাংলাদেশে যাবার আশায় উন্মুখ হয়ে ছিলেন তাদের গুড়ে পড়ল বালি। আমি ও নূর একদিন গেলাম কর্নেল দস্তগীরের বাসায়। তার পরিবার তখন বাংলাদেশে। তাকে বললাম,

— স্যার এরপরও কি আমাদের চুপচাপ বসে থাকা যুক্তিসঙ্গত?
— কি করতে চাও? পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি। আমি বললাম,
— দেশের সংগ্রামে অবদান রাখার চেষ্টা করতে হবে যেভাবেই হোক।
— পাগল হয়েছ? দেড় হাজার মাইল দূরে বসে কি করতে পার তোমরা?
— পালিয়ে গিয়ে যোগদান করতে পারি স্বাধীনতা সংগ্রামে। নয়ত বেলেলির এ্যামুনিশন ডিপো উড়িয়ে দিতে পারি। এতে করে সমস্ত সামরিক বাহিনীর সেকেন্ড লাইন এ্যামুনিশন ধ্বংস হয়ে যাবে। অপূরনীয় ক্ষতি হবে সামরিক জান্তার। যুদ্ধ করার ক্ষমতাও কমে যাবে অনেকাংশে।
— পাগল নাকি? কি সব অদ্ভুত কথা ভাবছ? ইমোশনাল হয়ে এ ধরণের পদক্ষেপ নিলে তোমরা তোমাদের জন্যই শুধু বিপদ ডেকে আনবে না, বিপদ ডেকে আনবে পশ্চিম পাকিস্তানের সব বাঙ্গালীর জন্য। অবাস্তবব চিন্তধারা।

তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন,

— পাসিং আউট করার দিন শপথ নিয়েছিলে, " To remain loal to the constitution. So be faithful and Prove your integrity."

পরিশেষে তিনি বললেন, তার উপর কড়া নজর আছে; তাই সাবির্ক মঙ্গলের জন্য এভাবে যখন তখন তার সাথে যেন দেখা না করি। কি আশ্চর্য্য! এই দস্তগীর সাহেবকে জানতাম ভীষণভাবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক হিসাবে। তাকে শ্রদ্ধাও করতাম সে কারণে। কিন্তু একি! আজ তার মুখ থেকে একি শুনছি! মুহূর্তে মনটা বিষিয়ে উঠলো, নূরকে বললাম,-চলো যাওয়া যাক। বেরিয়ে আসছিলাম। তিনি বললেন,

— **Don't be so sentimental. Even if Bangladesh becomes a reality, Preserve yourself, Bangladesh can't go without you and me.**

তার সুবিধাবাদী উক্তি শুনে গা'টা ঘিন্‌ঘিন্ করে উঠল। এ সংসারে সত্যিই মানুষ চেনা দায়! বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে আমি ও নূর ফিরে এলাম। এরপর যেদিন তিনি লাহোরের পথে যাত্রা করছিলেন সেদিনও তাকে আকুল মিনতি জানিয়েছিলাম, "স্যার এখনও সময় আছে। আপনার মত বিচক্ষণ সিনিয়র অফিসারের প্রয়োজন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। আপনি রাজি থাকলে আমরা বুকের রক্ত বাজি রেখে আপনাকে সাথে করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি।"
তিনি রাজি হলেন না। রওনা হয়ে গেলেন লাহোরের পথে। ফিরে এলাম হতাশ হয়ে। এবার একাই সিদ্ধান্ত নিলাম বেলেলি ডিপো উড়িয়ে দেবার। কমান্ডো ট্রেনিং ছিল আমার। **Sympathetic Detonation** এর মাধ্যমে **Explosive** দিয়ে **Sabotage** করে উড়িয়ে দেব ডিপো। তখন আমার বিশেষ এক বন্ধু ছিল ডিপোর চার্জে। তার ওখানে যাওয়া-আসার মাধ্যমে সব

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম অতি গোপনে। পাঠান বন্ধুটি বাঙ্গালীদের প্রতি ছিল বেশ সহানুভূতিশীল। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটা **Trace** তৈরি করে ফেললাম। **Trace** টা নিয়ে একদিন গেলাম ইঞ্জিনিয়ার্স এর মেজর কাদেরের বাসায়। উদ্দেশ্য তাকে দিয়ে পরখ করিয়ে নেব আমার **Trace** টা ঠিক হয়েছে কিনা। তাকে গিয়ে সব কথা খুলে বলে তার সাহায্য প্রার্থনা করলাম। আমার প্ল্যান শুনে তিনি ভীষণভাবে আতঁকে উঠলেন। বললেন, "কি সাংঘাতিক! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ডালিম? তুমি কি বুঝতে পারছো না কি করতে যাচ্ছ তুমি? তোমার প্ল্যান কার্যকরী করলে প্রায় কোয়েটা শহরটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাতে আমরাও ধ্বংস হয়ে যেতে পারি। তাছাড়া তোমার এ কাজ অত্যন্ত ঝুকিঁপূর্ণ। আমি এ ব্যাপারে তোমাকে **Encourage** করতে পারি না। আমার অনুরোধ তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা।" এখানেও হতাশা। ফিরে আসার আগে তাকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমার প্ল্যান সম্পর্কে তিনি যেন অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির সাথে আলাপ না করেন। তিনি রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিদানে আমাকেও কথা দিতে হয়েছিল আমি এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকব। আমি কিন্তু আমার প্ল্যান কার্যকরী করার চেষ্টা করে চলেছিলাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ করেই আমার বন্ধু একদিন বদলি হয়ে পিন্ডি চলে গেল। আমার মাথায় বাজ পড়ল। তার অবর্তমানে ডিপোতে আসা-যাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল ফলে বাধ্য হয়ে আমাকে আমার পরিকল্পনাও বাদ দিতে হল। দুঃখ পেয়েছিলাম অনেক। কিন্তু অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিতে হল। নতুন করে আবার ভাবতে শুরু করলাম কি করা যায়? ঠিক করলাম পালিয়ে গিয়ে যোগ দিব স্বাধীনতা সংগ্রামে। এমন অবস্থায় একদিন নূর এল আমার মেসে। লনে বসে আলাপ করছিলাম দু'জনে। হঠাৎ করেই নূর বলল,

— স্যার, ক্যাপ্টেন তাহের আপনাকে ডেকেছেন। জরুরী আলাপ আছে।

— ঠিক আছে। আজ রাতে আমরা একসাথে তার মেসে ডিনার করব।

নূর চলে গেল। কি এমন জরুরী আলাপের জন্য ক্যাপ্টেন তাহের ডেকে পাঠিয়েছেন ভেবে কোন কুল কিনারাই পেলাম না। সন্ধ্যার পর গিয়ে হাজির হলাম তার মেসে। নূর ইতিমধ্যেই এসে গেছে। ডিনারের আগে তার রুমে বসে গান শুনছিলাম। গানের আওয়াজের আড়ালে নিচু গলায় আমরা আলাপ শুরু করলাম। কোন ভণিতা ছাড়াই ক্যাপ্টেন তাহের বলল,

— ডালিম, আমি ও নূর পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি চমন বর্ডার দিয়ে আফগানিস্তানে। সেখান থেকে বাংলাদেশ। আকবর বথ্তির ছেলেদের সাথে তোমার বন্ধুত্ব আছে। তাছাড়া তুমি স্থানীয় অফিসার। এ ব্যাপারে আমরা তোমার সাহায্য চাই।

স্বল্পভাষী ক্যাপ্টেন তাহেরের অনুরোধের জবাবে বললাম,

— স্যার আমিও পালাবার চেষ্টা করছি। ক্যাপ্টেন তাহের আমার জবাব শুনে খুব খুশি হলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

— তাহলে তুমি সময় নষ্ট না করে যেভাবেই হোক বর্ডারটা একবার রেকি (**Recce**) করে আস।

আমি সম্মতি জানিয়ে ফিরে এলাম মেসে। আমরা তিনজনে কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমাদের এ পরিকল্পনা সম্পর্কে কাউকেই কিছু বলা চলবে না। সুযোগমত একদিন **Regimental Exercise Area Reece** করার উছিলায় ইউনিটের গাড়ি নিয়ে প্রফুল্লচিত্তে (**Reece**) করে ফিরে এলাম। বন্ধুরা আমাদের পালাতে সাহায্য করবে জানতে পেরে নূর ও তাহের দু'জনেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠল। এভাবে সব যখন প্রায় ঠিকঠাক হঠাৎ করে একদিন সিগন্যাল কোরের হাবিলদার নাজির রাতের অন্ধকারে আমার সাথে দেখা করতে এল। লোকাল বাঙ্গালী অফিসার হিসাবে সবার সাথেই আমার যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে জুনিয়রদের মধ্যে আমার একটা বিশেষ প্রভাব ছিল। নাজিরের মত সিনিয়র, জুনিয়র অনেকেই তাদের সমস্যাদি নিয়ে আমার কাছে আসতো সুখ-দুঃখের কথা কইতে এবং আমার পরামর্শ নিতে। ভাবলাম, নাজিরও নিশ্চয়ই তেমন কোন ব্যাপারেই আলাপ করতে এসেছে। কিন্তু তাকে দেখেই আতঁকে উঠলাম। তার মুখ ভীষণভাবে থমথম করছিল। চোখ দু'টোও টলটল করছিল। তাকে

দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম ভীষণ কিছু ঘটেছে। আমি তাকে নিয়ে সোজা আমার ঘরে চলে গেলাম।

— কি হয়েছে নাজির? এত গম্ভীর কেন?

জবাবে নাজির অতি নিচুস্বরে বলল,

— স্যার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ডিভ-কমান্ডার **GHQ**-তে **Cipher Message** এর মাধ্যমে জানিয়েছেন ২৯ **EME Battalion** এর ৩জন **Junior Commission Officer (JCO)** এবং ২জন **Non-Commission Officer (NCO)** চমন হয়ে আফগানিস্তানে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

খবর শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল। নাজিরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিয়ে ছুটে গেলাম ক্যাপ্টেন তাহেরের মেসে। ডেকে পাঠানো হল লেফটেন্যান্ট নূরকে। গভীর রাত অব্দি আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল চমন বর্ডার দিয়ে পালানোর প্রচেষ্টা হবে অত্যন্ত বিপদজনক। তাই এই পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। অন্য পথ হিসাবে আমাদের সামনে খোলা থাকলো কাশ্মীর, লাহোর, শিয়ালকোট কিংবা ভাওয়ালপুর সেক্টর। ভাওয়ালপুর সেক্টর দিয়ে রাজস্থানের মরুভূমি পাড়ি দিতে সময় লাগবে দুই থেকে তিন দিন। অন্যান্য যে কোন সেক্টর দিয়ে বর্ডার পেরোতে লাগবে ৫ থেকে ৬ দিন। এত সময় পাওয়া যাবে কিভাবে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ভাওয়ালপুর-ভাওয়ালনগর সেক্টরকেই বেছে নিলাম আমরা। এ সেক্টর দিয়ে পালাতে শুধু সময়ই কম লাগবে তা নয় আমাদের ডিভিশনের অপারেশনাল এরিয়া ছিল এই সেক্টর। ফলে প্রয়োজনীয় ইনটেলিজেন্স ইনফর্মেশন সংগ্রহ করাও সহজ হবে। পালাবার পরিকল্পনা করার দায়িত্ব যুক্তিগত কারণেই আবার আমাকেই নিতে হল। শুরু হল আবার এক নতুন পরিকল্পনা। এভাবেই সময় বয়ে যাচ্ছিল।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের এক ছুটির দিনে, দুপুরের খাওয়া শেষ করে মেস থেকে ফিরে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম, হঠাৎ করে দরজায় কড়া নড়ে উঠল। কে জিজ্ঞেস করতেই লেফটেন্যান্ট মতির গলা শুনতে পেলাম। ভেতরে এল মতি। শুকনো মুখ, মলিন চেহারা। চিন্তিত লাগছিল ওকে। জিজ্ঞেস করলাম,

— কি ব্যাপার! হঠাৎ কি মনে করে এলে?

— স্যার কিছুদিন যাবত মানসিক যন্ত্রনায় ভুগছি ভীষণভাবে। অবশেষে আজ মনস্থির করে এসেছি আপনার পরামর্শ নিতে।

— খুব সিরিয়াস ব্যাপার কিছু কি?

— -হ্যাঁ স্যার। মনস্থির করে ফেলেছি। পালাবো। যে করেই হোক পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হবো। চেষ্টা ব্যর্থ হলে যা হবার তা হবে। যে কোন ঝুঁকি নিতে আমি প্রস্তুত। আপনি কি বলেন?

ভালো করে তার মুখের দিকে চেয়ে তার মনের ছবি পড়বার চেষ্টা করলাম। না, তাকে ভীষণ সিরিয়াস মনে হল। কিন্তু আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি আমাদের তিনজনের সিদ্ধান্তের কথা কাউকে বলা যাবে না। তাই সে মুহূর্তে আমাদের চিন্তা-ভাবনার কথা না বলে শুধু বললাম,

— মতি তোমার আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কি করতে পারি?

মতি চুপ করে ভাবছিল কিছু। আমি বেয়ারাকে ডেকে নাস্তার ফরমায়েস দিলাম। নাস্তা এল। মতি তৃপ্তির সাথে খেলো নাস্তা। ওর খাওয়া দেখে বুঝতে পারছিলাম দুপুরের খাওয়া হয়নি তার। হঠাৎ করেই মতি প্রশ্ন করল,

— স্যার সবকিছু সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। এ অবস্থায় আমরা চোখ-কান বন্ধ করে হাত গুটিয়ে শুধু বসে থাকব? আমাদের কি কোন দায়িত্বই নেই?

আপনি কি কিছুই ভাবছেন না? আমি মতির প্রশ্নের তাৎক্ষনিক জবাব না দিয়ে বললাম,

— কাল বিকেলে চায়না ক্যাফেতে ৬টায় এসো; আলাপ হবে বিস্তারিত।

মতি চলে গেল। ও চলে যাবার পর আমি কাপড় পড়ে গাড়ি নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলাম নূরের কাছে। গিয়ে দেখি নূর দিবা নিদ্রা দিচ্ছে। ওকে উঠালাম ঘুম থেকে। প্রথমে নূর কিছুটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

— কি ব্যাপার স্যার হঠাৎ আপনি! এ সময়ে?
— বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি নূর।

তাকে মতির ব্যাপারে সব খুলে বললাম। সব শুনে নূর বলল,
— মতির ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন।
আমি বললাম,
— ওকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়?

নূর কিছুক্ষন চিন্তা করে বলল,
— আমার আপত্তি নেই তবে ক্যাপ্টেন তাহেরের মতামতটা জানা দরকার।
— বেশ তবে চল তার ওখানেই যাওয়া যাক।
— তাই চলুন।

আমার গাড়িতে করেই গেলাম ক্যাপ্টেন তাহেরের ওখানে। তাকে সব কথা খুলে বলে জানালাম তাকে সঙ্গে নিতে আমার এবং নূরের কোন আপত্তি নেই। ক্যাপ্টেন তাহের আমাদের সাথে একমত হয়ে বললেন, ঠিক আছে ও যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে তাকে সঙ্গে নেয়া হোক। ফিরে এলাম; পথে নূরকে নামিয়ে দিয়ে। পরদিন নির্ধারিত সময়ে আমি ও নূর চায়না ক্যাফেতে গেলাম মতির সাথে আলোচনা করতে। গিয়ে দেখি মতি আমাদের পৌঁছার আগেই আমাদের প্রিয় ডিশগুলোর অর্ডার প্লেস করে অপেক্ষা করছে। চায়না ক্যাফে তখন কোয়েটা শহরের একমাত্র চাইনিজ রেস্তোরা। আমাদের বিশেষ পছন্দের আড্ডা মারার জায়গা। একটি চাইনিজ পরিবার বাবা, মা ও মেয়ে মিলে রেস্তোরাটা চালায়। আমরা তাদের পুরনো রেগুলার কাষ্টমার। তাই গেলে বিশেষ খাতির-যত্ন করে। আমরা যোগ দেবার পরপরই খাওয়া শুরু হল। সাথে আলোচনা। আমি প্রথমেই বললাম,
— মতি তোমার গতকালের প্রশ্নের জবাব আজ দিচ্ছি। কোন কারণবশতঃ সেটা কাল দেয়া সম্ভব হয়নি। আমি, নূর এবং ক্যাপ্টেন তাহের পালাবার চেষ্টা করছি বেশ কিছুদিন যাবত। চমন বর্ডার দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু **EME Batalion** এর ঘটনার পর সে পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছে। এখনও চেষ্টা করছি ভাওয়ালপুর-ভাওয়ালনগর হয়ে রাজস্থান বর্ডার ক্রস্ করব। তুমি আমাদের সঙ্গে ইচ্ছে হলে আসতে পার। মতির চোখে মুখে খুশি উপছে পড়লো।
— স্যার, আমি জানতাম আপনি এ সময়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।
— **I am so happy that I can't tell you. I am proud of you Sir.**

আমি পকেট থেকে ছোট্ট একটা কোরআন শরীফ বের করে তার উপর হাত রেখে ওকে শপথ নিতে বললাম। ও কোরআন শরীফের উপর হাত রাখলো। আমি বললাম,
— বলো, আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তিকে কিছু বলা চলবে না, কোন পরিস্থিতিতেই। প্রয়োজনমত তোমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হবে সেটা বিনা প্রশ্নে তুমি পালন করবে। অযাচিতভাবে পরিকল্পনা সম্পর্কে কৌতুহলবশতঃ কোন প্রশ্ন তুমি করতে পারবে না। একে অপরের উপর সম্পুর্ণ বিশ্বাস রেখে সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।

আমার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল মতি। কোন জড়তা নেই। কোন দ্বিধা নেই। এভাবেই শেষ হল আমাদের বৈঠক।

আমার উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সবচেয়ে শর্টকাট এবং গ্রহণযোগ্য পথ খুজে বের করা এবং সে পথের **Operational map sheet** যোগাড় করে তার উপর **Own troops** এবং **Enemy troops position** এবং **Deployment Trace** যোগাড় করা। তাছাড়া কম্পাস, বাইনোকুলার এবং **Personal weapons** যোগাড়ের দায়িত্বও আমাকেই নিতে হয়েছিল লোকাল অফিসার হিসাবে। এর সবগুলোই আমার রেজিমেন্টে বিস্তর রয়েছে কিন্তু **Classified items** হিসাবে **Operational purpose** ছাড়া এগুলো ষ্টোর থেকে বের করার হুকুম নেই। তাই অন্যপথ খুঁজে বের করতে হল। ম্যাপ যোগাড় করার জন্য ঠিক করলাম ইনফ্যানট্রি স্কুলের ইনন্টেলিজেন্স এর বাঙ্গালী হাবিলদার শফিকের সাহায্য নেব। ছেলেটার সাথে কোর্স করার সময় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। কোর্সে বাঙ্গালী হয়েও ভালো রেজাল্ট করায় ও আমাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করত। ক্লাশের ফাকে ফাকে প্রায়ই ওর সাথে দেশ নিয়ে আলাপ হত। ও অনেক কথাই বলত আমাকে আপনজন ভেবে, বিশ্বাস করে। কোর্স করার সময় ও সবসময় আমাকে নানাভাবে সাধ্যমত সহযোগিতা করত অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি ঠিক করেছিলাম, দেখা যাক না চেষ্টা করে ও আমাকে ম্যাপের ব্যাপারে কোন সাহায্য করে কিনা। একদিন ওকে খবর পাঠালাম আমার সাথে দেখা করতে। ও ঠিক এল আমার মেসে। নানা ধরণের আলাপ-আলোচনা হল দেশ সম্পর্কে । এক সময় আমি ওকে বললাম,

— শফিক তোমার কাছে আমি একটি ব্যাপারে সাহায্য চাই। যদি ভরসা দাও তবে বলি।

ও যেন কিছুটা লজ্জা পেল। বলল,

— স্যার আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আমি আপনার কোন কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আপনি নির্দ্বিধায় বলুন কি প্রয়োজন আপনার?

— আমি যা চাইবো সেটা সাধারণ কোন জিনিস নয় শফিক।

বুদ্ধিমান তরুণ শফিক জবাব দিল,

— আপনি আমার কাছে কোন সাধারণ জিনিস চাইবেন না সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। তবুও আপনি বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

ম্যাপ শীটের নম্বরগুলো তাকে লিখে দিয়ে বললাম,

— এগুলো আমার চাই।

ম্যাপ শীট নম্বরগুলো দেখেই বুদ্ধিমান শফিক হয়তোবা আঁচ করতে পেরেছিল আমার উদ্দেশ্য কি? আমার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে চুপ করে বসে থাকলো শফিক। কি যেন পরখ করে খুজে দেখছিল আমার মাঝে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে আমি বললাম,

— হ্যা, আমি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, তাই এ ম্যাপ শীটগুলো আমার প্রয়োজন।

আমার কথা শুনে ও বললো,

— আ-কিন্তু স্যার ...?

— জানি শফিক তাতে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে তোমার শাস্তিও হতে পারে। তাই যা কিছুই করার সিদ্ধান্ত তুমি নেবে সেটা ভেবে চিন্তে স্থিরভাবেই তোমাকে নিতে হবে। এ ঝুঁকি নেবার ব্যাপারে আমার তরফ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে আমার অনুরোধ এ ঝুঁকি তোমার পক্ষে যদি নেয়া সম্ভব না হয় তবে তুমি অন্য কাউকে আজকের আলোচনা সম্পর্কে কিছু বলবে না। আশা করি তুমি এ অনুরোধ রক্ষা করবে।

হাবিলদার শফিক আমার মুখের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। কথা শেষ হতেই সে আমাকে আবেগে জড়িয়ে ধরে বললো,

— স্যার আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি এ বিশ্বাসের অবমাননা জান থাকতে হতে দেব না। কাল বিকেল ৫টায় খোকা বাজারে আমার সাথে আপনি দেখা করবেন। দেখি আমি আপনার জন্য কি করতে পারি।

পরদিন বিকেল ৫টায় আমি খোকা বাজারে নির্দিষ্ট স্থানে হাবিলদার শফিকের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিল চরম উত্তেজনায়। ৫ মিনিট, ১০ মিনিট হয়ে গেল ৫টা বেজে শফিকের দেখা নেই। শফিক কি তবে আসবেনা? কোন অঘটন ঘটলো না তো? নাকি মুখের উপর না বলে আমাকে বিব্রত না করে আজ না এসে বুঝিয়ে দিল এ কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। চুপচাপ দাড়িয়ে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখছিলাম আর নানা ধরণের কথা ভাবছিলাম। ৫টা ২০ হয়ে গেল ভাবলাম শফিক আর আসবে না। চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি হঠাৎ দেখি ত্রস্ত পায়ে শফিক হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে আমার দিকে। বাম হাতে একটি ঝোলা। ডান হাত উঁচু করে আমাকে ইশারায় তার আগমন বার্তা জানাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই লোকের ভীড় ঠেলে ও আমার কাছে এল। ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠলো মন।

— স্যার স্যরি, একটু দেরী হয়ে গেল। ট্যাক্সি পাচ্ছিলাম না।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল শফিক। বললাম,

— চলো কোথাও বসা যাক।

মার্কেটের মধ্যেই সাজ্ঝি কাবাবের দোকানে গিয়ে বসলাম দু'জনে। ইন্টার ইউনিট ম্যাচ ছিল আজ। দারুন খেলা হয়েছে। তারপর ১ ঘন্টা হেভী এক্সারসাইজ করায় বেশ ক্ষিধে পেয়েছিল। আস্ত দু'টো মুরগির সাজ্ঝি সাথে কড়াই কাবাব এবং নান অর্ডার দিয়ে বসলাম দু'জনে। বেয়ারা কাওয়ার পট এবং কাপ রেখে গেল। কোনার দিকে একটি নিরিবিলি জায়গাতে বসেছিলাম আমরা। রেকর্ড প্লেয়ারে জনপ্রিয় ফিল্মিগান বাজছিল। ফলে আমাদের আলাপ করার সুবিধা হল। পাশের টেবিলের লোকরাও আমাদের কথা কিছু শুনতে পাবে না।

— আমিতো প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিছুটা চিন্তিত হয়েও পড়েছিলাম।

— কি কষ্ট করে যে আপনার জিনিস হাসিল করেছি, সে একমাত্র আল্লাহপাকই জানেন। এতে ঝুঁকি আছে প্রচুর। কিন্তু আপনি দেশের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিছু হলেও শান্তনা পাব এই ভেবে যে দেশের স্বাধীনতায় আমিও কিছু অবদান রাখার সুযোগ পেলাম। বলেই আস্তে টেবিলের নীচ দিয়ে সে ঝোলাটি আমার হাতে তুলে দিল।

— আমি তোমার অবদানের কথা সর্বদা স্মরন রাখব শফিক। ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাকে ছোট করব না। তবে একটি কথা জেনে রাখ। ২৫শে মার্চ ন্যাক্কারজনক পাশবিক ঘটনাবলীর পর থেকে দেশ ও স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখার জন্য অনেক কিছুই ভেবেছি এবং অনেক বাঙ্গালীর সাথে আলাপ করেছি। কেউই তোমার মত নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা দেখায়নি। কেউ আমার চিন্তা-ভাবনায় আতঁকে উঠেছেন। কেউ বা রেগে গিয়ে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন। কোয়েটার অনেক বাঙ্গালীর কাছেই আমি ইতিমধ্যে বিপদজনক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছি। অনেকে আমার সাথে সব যোগাযোগ ছিন্ন করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। সে ক্ষেত্রে তোমার এ সাহায্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার এ অবদান সামান্য নয়। যদি সংগ্রামে যোগ দেবার তৌফিক আল্লাহ আমাকে নছীব করেন; দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদি বেঁচে থাকি তবে তোমার নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে থাকবে ভাই, এ ওয়াদা আমি তোমাকে দিলাম।

শফিকের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝড়ছিল। রুমালে চোখ মুছে নিয়ে ধরা গলায় বললো,

— স্যার আমার এ অবদান অতি সামান্য । ইচ্ছে হয় আপনার সাথে আমিও পাড়ি জমাই। কিন্তু আমি ফ্যামিলিম্যান। পরিবার ফেলে কি করে পালিয়ে যাই! আমার এ অক্ষমতা আমাকে পীড়া দেবে সারাজিবন। নিজেকে আমি কখনো ক্ষমা করতে পারবো না স্যার।

— কেন মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছ ভাই। বাংলাদেশের সবার পক্ষে কি যুদ্ধে সরাসরিভাবে যোগ দেয়া সম্ভব হবে? অনেকেই নানাভাবে সংগ্রামে অবদান রাখবেন। তারাও মুক্তিযোদ্ধা। যেমন আজকে তুমি রাখলে এক অমূল্য অবদান। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করবে তাদের অবদানের চেয়ে তোমার এ অবদানের মূল্য কোনক্রমেই কম নয়; সেভাবে তুমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা।

আমার কথায় শফিক নিজেকে সামলে নিল। বেয়ারা ইতিমধ্যেই খাবার পরিবেশন করে গেছে।

— এসো খাওয়া যাক।

দু'জনে তৃপ্তি সহকারে খেলাম। খাওয়া শেষে শফিক বলল,
— আজ আমাদের নাইট ট্রেনিং আছে তাই চলে যেতে হবে। সময় প্রায় হয়ে এল।
— চলো তোমাকে নামিয়ে দেই।
গাড়িতে বসে শফিক বলল,
— স্যার একটি কথা, যদি আমার কিছু হয় তবে আমার পরিবারকে একটু দেখবেন।
— যদি বেঁচে থাকি তাহলে এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। কথা দিলাম।

শফিককে নামিয়ে দিয়ে মেসে ফিরে এসে লনের মাঝখানে ছাতির মত দাড়িয়ে থাকা প্রিয় আখরোট গাছটার নীচে গিয়ে বসলাম। বসন্তের ফুরফুরে বাতাস নানা ধরণের ফুলের সুবাস ছড়াচ্ছিল। গার্ডেন লাইটগুলোর স্বল্প আলোকে ম্লান করে দিয়ে বেশ বড় একটি চাঁদ সামনের মুরদার পাহাড়ের গা ছুঁয়ে উকি দিয়ে হাসছে। মনোরম এক শান্ত পরিবেশ। কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম হাবিলদার শফিক সম্পর্কে।

বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর মালেক তখন পর্যন্ত ব্রিগেড মেজরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার ব্রিগেডের অপারেশনাল এরিয়ার আওতায় পরেছে ভাওয়ালনগর ফোর্ট আব্বাস সেক্টর। ভাওয়ালপুর হয়ে ভাওয়ালনগর। সেখান থেকে ফোর্ট আব্বাসের পথে ছোট ষ্টেশন হারুনাবাদ। হারুনাবাদ থেকেই শুরু করতে হবে আমাদের পদযাত্রা। পাক বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর ডিফেন্স ভেদ করে ২৫ মাইল দুরত্ব অতিক্রম করে আমাদের পৌঁছতে হবে শ্রীকরণপুর। মেজর মালেকের কাছ থেকেই পেতে হবে পাক বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর **Deployment trace.** এতে বিশদভাবে আঁকা থাকে **Top secret up-to-date intelligence information.** যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। ম্যাপ পাবার পরদিনই টেলিফোন করে মেজর মালেককে বললাম জরুরী প্রয়োজনে অবিলম্বে দেখা করতে চাই। অনুমতি নিয়ে তার অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম মতিকে সঙ্গে নিয়ে। অফিসে একাই ছিলেন মেজর মালেক।
দ্বারে উপস্থিত হতেই ভারী গলায় প্রশ্ন রাখলেন,
— কি ব্যাপার ডালিম?
— আপনার নতুন গাড়ি দেখতে এলাম। কেমন চলছে?
অল্প কিছুদিন আগে তিনি একটি **Skoda Sedan Car** কিনেছেন।
— তোমার **Volks Wagon** এর মত শানদার না হলেও **I have no complain.**
— স্যার বাসায় চলেন । লাঞ্চ খাব একসাথে।
— লাঞ্চ খাবে তা বেশতো; তোমার ভাবীকে ফোন করে বলে দাও। **But what is your problem? Have you picked up again on some one?** তা তোমার সাথের ছেলেটিকে তো চিনলাম না?
আমি ইতিমধ্যেই টেলিফোন তুলে নিয়ে রিং করছিলাম,
— হ্যালো ভাবী, ডালিম **here.** আমরা বাসায় আসছি, **Three of us over lunch.** অসুবিধে হবেনা তো?
— কোন দিকে সূর্য উঠলো আজ! এতদিন পর হঠাৎ ভাবীকে মনে করে যেচে লাঞ্চ খেতে চাচ্ছ?
ভাবীর জবাবে একটু লজ্জা পেলাম।
— বিশ্বাস করেন ভাবী, কোর্সের ঝামেলায় এত ব্যস্ত ছিলাম; তাই আসা হয়ে উঠেনি। আমার সময় কি করে কেটেছে সে শুধু আমিই জানি।
— চলে এসো; ভাবী বললেন।
কথোপকথন শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে বললাম,
— **All clear Sir at the home front.** ও হ্যাঁ, **Let me introduce Lieutenant Moti from 3rd East Bengal and Moti this is Major Malek from senior Tiger.**

মতি মেজর মালেকের সাথে হাত মিলিয়ে বললো,

— স্যার আপনার সাথে আগে দেখা হয়নি কিন্তু আপনার কথা অনেক শুনেছি।

আপনার সাথে আগে দেখা হয়নি কিন্তু আপনার কথা অনেক শুনেছি। প্রাণখোলা উচ্ছল প্রকৃতির মেজর মালেক স্মিত হাসলেন।

— **Moti is here for OW-JTC. He has done pretty well in the course.** বললাম আমি।

— **You mean right away!**

কিছুটা আশ্চর্য হলেন মেজর মালেক।

— **That's correct.** এতো চাকুরি করে কি আর হবে স্যার! বললাম আমি।

— চলো তবে।

মেজর মালেক **Buzzer** টিপলেন। পিএ এসে সেল্যুট করে দাড়ালো। তাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে মেজর মালেক তাকে বললেন তিনি অফিসে আজ আর ফিরছেন না। এরপর আমরা বেরিয়ে এলাম অফিস থেকে। বাসায় ফিরে ড্রইং রুমে বসে আলাপ শুরু হলো।

— **Well now tell me what's up?** প্রশ্ন করলেন মেজর মালেক।

— **Sir, the matter is very serious and urgent at the same time confidential** আমরা পালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জবাব দিলাম আমি।

অপ্রত্যাশিত জবাবে কিছুটা চম্‌কে উঠলেন মেজর মালেক। চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। কিচেনে ভাবী রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

— **Just a minute,** বলে উঠে গেলেন মেজর মালেক।

অল্পক্ষণ পর সিগারেট হাতে ফিরে এসে বললেন,

— কি জানো, **my batman is not that reliable.** তাই বেটাকে পাঠিয়ে দিয়ে এলাম ক্যান্টিন থেকে সিগারেট আনতে।

বুঝলাম আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি **Precaution** নেবার জন্যই তিনি এমনটি করেছেন।

— **Now then are you sure?** একরাশ প্রশ্ন তার চোখে।

— জি স্যার। এভাবে আর চাকুরি করার কোন মানে হয় না। নিজের প্রতি ঘৃণা বাড়ছে। আজ আমাদের মত লোকের প্রয়োজন স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্য। **What do you think Sir?** প্রশ্ন রাখলাম আমি।

— **Well you may be right.** কিন্তু সংগ্রাম সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্যইতো আমরা জানতে পারছি না। সে অবস্থায় এ ধরণের পদক্ষেপ নেয়াটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? **Wouldn't it be too risky?**

পাল্টা প্রশ্ন রাখলেন মেজর মালেক।

— আপনার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু যেভাবে এখান থেকে জরুরী ভিত্তিতে **Re-enforcement** পাঠানো হচ্ছে আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে লাশ আসছে তাতে করে এতটুকু নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, সেখানে কিছু একটা ঘটছে। তদপুরি **International media** কি সবটাই মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে বলে মনে করেন আপনি?

জোরালো যুক্তি তুলে ধরলাম আমি।

— **Well then, what can I do for you in this venture of yours?**

জানতে চাইলেন মেজর মালেক।

— আমরা হারুনাবাদ থেকে শ্রীকরণপুর পৌঁছার চেষ্টা করবো। সবদিক বিবেচনা করে এ পথই সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করছি আমরা।

— **Your decision is right.** চমন বর্ডার ছাড়া এটাই সবচেয়ে ভালো পথ নিঃসন্দেহে। এপথে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগবে।

— স্যার, আপনাকে **Operational Trace** করে দিতে হবে।

অনুরোধ জানালাম আমি।

— **Food has been served.**

এ্যাপ্রন পরা ভাবী ন্যাপ্‌কিনে হাত মুছতে মুছতে টেবিলে যাবার অনুরোধ জানালেন। ভাবীর আগমনে পরিবেশটাকে হালকা করে দেবার জন্য হঠাৎ করেই মেজর মালেক কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

— এসো আগে পেট-পুঁজো করা যাক। খালি পেটে ঠিকমত চিন্তাও করা যায় না।

সবাই গিয়ে টেবিলে বসলাম। বাচ্চারা সবাই স্কুলে। খাবার দেখে জিভে পানি এসে গেল। টাটকা মাছের বিভিন্ন ব্যঞ্জন। জিজ্ঞেস করলাম,

— ভাবী **The Great!** এ জিনিসগুলো কোথা থেকে আমদানি করলেন?

জবাবে ভাবি বললেন,

— ওরোখ্ থেকে আজ সকালেই আনিয়েছি।

কোয়েটা শহর থেকে ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট একটি সবুজ উপত্যকা ওরোখ্। একটি পাহাড়ী ঝরনা বয়ে যাচ্ছে উপত্যকার ঠিক মাঝ দিয়ে। বিভিন্ন ফলের গাছ-গাছালিতে ছেয়ে আছে উপত্যকাটা। চারিদিকে ঘিরে আছে পাহাড়ের গায়ে চির-সবুজ বন। আকর্ষনীয় পিক্‌নিক্ স্পট। সেই ঝরনাতেই ট্রাউট এবং অন্যান্য জাতের মাছ পাওয়া যায়। বাঙ্গালীরা সুযোগ পেলেই মাছ আনায় ওরোখ্ থেকে। আমরা **Bachelor Boys** প্রায়ই গাড়ি ভর্তি করে মাছ নিয়ে এসে ইচ্ছেমত যেকোন ভাবীর শরনাপন্ন হই টাটকা মাছ-ভাতের স্বাদ মেটাতে। হৈ চৈ করে তৃপ্তি মিটিয়ে খাওয়া শেষ করে আমরা আবার ড্রইং রুমে এসে বসলাম। খাবার সুযোগে সবকিছু ভেবে নিয়ে আমার অনুরোধের জবাবটা ঠিক করে নিয়েছিলেন মেজর মালেক। সোফায় বসে সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে মেজর মালেক বললেন,

— **Well I admire your courage.** আমি নিশ্চয়ই তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবো। শুধু অনুরোধ এ ব্যাপারটা আমার এবং তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

— **Definitely Sir, we give you our words.**

আমি জবাব দিলাম।

— আমরা যোগাড় করেছি।

মেজর মালেক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাতেই তাড়াতাড়ি বললাম,

— **Not from my Regiment. From elsewhere.**

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাঁফ ছেড়ে যেন বাচঁলেন মেজর মালেক।

— **Then bring them to me tomorrow.** বললেন মেজর মালেক।

— **Not tomorrow.** এখনি **Map-Sheets** গুলো দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, কাল এসে নিয়ে যাবো।

মতিকে পাঠালাম গাড়ি থেকে **Map-Sheets** গুলো নিয়ে আসার জন্য। সেগুলো নিয়ে মতি ফিরে এলো। **Map-Sheets**গুলো পরখ করে মেজর মালেক স্বগোক্তি করলেন,

— **Incredible!** জিনিসগুলো উঠিয়ে নিয়ে কোন গোপন জায়গায় রেখে ফিরে এসে যোগ দিলেন আমাদের সাথে।

— আমরা তবে আজ উঠি স্যার, **Still a lot to be done.**

— বুঝেছি। কি জানো ডালিম, তোমাদের মত দেশপ্রেমিকদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বাধীন হবে নিশ্চয়ই ইনশাল্লাহ্। ইচ্ছে হচ্ছে আমিও তোমাদের সাথে পালিয়ে যাই, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। পরিবারের দায়িত্ব বাধা হয়ে আছে। **How can I leave them and go?**

ভারী গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলছিলেন মেজর মালেক।

— আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। কিন্তু আমাদের সাহায্য করে আপনিতো কম অবদান রাখলেন না স্যার? সেভাবে বিচার করলে আপনিওতো একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমরা বেঁচে থাকলে আপনার এই অবদানের কথা দেশবাসী জানবে। বিশ্বাস করেন স্যার, আপনিই একমাত্র সিনিয়র অফিসার যার কাছ থেকে আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেলাম। বাকি সবাইকে চেনা হয়ে গেছে। **All are paper tigers.** তারা ভিতু, স্বার্থপর। মুখে মুখেই সব বাঙ্গালী এর বেশি কিছু নয়।

আমার কথায় মেজর মালেকের চোখে পানি এসে গিয়েছিল। হৈ হুল্লরবাজ বলে পরিচিত মেজর মালেকের মাঝে সাচ্চা বাঙ্গালী দেশপ্রেমিক মেজর মালেককে খুঁজে পেয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সালাম জানিয়ে উঠে পড়লাম। গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন তিনি। গাড়িতে বসতে যাচ্ছি ঠিক তখন আবেগে আমাকে এবং মতিকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন,

— **I wish you all well boys, take care.** ফিরে এলাম মেসে।

— সত্যি অদ্ভুত লোক মেজর মালেক। বললো মতি।

— আমিও কিন্তু ভাবিনি তার কাছ থেকে ঠিক এতটা সহযোগিতা পাবো। সত্যি পৃথিবীতে মানুষ চেনা দায়; জবাব দিলাম।

আরো কয়েকটি বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর মতি চলে গেল।

লেফটেন্যান্ট সুমি ফিরে যাচ্ছে লাহোর। ভাবলাম ওর কাছ থেকেই চেয়ে নেব **Compass** এবং **Binocular.** যাবার আগের দিন বিদায় নিতে এসেছে সুমি। টকটকে ফরসা **Well Build** সুদর্শন যুবক সুমি। সব সময় মিষ্টি হাসি মুখে লেগেই আছে। সেদিন তাকে খুব মলিন দেখাচ্ছিল।

— সুমি খারাপ লাগছে লাহোর ফিরে যেতে তাই না? জিজ্ঞেস করলাম।

— ঠিক বলেছেন স্যার। আপনাদের সাথে বেশ কেটে যাচ্ছিল সময়গুলো হেসে খেলে। আপনাদের ছেড়ে যেতে মন কিছুতেই চাচ্ছে না। কিন্তু এর বিকল্পওতো কিছু নেই! যেতে তো হবেই। আপনার কথা কখনও ভুলতে পারব না স্যার। আপনি না থাকলে **Life out here would have been hell and most boring.**

— সুমি আজ তোমাকে একটা অনুরোধ করবো, রক্ষা না করতে পারলে কথা দাও এ ব্যাপারে তুমি কাউকে কিছুই বলবে না।

— কি এমন কথা স্যার, যার জন্য এমনিভাবে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন?

সুমির কথায় আন্তরিকতা ফুটে উঠলো। ওকে বিশ্বাস করা চলে।

— আমি পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেব ঠিক করেছি। রাজস্থান বর্ডার দিয়ে ক্রস্ করবো। তোমার **Compass** এবং **Binocular** টা পেলে সুবিধে হয়।

— **Fantastic, great idea.** আমি নিশ্চয়ই দেব **Compass** এবং **Binocular.** কিন্তু আমাকে কি সঙ্গে নিতে পারেন না স্যার? আকুতি ঝড়ে পড়ল ওর অনুরোধে। **I beg of you Sir, please take me along.** আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

— **Well Shumi thanks a lot. I shall remain ever grateful for your help.** কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নেবার ব্যাপারে ঠিক এই মুহূর্তে কোন জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। **I hope you wouldn't mind.** আমাকে একটু ভাববার সময় দিতে হবে।

— **That's fine Sir. Do take your time. But be sure, even if you decide not to take me along for some reason you will get the things which you have asked for.** আমিও কিছুই মনে করবো না। উঠি আজ তাহলে?

— না না সে কি করে সম্ভব! লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, লাঞ্চ করে যাবে তুমি।

বলেই খাবারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলাম বেয়ারাকে ডেকে। খাওয়ার পর সুমি যাবার জন্য বিদায় চাইল। আমি বললাম,

— সন্ধ্যায় মেসে থেকো, আমি আসবো। সম্মতি জানিয়ে চলে গেল সুমি।

সুমি চলে যাবার পর আমিও বেরিয়ে পরলাম। মতি ও নূরকে সঙ্গে করে সোজা ক্যাপ্টেন তাহরের ওখানে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো সুমিকেও সঙ্গে নেয়া হবে। সন্ধ্যার একটু আগেই সুমির ওখানে গিয়ে হাজির হলাম আমি একাই। প্ল্যানিং এই স্টেজে গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যই **Strict compartmentation** মেনে চলা হচ্ছিল। **Need to know basis**-এ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলাম আমরা অতি সতর্কতার সাথে। সুমি আমার অপেক্ষা করছিল। ঘরে ঢুকে দেখি ওর ব্যাটম্যান সবকিছু গোজগাছ করছে। যাত্রার প্রস্তুতি।

— Let's have Chinese.

বলেই গাড়িতে সুমিকে তুলে নিয়ে সোজা চলে গেলাম China Café-তে। খাবার ফাঁকে ফাঁকে আলাপ হচ্ছিল।

— Sir, you said Rjasthan is the sector, is that correct? সুমি জানতে চাইলো।

— That's right. জবাব দিলাম।

— তাহলে আপনার সাথেতো আমার যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। আপনিতো জানেন, I am allergic to sand. বালির স্পর্শে আমার সমস্ত গায়ে চুলকানি শুরু হয়ে যায়। তা এর জন্য আপনার কোন অসুবিধা হোক সেটা আমি চাইনা, তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি I shall stay back. সত্যিইতো এ কথাটা গতকাল আমাদের খেয়ালেই আসেনি।

— I don't want to be a liability. এতে আপনার বিপদও হতে পারে। আমার জন্য আপনার পথে কোন বাধার সৃষ্টি হউক সেটা আমি চাই না। ছল ছল চোখে কথাগুলো বলছিলো সুমি।

আমি ওর হাত ধরে ওকে সান্তনা দিয়ে বললাম,

— Don't feel so bad. আমার সাথে মরুপথে যেতে পারছ না তাতে কি হয়েছে? That's not the end of the world. এখান থেকে যাবার পর লাহোরের কসুর কিংবা ওয়াগা বর্ডার দিয়েতো তুমি পালাবার চেষ্টা করতে পারবে।

আমার কথায় সুমির চোখ উজ্জল হয়ে উঠলো।

— তাইতো লাহোর থেকেই ক্রস্ করাটা সহজ হবে আমার জন্য। I promise you Sir, লাহোর পৌঁছেই পালাবার চেষ্টা করবো যে করেই হোক না কেন।

— নিশ্চয়ই করবে। আমি পরম করুনাময়ের কাছে দোয়া করবো যাতে তুমি তোমার প্রচেষ্টায় সফল হও।

দু'জনে ফিরে এলাম সুমির মেসে। সমস্ত মেসটাই ঘুমিয়ে পড়েছে। একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম।

— সুমি Thanks a lot once again for all that you have done for me. আমার জন্য দোয়া করো। বেচেঁ থাকলে স্বাধীন বাংলাদেশে দেখা হবে ইনশাল্লাহ্। Otherwise good luck and good bye my friend.

আবেগ এবং বিচ্ছেদের অনুভূতি সব মিলিয়ে চোখে পানি এসে গিয়েছিল নিজের অজান্তেই। সুমি ধরা গলায় বিদায় জানালো,

— খোদা হাফেজ, Take care Sir may Allah be with you.

সুমির দিকে আর চাইতে পারলাম না। দ্রুতপায়ে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বসলাম। ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিয়ে ঝড়ের বেগে গেইট দিয়ে বেরিয়ে এলাম। রিয়ার-ভিউ মিরর এ দেখলাম সুমি তখনও পোর্চে দাড়িয়ে হাত নাড়ছে।

এ পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকমতই এগুচ্ছিল। হঠাৎ করে ঘটলো প্রথম বিপর্যয়। আকস্মিকভাবে ক্যাপ্টেন তাহেরের বদলির অর্ডার এসে গেল। এবোটাবাদে বেলুচ সেন্টারে তার পোষ্টিং হয়েছে। অবিলম্বে তাকে যোগদান করতে হবে। খবরটা পেয়েই মতি, নূর এবং আমি ছুটে গেলাম তার কাছে। মেসে গিয়ে পৌঁছাতেই তিনি জানালেন কালই তাকে By Air চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একি বিভ্রাট! কি করবো এখন আমরা? জবাবে ক্যাপ্টেন তাহের বললেন,

— It's OK. এ অবস্থয় তোমাদের সাথে আমার যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। But so what? আমি এবোটাবাদ থেকে পালাবার চেষ্টা করবো। তোমরা তোমাদের প্ল্যান অনুযায়ী এগিয়ে যাও।

তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব Plan execute করতে হবে। বুঝতে পারলাম পোষ্টিং অর্ডার একবার যখন আসা শুরু হয়েছে তখন যেকোন সময় মতি ও নূরের কিংবা আমার পোষ্টিং অর্ডারও এসে পরতে পারে। একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরার আগেই আমাদের কেটে পড়তে হবে। পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন তাহেরকে এয়ারপোর্টে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলাম। আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব

ক্যাপ্টেন তাহের! তরুণ চৌকশ কমান্ডো অফিসার। সবেমাত্র রেঞ্জারস্ কোর্স শেষে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। ফেরার পরপরই **Detailed** হয়ে কোয়েটাতে এসেছিলেন **Senior Tactical Course** করতে। স্বল্পভাষী, অসীম সাহসী, তেজদীপ্ত চেহারা, অস্বাভাবিক মনোবল ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী যুবক ক্যাপ্টেন তাহের দেশপ্রেমের এক দুর্লভ নিদর্শন। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের মন জয় করে ফেলেছিলেন তিনি। অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিলাম আমরা। পাকিস্তান থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মতি, নূর এবং আমিই সর্বপ্রথম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে সক্ষম হয়েছিলাম। দ্বিতীয় ব্যাচে এসেছিলেন মেজর মঞ্জুর, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন তাহের। তারা এসেছিলেন শিয়ালকোট সেক্টর দিয়ে। আমরা একসাথে যুদ্ধ করেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। স্বাধীনতার সংগ্রামকালে এবং পরবর্তিকালে বাংলাদেশের গণমানুষের মুক্তি সংগ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরের নিঃস্বার্থ অবদান এবং আত্মত্যাগের ইতিহাস সর্বজন বিধিত। কিংবদন্তির নায়ক কর্নেল তাহেরের আত্মগাঁথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করবে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের দেশপ্রেমিকরা। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তার নাম। কোন অপচেষ্টাই শহীদ তাহেরের স্মৃতিকে ম্লান করে দিতে পারবে না বাংলার মাটিতে। কর্নেল তাহের মরেও অমর হয়ে আছেন; আর থাকবেনও চিরদিন।

ক্যাপ্টেন তাহেরের হঠাৎ বদলিতে ভেঙ্গে পড়লেও আমরা নিজেদের সামলে নিলাম। তার চলে যাবার পর পুরোদমে আমরা আমাদের পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে নিয়ে চললাম। সুমির পিস্তলটা পাওয়ায় আমাদের সুবিধা হলো। আমার ব্যক্তিগত হাতিয়ারের মধ্যে রয়েছে একটা পিস্তল আর একটা রিভলবার। সুমির পিস্তলটা আমাদের হাতিয়ারের সমস্যার সমাধান করে দিল। ক্রমান্বয়ে আমাদের সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এলো। এখন শুধু সময় ও সুযোগের অপেক্ষা।

ইতিমধ্যে আমাদের ১৬ ডিভিশনের ইউনিটগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। যে সমস্ত ইউনিটগুলো পাঠানো হচ্ছে সেগুলো থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে বাঙ্গালী সদস্যদের। এ থেকে ধরে নিলাম খুব শীঘ্রই আমার পোষ্টিং অর্ডার এসে যাবে। আমার ইউনিটে আমরা মাত্র দু'জন বাঙ্গালী। হলোও তাই। প্রায় একই সময়ে নূর এবং আমার পোষ্টিং অর্ডার এসে গেল। আমাকে যেতে হবে খারিয়ায় আর নূরকে যেতে হবে কোহাট। একই সময়ে পোষ্টিং অর্ডার পাওয়ায় দু'জনেই খুশী হলাম। এতে আমাদের **Movement co-ordinate** করতে সুবিধে হবে। আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে পোষ্টিং অর্ডার পেয়ে নতুন জায়গায় যাবার পথেই কেটে পড়বো আমরা। এতে করে খুব সহজেই সপ্তাহখানেকের জয়েনিং টাইম কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল মতিকে নিয়ে। যেকোন কারণেই হোক না কেন ওর পোষ্টিং অর্ডার আসতে দেরী হচ্ছিল। ঠিক হল কিছু একটা করা দরকার। স্কুলে আটকে পরা সব বাঙ্গালীরাই প্রায় চলে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিটে। হঠাৎ মতির মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ও সরাসরি পিন্ডিতে **MS Branch** এর সাথে যোগাযোগ করে জানতে চাইলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের পোষ্টিং ইনচার্য কে? ভাগ্যক্রমে জানা গেল ঐ বিভাগের দায়িত্বে যে কর্নেল সাহেব রয়েছেন তিনি মতির পূর্ব পরিচিত। কর্নেল সাহেব মতির এক স্কুল-মেটের বাবা। পরিচয় জানার পর মতি আবদার করে বসলো,

— আংকেল, স্কুলের আটকে পরা সবারই পোষ্টিং হয়ে গেছে শুধু আমিই পড়ে রয়েছি। আমার একটা গতি করুন। একাকিত্বের যন্ত্রনা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। **Please Uncle, you got to do something for me as soon as possible.**

জবাবে কর্নেল বললেন,

— তুমি চিন্তা করোনা, আজই আমি তোমার পোষ্টিং অর্ডার পাঠিয়ে দিচ্ছি। **6 East Bengal Regiment** পেশাওয়ার এ যাবার জন্য তুমি প্রস্তুত হও।

মতি কর্নেল সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিল, সম্ভব হলে পেশাওয়ার যাবার পথে মুলতান হয়ে যাবার চেষ্টা করবে ও। উদ্দেশ্য কর্নেল সাহেবের পরিবারের সবার সাথে দেখা করে যাওয়া। পুরো পরিবারের সাথেই মতি পূর্ব পরিচিত। কথা শেষে মতি আনন্দে উচ্ছাসিত হয়ে উঠলো,

— It is all done Sir. Well done indeed, it's really great.

কর্নেল আংকেল এর কথা মত পরদিনই মতি তার পোষ্টিং অর্ডার হাতে পেলো। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

গেইমস্ থেকে ফিরে এক্সারসাইজ করছিলাম মেসে। মতি ও নূর এলো। দু'জনেই খুব রিলাক্সড। এক্সারসাইজ শেষ করে ফ্রেস হয়ে তিনজনেই গিয়ে বসলাম লনে। ঠিক করা হলো, নূর রওনা হবে ট্রেনে করে কোহাটের পথে। কিন্তু পথিমধ্যে ভাওয়ালপুরে নেমে যাবে নূর। সেখানে সার্কিট হাউজে অবস্থান নেবে নূর। মতি ও আমি ওর যাত্রার পরদিন ভাওয়ালপুরে তার সাথে মিলিত হবো। মতি এবং আমি কিভাবে যাবো সে ব্যাপারে কিছুই আলাপ হলো না। আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী কেউ এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলো না। আলাপ শেষে ক্লাবে চলে গেলাম "তাম্বোলা-নাইট" অ্যাটেন্ড করার জন্য।

আমাকে কমান্ডিং অফিসার নির্দেশ দিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোছগাছ করে খারিয়া চলে যেতে। স্বাভাবিকভাবে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম গোছগাছ নিয়ে। সমস্ত মালপত্র ব্যাটম্যানকে দিয়ে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে ট্রেনে করে পাঠিয়ে দিলাম খারিয়ায়। CO-কে বললাম ট্রেনে না গিয়ে By Air লাহোর হয়ে যাবো আমি। Transit Period-টা লাহোরে আমোদ-ফুর্তি করে কাটিয়ে দিয়ে খারিয়াতে চলে যাবো আমি। সমস্যা দেখা দিল সদ্য কেনা গাড়িটা নিয়ে। নতুন গাড়ি শখ করে কেনা তাই বেচে দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এতে লোকজনের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। তাই ঠিক করলাম আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধুকে দিয়ে যাবো গাড়িটা। এজাজ লাহোরের ছেলে। ওর পরিবারের সাথেও আমার ঘনিষ্টতা রয়েছে। আমাকেও তারা পরিবারের একজন হিসাবেই মনে করে। এজাজকে একদিন বললাম,

— এজাজ আমি By Air লাহোর হয়ে যাচ্ছি। তুই আমার গাড়িটা রেখে দে। সুবিধামতো লাহোর পাঠিয়ে দিস। আমি পরে এক ফাঁকে খারিয়া থেকে লাহোর গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসবো।

এজাজ আমার প্রস্তাবে খুশী হয়েই রাজি হলো এবং বললো,

— Don't you ever think about it. I shall manage everything. You just go and have fun at Lahore. By the way when are you planning to leave?

— Tentatively around mid April.

জবাব দিয়েছিলাম আমি। এভাবেই গাড়ির ঝামেলারও সুরাহা হল।

এরই মধ্যে ঘটলো চরম অঘটন। একদিন গেমস এর পর স্কুলের মেসে এ্যান্টিরুমে বসেছিল নূর। কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারও বসেছিল সেখানে। কথায় কথায় এক সময় বাঙ্গালী জাতি এবং শেখ মুজিব সম্পর্কে কটুক্তি করে নূরকে চটাবার চেষ্টা করছিল। ওদের একজন নূরকে উদ্দেশ্য করে বললো,

— নূর তেরাতো কিসমত খুল গিয়ারে। শেখ মুজিব আভি তুঝে একদমসে জেনারেল বানা দেগা, Bastard Mujib is a traitor don't you think so? সারে বাঙ্গালী কওম হিন্দু হ্যায়।

উসকানিমূলক এধরণের বক্তব্যে নূর ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে ওদের কথার জবাবে গর্জে উঠে,

— If Mujib is a Gaddar then Yahia is a rogue. He is killing thousands of Bengalees, he has let loose the forces to rape and dishonour our mothers and sisters. Therefore, he is a bigger Bastard.

এ ধরণের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি নূর। রাগের চোটে সামনের ষ্ট্যান্ডে রাখা প্রেসিডেন্টে ইয়াহিয়া খানের ছবি তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে দিয়ে তার উপর দিয়ে গটগট করে হেটে বেড়িয়ে যায় নূর। প্রেসিডেন্টের ছবি পা দিয়ে মারিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার গুরু অপরাধে তক্ষুণি তার বিরুদ্ধে Open Arrest এর আদেশ জারি করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। শুরু হয়ে যায় কোর্ট মার্শাল প্রসিডিংস্।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমার ও মতির মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ে। হতভম্ব হয়ে যাই আমরা। খবর পেয়েই ছুটে গেলাম ওর কাছে।

— একি করলে নূর? ক্ষণিকের উত্তেজনার বসে সবকিছু ভন্ডুল করে দিলে কি করে? তোমার এ ধরণের হঠকারি কার্যকলাপের পরিণামে আমরাও বিপদে পড়তে পারি। তোমার সাথে আমাদের হৃদ্যতার কথা সবাই জানে। **How could you be so stupid to do a thing like that. Shame on you.** এ ধরণের কাজ তোমার কাছ থেকে আশা করিনি। হঠাৎ করেই ওর উপর ভীষণ রাগ হল।

— **I am sorry Sir. I was totally out of my head.** যা ঘটেছে তার জন্য আমি লজ্জিত এবং অনুতপ্ত, এখন আমাকে নিয়ে বৃথা চিন্তা না করে প্ল্যানমত আপনারা চলে যাবার ব্যবস্থা করেন যত শীঘ্র সম্ভব। **Summery Of Evidence** শুরু হলে আপনাদের ডাক পরা অসম্ভব কিছু নয়, কেসে জড়িয়ে পরার আগেই পালিয়ে যেতে হবে আপনাদের। আমার যা হবার তা হবে। কিন্তু আপনারা ফেঁসে পড়লে আর যাওয়ার সুযোগ হবে না। তাই আমার আন্তরিক অনুরোধ **Please leave me alone to my fate and just think to escape as quickly as possible.** আপনাদের কিছু হলে আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না। ছেলে-মানুষের মতই ডুকরে কেঁদে উঠলো নূর।

ওকে সান্তনা দেবার ভাষা খুজে না পেয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফিরে এলাম। হঠাৎ করে কি থেকে কি হয়ে গেল এখন আমাদের কি করা উচিত; ভেবে কোন কূলকিনারাই পাচ্ছিলাম না। নূরের ভবিষ্যত ভেবে শংকিত হয়ে পড়লাম। বেচারা নূর! অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক করলাম মতি এবং আমি ১৬ই এপ্রিল আমাদের যাত্রা শুরু করবো। তখনকার দিনে করাচি থেকে একটি ফ্লাইট কোয়েটা, মুলতান হয়ে লাহোর যেত প্রতিদিন। ১৬ তারিখের ঐ ফ্লাইটেই রওনা হব আমি লাহোরের পথে। মতি স্কুল এ্যডজুটেন্টকে জানিয়ে দিয়েছে ট্রেনে না গিয়ে ও **By Air Travel** করবে। পথিমধ্যে মুলতানে কয়েকদিন কর্নেল সাহেবের পরিবারের সাথে কাটিয়ে চলে যাবে পেশাওয়ার। **MS Branch** এর কর্নেল সাহেবের নাম শুনে অতি স্বাভাবিকভাবেই তার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল স্কুলের এ্যডজুটেন্ট. একই ফ্লাইটে আমাদের সিট বুক করলাম। **Open Arrest** এ থাকার ফলে আমরা নূরের সাথে স্বাভাবিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারছিলাম। **Closed Arrest** হলে ওর সাথে কোন যোগাযোগ রাখা সম্ভব হতো না। নূর বন্দী হওয়ার পর থেকেই মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলাম। ওকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যেতে মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। ঘুরে ফিরে শুধু একটি কথাই মনে হচ্ছিল, কোন মতেই কি নূরকে উদ্ধার করে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়া যায় না? অনেক চিন্তা ভাবনার পর একটা উপায় আমার মাথায় এলো। ১৫ তারিখ সকালে গিয়ে উপস্থিত হলাম মতির মেসে। গিয়ে দেখি মতির ঘর একদম খালি। বুঝলাম মতি তার মালপত্র ব্যাটম্যানের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। বাথরুমে গোসল করছিল মতি। অল্পক্ষণ পরই মতি বেরিয়ে এলো,

— কি ব্যাপার স্যার, এতো সকালে আপনি?

— একটা বিশেষ ব্যাপারে আলাপ করতে এলাম। মতি তুমি ভালো করেই জানো নূরের বন্দী হওয়ার পর থেকেই আমি ভীষণভাবে মানসিক অশান্তিতে ভুগছি। সর্বক্ষণ ওকে নিয়েই ভাবছি। বললাম আমি।

— নূরের বিষয়েই কিছু কি?

আমার মানসিক অবস্থা আচঁ করেই বোধহয় প্রশ্নটা করলো মতি।

— হ্যা তাই, নূরকে সঙ্গে নেবার একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়....।

আমাকে শেষ করতে না দিয়েই মতি বলে উঠলো,

— **Are you mad Sir?** বন্দী অবস্থা থেকে তাকে নিয়ে যাবার কথা কি করে ভাবলেন? ওকে সঙ্গে নিলে আমরা ধরা পরতে বাধ্য।

— আহা আগে শোনই না আমার আইডিয়াটা। মতিকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

— বেশ বলেন কি বলতে চান।

— দেখো মতি, নূরই প্রথম আমার কাছে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। মানছি হঠাৎ করে ও একটা ভুল করে ফেলেছে। মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। তাছাড়া ওর ভবিষ্যতটা একটু ভেবে দেখ। এ অবস্থায় ওকে অসহায় একা ফেলে রেখে যেতে বিবেকে বাধছে, ওকে ফেলে রেখে যাওয়াটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না মতি।

— **But then how?** প্রশ্ন মতির।

— শোন মন দিয়ে। আমি ওর জন্য ৩ দিনের **Attend 'C' (Sick in quarters)** যোগাড় করে আজই ওকে রওয়ানা করিয়ে দিতে চাই ভাওয়ালপুরের উদ্দেশ্যে। ওখানে পৌঁছে সে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ওকে কিছুই বলা হবে না। শুধু এতটুকুই বলা হবে আগামীকাল ভাওয়ালপুর ষ্টেশনে ওর সাথে নির্ধারিত সময়ে আমাদের দেখা হবে। সময় দুপুর ২-৩টার মধ্যে। **That's all.** এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না করে ও যদি যেতে রাজি হয় তবে **Let's take him. If at-all something goes wrong with him on his way even then we would be safe, as he wouldn't be in a position to reveal anything about our rout or the next step and thus our secret will not be compromised. What do you say?**

— ঠিক আছে, বুঝলাম আপনার প্লানে যুক্তি আছে। কিন্তু **Attend 'C'** কি করে যোগাড় করবেন? প্রশ্ন মতির।

— **First of all tell me do you agree or not to take him with us on principle?**

— **Well it is still risky but I shall buy it.**

জবাবে বললো মতি। আনন্দে মতিকে জড়িয়ে ধরে বললাম,

— **Thanks, you are really great Moti. Now come-along and see what I do.**

গাড়ি করে ছুটে গেলাম **CMH** এ ষ্টাফ সার্জেন ক্যাপ্টেন জামালের কাছে। আমি যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়তেন জামাল। ছাত্র রাজনীতি করার সুবাদে পরিচয় হয় আমাদের সেই পরিচয় আর্মিতে যোগদানের পর আরো ঘনিষ্ট হয়ে উঠে। বয়সে ক্যাপটেন জামাল আমার চেয়ে কিছুটা বড় হলেও আমরা একে অপরকে তুমি বলে সম্বোধন করতাম। **CMH** এর **Out Patient** এ গিয়ে দেখি জামাল রুগী দেখায় খুবই ব্যস্ত। এক ফাঁকে এগিয়ে এসে বললো,

— কি বন্ধু হাসপাতালে কেন? বস কিছুক্ষণ একটু হালকা হইয়া লই।

জবাবে বললাম,

— না দোস্ত, বসনের সময় নাই খুব একটা জরুরী কামে আইছি।

— কও তইলে।

মতিকে সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম,

— কাইল যাইতাছি, দেখা না কইরা গেলেতো আমারে কাইট্টা ফেলাইতা তাই খোদা হাফেজ কইতে আইলাম। কিন্তু দোস্ত যাওনের আগে একটা শেষ আবদার লইয়া আইছি। নূরের লাইগা ৩ দিনের **Attend 'C'** লেইখা দাও। বেচারার মন-মেজাজ খুবই খারাপ।

নূরের ঘটনা কোয়েটার সব বাঙ্গালীর মনেই সমবেদনার উদ্রেক করেছিল। অনেকেই ওর প্রতি ছিল **Sympathetic** ক্যাপ্টেন জামাল ছিল তাদেরই একজন। মুহূর্তে নির্দ্বিধায় এর একটা চিট প্যাডে লিখে সেটা আমার হাতে দিয়ে জামাল বললো,

— এরই মধ্যে একদিন সময় কইরা যামুনে দেখতে কইও তারে। পোলাডা থামাথা নিজেরে কি বিপদেই না ফেলাইছে আল্লাহই জানেন, **Young blood** খুনকা গরমি বুঝলা বন্ধু। অনেকটা আফসোস করেই কথাগুলো বলেছিল জামাল।

— ঠিক কইছো দোস্ত। এখন তাইলে যাই, ভাবীরে বুঝাইয়া কইও সময়ের অভাবে দেখা করতে পারলাম না। বুঝতেই পারো কি তাড়াহুড়ার মইধ্যে আছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। বিকেল ৩:৩০ মিনিটে 'বোলান এক্সপ্রেস্' এ তুলে দিতে হবে নূরকে। লাঞ্চ সেরে মতি ও আমি সোজা চলে গেলাম নূরের মেসে। গিয়ে দেখি নূর লুঙ্গি পরে খালি গায়ে শুয়ে আছে।

— **Get up you lazy bum!**

আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলে লুঙ্গি বাধতে বাধতে উঠে বসলো নূর।

— বিনা প্রশ্নে আমার কথা মেনে নিতে রাজি থাকলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে পারি। বলো রাজি।

আমার কথা বলার ধরণে প্রথমে কিছুটা ভড়কে গিয়েছিল নূর। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,

— কিন্তু.....।

— কোন কিন্তু নয়। সময় নষ্ট না করে বলো রাজি। দৃঢ়তার সাথে জিজ্ঞেস করলাম আবার।

— রাজি। জবাব দিল নূর।

— বেশ এবার শোন মনযোগ দিয়ে- **You have 3days Attend 'C', means complete bed rest OK? Send this Chit to the Adjutant through your Batman then give him Chutti for 3days. Call him now and do as I said.**

নূর তক্ষুণি তার ব্যাটম্যানকে ডেকে তাকে নির্দেশ দিল চিট টা **Adjutant** এর কাছে পৌঁছে দিয়ে ছুটিতে বাড়ি চলে যাবার জন্য। অপ্রত্যাশিতভাবে একসাথে ৩ দিনের ছুটি পেয়ে ব্যাটার বত্রিশ দাঁত আর বন্ধই হচ্ছিল না। খুশীর ঠেলায় গদগদ হয়ে লম্বা একটা সেল্যুট মেরে ছুটে চলে গেল হুকুম তামিল করতে।

— বেশ এবার শোন মনযোগ দিয়ে- **You have 3days Attend 'C', means complete bed rest OK? Send this Chit to the Adjutant through your Batman then give him Chutti for 3days. Call him now and do as I said.**

— এবার কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও। একটা হ্যান্ডব্যাগে দুই প্রস্ত **Extra Change** ভরে নাও জলদি। তোমাকে বোলান এক্সপ্রেস ধরতে হবে। লাহোর পর্যন্ত টিকিট থাকবে কিন্তু ভাওয়ালপুরে নেমে যাবে তুমি। সেখানে সার্কিট হাউজে অবস্থান নেবে তুমি। আগামীকাল দুপুর ২ থেকে ৩টার মধ্যে ভাওয়ালপুর ষ্টেশনে আমরা মিলিত হবো ইনশাল্লাহ্। ভাওয়ালপুর পৌঁছে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। সেখান থেকে ভাওয়ালনগর যাবার উপায় কি কি এবং কোন উপায়ে কতটুকু সময় লাগবে সেটা জেনে রাখতে হবে তোমাকে। **All the way you will behave like an army officer travelling to your place of posting at Bhawal Nagar. Am I clear?**

— **Yes Sir.**

বলেই ছোট একটা হ্যান্ডব্যাগে অতি প্রয়োজনীয় সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে নূর তৈরি হয়ে নিল। ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমরা ছুটলাম রেলওয়ে ষ্টেশন। বোলান এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে ছিল। একটা ফার্ষ্টক্লাশ ক্যুপেতে নূরের জন্য একটা সিট রির্জাভ করা হলো। নির্দিষ্ট কামরায় উঠে বসলাম আমরা। পকেট থেকে ৫হাজার টাকা, একটা পিস্তল এবং ২৫টা গুলি নূরের হাতে তুলে দিলাম। কোন কথা না বলে সেগুলো ব্যাগে ভরে রাখলো নূর। কিছুক্ষণ পর গাড়ি ছাড়ার ঘন্টা এবং হুইসেল দু'টোই বেজে উঠলো। নূরকে জড়িয়ে ধরে বললাম,

— **Take care, see you tomorrow.** খোদা হাফেজ।

গাড়ি নড়ে উঠলো। আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম। তীব্র হুইসেল বাজাতে বাজাতে বোলান এক্সপ্রেস ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমরাও ফিরে এলাম।

আজ রাতে **Div Arty** এর তরফ থেকে আমার **Farewell dinner.** তাই মতিকে মেসে নামিয়ে দিয়ে ফেরার সময় বললাম, "কাল এয়ারপোর্টে দেখা হবে।"

মেসে সে রাতে **Div Arty**-র ব্যান্ড এর সাথে অনেক রাতঅব্দি পানাহার চললো। ব্যান্ডের তালে তালে নাচগানও হলো রেওয়াজ অনুযায়ী। বেশ কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করছিলাম সারাদিনের ব্যস্ততায়। তার উপর মাথায় রয়েছে নূরের ব্যাপারে টেনশন। কিন্তু কিছুই করার নেই। সব

চিন্তা মনে চেপে রেখে স্বাভাবিকভাবেই সব **Formalities** শেষ করে অনেক রাতে ফিরে এলাম নিজের কামরায়। সেদিন হঠাৎ করে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় বেশ একটু ঠান্ডা পরেছে। তাই বেয়ারা ঘরের ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সঙ্গে নেবার জিনিসপত্র আগেই গোছগাছ করে রাখা হয়েছে। টেবিলের উপর রাখা আমার সবচেয়ে প্রিয় ফটো এলবাম দু'টো। সাথেই আখরোটের সুক্ষকাজ করা লেটার বক্সে রাখা আছে নিম্মীর লেখা চিঠিগুলো। বেড-সাইড টেবিলের উপর ফটো ষ্ট্যান্ডে রাখা নিম্মীর ছবিটাকে ভীষণ জীবন্ত লাগছে। মনে হচ্ছে ও যেন গভীর দৃষ্টিতে আমাকে পরখ করে দেখছে। এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কোন সূত্র রাখা চলবে না। এতে করে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ফায়ার-প্লেসের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পোড়াবার আগে শেষবারের মত এলবামের ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। প্রতিটি ছবির সাথে জড়িয়ে আছে একেকটা স্মৃতি। ফটো দেখা শেষ হলে এলবাম দু'টো ছুঁড়ে দিলাম ফায়ার-প্লেসে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। চিঠিগুলোও ফেলে দিলাম সেই আগুনে। মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নিল সব। কষ্টে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। সযত্নে তুলে রাখা এতদিনের অমূল্য সম্পদগুলোকে এভাবে বিসর্জন দিতে হবে সেটা কখনো ভাবিনি। আগুনের দিকে চেয়েছিলাম। দু'চোখ বেয়ে নিজের অজান্তেই পানি গড়িয়ে পড়ছিল। অতীতের স্মৃতিতে তলিয়ে গেলাম আমি। মনে পরে গেল নিম্মীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা।

রিয়াজুল ইসলাম চৌধুরী (বাপ্পি)-র বোন নিম্মী। বাপ্পি আমার ঘনিষ্টতম বন্ধুর একজন। আমি, স্বপন, টুটু, হায়দার, বাপ্পি একে অপরের হরিহর আত্মা। ছুটিতে ঢাকায় এলে ২৪ ঘন্টা একসাথে থাকা, খাওয়া, হৈ হুল্লর করে সময় কাটে আমাদের। কখনো সিনেমা, কখনো পিকনিক নয়তো শিকার এভাবেই আনন্দে কেটে যায় আমাদের সময় ঝড়ের বেগে। এসব কিছু ভালো না লাগলে চলে যাই সিলেটের চা বাগানে, কাপ্তাই-রাঙ্গামাটি কিংবা কক্সবাজার-টেকনাফ। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ছুটিতে ঢাকায় এসেছি। হৈচৈ করে কেটে যাচ্ছিল সময়। একদিন হায়দার খবর নিয়ে এলো যমুনার চরে মৌসুমী পাখির আগমন ঘটেছে প্রচুর তাই শিকারে যেতে হবে। শিকারের প্রতি একটা অদ্ভুত নেশা ছিল হায়দারের। সেদিন রাতেই দল বেধে শিকারে বেরিয়ে পরলাম। আরিচা ঘাট পর্যন্ত গাড়িতে তারপর নৌকা যাত্রা। মধ্যরাতের পর খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকায় উঠলাম। পরদিন দুপুর পর্যন্ত শিকার করে শেষ বিকেলে ফিরে এলাম। শিকার ভালোই পাওয়া গেছে। ১টা রাজহাস, ৪টা চখা এবং ২০টা বালিহাস। শীতকালে মৌসুমী পাখি সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসে বাংলাদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে। গরমের শুরুতেই আবার উড়ে ফিরে যায় তুন্দ্রা অঞ্চলে। পাসপোর্ট কিংবা ইমিগ্রেশনের ঝামেলা নেই তাদের। যখন যেখনে খুশি উড়ে চলে যায় ওরা। শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকেই বৈষয়িক স্বার্থে এই স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছে। বাসায় ফিরতেই আমার ছোট দুই বোন মহুয়া ও কেয়া বায়না ধরে বসলো, বৃটিশ কাউন্সিলে একটা ফাংশন হচ্ছে সেখানে নিয়ে যেতে হবে। সারা দিন রাত শিকারের ধকলে সবাই ক্লান্ত। কেউই ওদের নিয়ে যেতে রাজি হলো না। ক্লান্ত থাকা সত্বেও আমি ওদের মানা করতে পারলাম না। অনেক কষ্টে বাপ্পিকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য রাজি করালাম। যখন বৃটিশ কাউন্সিলে পৌঁছলাম তখন রাত ৯টার উপর। বারান্দায় কয়েকটি মেয়ে দাড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম। ফাংশন অথচ লোকজনের ভীড় নেই একদম। গাড়ি পোর্চের নিচে দাড় করাতেই মহুয়া কাচ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এই নিম্মী এদিকে এসো।"
নিম্মীটি আবার কে! দেখলাম একটি মেয়ে গাড়ির কাছে এগিয়ে এলো।
"কি এত ফাঁকা কেন? প্রশ্ন করলো মহুয়া।"
"ফাংশন শেষ। জানালো মেয়েটা।" বাপ্পি ওকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, "তুমি এখনও এখানে কি করছো?"
"রিক্সা পাচ্ছি না। জবাব দিল মেয়েটা।" মহুয়াই পরিচয় করিয়ে দিল, "ভাইয়া, নিম্মী বাপ্পি ভাইয়ার বোন আমাদের হলিক্রসে পড়ে।" বাপ্পিদের বাসায় যাওয়া আসা থাকলেও নিম্মীর সাথে আগে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি।

“চলো না ভাইয়া নিম্মীকে নামিয়ে দিয়ে আসি ফাংশন যখন আর দেখাই হলো না।” মহুয়া অনুরোধ জানালো।

“বেশ চল।” নিম্মীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বাপ্পিদের বাসার দিকে রওনা হলাম। উজ্জ্বল শ্যামবর্নের একহারা গড়নের নিম্মী কেয়া-মহুয়ার সাথে পেছনের সিটে বসেছে। বাপ্পি আমার পাশের সিটে। রিয়ার ভিউ মিরর এ নিম্মীকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম, সুন্দর ফিগারের অধিকারিণী নিম্মী দেখতে আকর্ষনীয় এবং মিষ্টি। সবচেয়ে আকর্ষনীয় তার চুল। ঘনকালো চুলের একটা অসাধারন মোটা বেনী হাটু ছাড়িয়ে প্রায় গোড়ালির কাছ অব্দি ঝুলছে। হালফ্যাশানে বাঙ্গালী মেয়েদের মাঝে এ ধরনের ঘনকালো লম্বা চুল খুব একটা দেখা যায় না। গাড়ো নীল রং এর বুটিদার কামিজ ও চুড়িদার পায়জামা পরেছিল নিম্মী। কথা বলার ধরণও ভীষণ আন্তরিক। সবকিছু মিলিয়ে প্রাণবন্ত উচ্ছল প্রকৃতির নিম্মীকে প্রথম দেখাতেই ভালো লাগলো। সেই ভালোলাগা থেকেই ভালোবাসা। আশ্চর্য হয়েছিলাম নিজেই। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি জীবনে শুধুমাত্র লেখাপড়ার জন্যই নয় বিভিন্ন কারণে বেশ নাম ডাক ছিল বরাবরই। একনামে পরিচিত ছিলাম বিভিন্ন মহলে। মেয়েদের সাথে মেলামেশার অবাধ সুযোগও হয়েছে ছোটকাল থেকেই। কিন্তু প্রেম-ট্রেমের ধার ধারিনি কখনো। দু’একটা প্রেমপত্র গল্পের বই আদান-প্রদানের মাধ্যমে হাতে এসে পৌঁছায়নি তাও নয়। কিন্তু সেগুলো মনে তেমন একটা দাগ কাটতে সক্ষম হয়নি। ঘটনাগুলো নেহায়েত নেকামী বলেই মনে হয়েছে সবসময়। অবশ্য পছন্দ না হলেও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অনেক বন্ধু-বান্ধবকেই নানাভাবে সাহায্য করতে হয়েছে এ পর্যন্ত ক্ষেত্রবিশেষে। ছাত্র রাজনীতি, খেলা-ধুলা, গান-বাজনা, নাটক, সমাজসেবা ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকাটাই ছিল আমার নেশা। তাই মেয়েদের ব্যাপারে ধ্যান দেবার সময় ছিল না মোটেও। কাউকে দেখে তেমনভাবে আকর্ষণও বোধ করিনি কখনো। সেই আমিই কিনা প্রথম দেখার ভলোলাগা থেকে একেবারে ভালোবেসেই ফেল্লাম নিম্মীকে! এমনটিই বোধহয় হয়। যাকে ভালোলাগে তাকে প্রথম দেখাতেই ভালোলাগে। প্রথমে নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হয়তোবা ক্ষণিকের মোহ; কিন্তু না এতো মোহ নয়। এরপর যতই দিন গেছে নিম্মীর প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে আমার। গভীর হয়েছে আমার ভালোবাসা। এক অদ্ভুত অনুভূতি! প্রতিদানে নিম্মীও সবটুকু মন উজাড় করে ভালোবেসেছে আমাকে। তার পবিত্র, আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার গহীন অতলে তলিয়ে গেছি আমি। নিম্মী তার প্রথম যৌবনের কুমারী মনের সবটুকু মাধুর্য্য বিলিয়ে দিয়ে একান্ত বিশ্বাসে আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল তার ভালোবাসার মানুষ হিসাবে। আমি স্থান পেয়েছিলাম তার মনের মণিকোঠায়। আমি ধন্য হয়েছি তার ভালোবাসা পেয়ে। আমাদের ভালোবাসাকে সানন্দেই গ্রহণ করে নিয়েছেন দুই পরিবারের সবাই বিশেষ করে গুরুজনরা। খুশী হয়েছে বন্ধু-বান্ধবরা। এবার ছুটি থেকে ফেরার আগে আমাদের বিয়ের ব্যাপারেও সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ বছরের শেষাশেষি কিংবা আগামী বছরের প্রথম দিকে আমাদের বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করেই দৈবচক্রে সবকিছুই ওলোট-পালোট হয়ে গেল। ভবিষ্যত হয়ে উঠল অনিশ্চিত। ঢাকা থেকে ফিরে আসার পর কোন চিঠিপত্র পাইনি ওর কাছ থেকে। জানিনা ঠিক এই মুহূর্তে ও কোথায়, কি অবস্থায় আছে! নিম্মীর বাবা জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৬৯ সাল থেকে কোলকাতায় পাকিস্তান দূতাবাসে কূটনৈতিক হিসেবে পোষ্টেড আছেন। তিনি নিম্মীর ছোটবোন মানুকে নিয়ে কোলকাতাতেই থাকেন। খালাম্মা মানে নিম্মীর আম্মা, বাপ্পি, নিম্মী এবং নিজের পড়াশুনার জন্য ঢাকাতেই থাকেন অনেকটা বাধ্য হয়েই। ছুটিছাটায় কোলকাতায় যান মানুদের দেখে আসতে। আব্বা, মহুয়া, কেয়া, স্বপন, হায়দার, টুটু, বদি ওদেরও কোন খবরা-খবর নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে ওরা কিছুতেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। ওরা নিশ্চয়ই জনগণের সাথে প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। আমি যে ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পাড়ি জমাচ্ছি তার জন্য একজন পদস্থ সরকারি অফিসার হিসেবে তার এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর অভিসম্পাত নেমে আসতে পারে। পাক-বাহিনীর অত্যাচারের শিকারেও পরিণত হতে পারেন তারা। কথাটা ভেবে মনটা হঠাৎ করে দুর্বল হয়ে পড়লো। ব্যথায় বুকটা ভারী হয়ে উঠলো। কিন্তু না, এ পর্যায়ে এমনভাবে দুর্বল হওয়া চলবে না। সবকিছুর বিনিময়ে এমনকি জীবনের পরোয়া না করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্তে অটল থাকতেই হবে। ব্যক্তি,

গোষ্ঠি, পারিবারিক সব স্বার্থ থেকে দেশ এবং জাতীয় স্বার্থ অনেক বড়। সে প্রশ্নে কোন আপোষ করা চলবে না কিছুতেই। আমার এই সিদ্ধান্তে-র ফলে কারো কিছু হলে দুঃখ পাবো কিন্তু জাতীয় প্রয়োজনে কোন অবদান রাখতে না পারলে নিজের কাছে নিজেই হেয় হয়ে যাবো। কাপুরুষতার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে সারাজীবন। ইতিমধ্যে অনেক দিনের জমানো স্মৃতির নিদর্শনগুলো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সারাদিনের ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত শরীরে। আগামীকাল ভোর ৭টায় এয়ারপোর্টে যেতে হবে তাই শ্লথগতিতে উঠে পরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলাম।

পরদিন ভোর ৬টায় অভ্যাসমত ঘুম ভেঙ্গে গেল। মেস ওয়েটার বেড টি দিয়ে গেল। বেড টি শেষে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে শেষ বারের মত ডাইনিং হলে গেলাম নাস্তার জন্য। হেড ওয়েটার ফিদা খান নিজেই সমাদর করে নিজের তদারকিতে নাস্তা করালো। নাস্তা শেষে বয়, বার্বুচী, ওয়েটার এবং হেড ওয়েটার সবাইকে বকশিশ দিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। মেসের সামনের কারপার্ক গাড়িতে ভরে গেছে। **Div Arty** -র প্রায় সব অফিসারই জমায়েত হয়েছে আমাকে এয়ারপোর্টে **See Off** করতে যাবার জন্য। ওদের আন্তরিকতা আমাকে বিহব্ল করে তুলেছিল। সামরিক জান্তার পাশবিকতা আর এদের বন্ধুসুলভ আন্তরিকতায় কত তফাৎ! ভাবছিলাম আজ ইয়াহিয়া খান ও তার দোসররা রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচারের যে ষ্টিমরোলার চালিয়ে দিয়েছে তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কতটুকু সমর্থন রয়েছে ? সময় হয়ে এল। আমার **CO** মিয়া হাফিজ এসে বললেন,

— **Sharif it's time, let's go.**
— **Yes Sir.**

বলে যারা এয়ারপোর্টে যাবে না তাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্নেল হাফিজের পাশে গাড়িতে উঠে বসলাম। তিনি গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার সাথে সাথে যারা যাবার তারা সবাই যার যার নির্দিষ্ট গাড়িতে উঠে বসলো। কাফেলা চললো এয়ারপোর্টের দিকে। মিনিট বিশেকের মধ্যেই এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলাম। মতি আমার আগেই পৌঁছে **Check-In** করে অপেক্ষা করছিল।

— আরে মতি তুমি এখানে? ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা করলাম।
— মুলতান যাচ্ছি পেশাওয়ারের পথে। জবাবে বললো মতি।
— **I see that's good.** প্লেনে তাহলে গল্প করে সময়টা ভালোই কাটবে। বললাম আমি।

Check-In পর্ব শেষ করে সবার সাথে কথাবার্তা বলছিলাম, হঠাৎ দেখি **Div Arty Commander** ব্রিগেডিয়ার বাদশা এয়ারপোর্টে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির। ব্রিগেডিয়ার বাদশা আমাকে **A young good gunner officer** হিসেবে খুবই স্নেহ করতেন। ব্রিগেডিয়ার বাদশা জাতিতে পাঠান। তিনি এগিয়ে আসতেই আমরা সবাই সেল্যুট করে দাড়ালাম।

— আলাকা শরিফ তু হামকো ছোরকে যা রাহা হ্যায় ইস্‌লিয়ে হামে দুখ্ হ্যায়, লেকিন এহি জিন্দেগী হ্যায় বেটা। নয়া ইউনিটমে আচ্ছা রেহ্‌না অওর খোশ রেহ্‌না এহি মেরা দোয়ায়ে হ্যায়।

পিতৃসুলভ ব্রিগেড কমান্ডারের কথাগুলো মনে দাগ কেটেছিল। বোর্ডিং এর ঘোষণা হল। সবার সাথে কোলাকুলি করে বিদায় নিলাম। ব্রিগেডিয়ার বাদশার ইশারায় কয়েকজন **Young Officers** কাঁধে তুলে নিয়ে **He was a jolly good fellow** বলতে বলতে আমাকে প্লেনের সিড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেল। পুরনো বন্ধুদের ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগছিল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে প্লেনে উঠে বসলাম। মতিও উঠে বসেছে। জানালা দিয়ে দেখলাম সবাই লাইন করে দাড়িয়ে হাত নাড়ছে। অল্পক্ষণ পরেই প্লেন ষ্টার্ট নিয়ে **Take-Off** করলো। সবাই তখনও দাড়িয়ে। কেউ কেউ রুমাল নাড়িয়ে শেষ বিদায় জানাচ্ছিল। প্লেন এয়ারপোর্টের উপর দু'টো চক্কর দিয়ে মেঘের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে গেল। সবাইকে পিছনে ফেলে প্লেন উড়ে চললো মুলতানের উদ্দেশ্যে। এভাবেই শুরু হলো আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই আমাদের বহনকারী ফোকার-ফ্রেন্ডশিপ বিমানটি মুলতান এয়ারপোর্টে অবতরণ করল। প্লেন থেকে বেরুতেই মুখে লাগলো গরম

বাতাসের ঝাপটা। কোয়েটার তুলনায় মুলতানের আবহাওয়া অনেক উষ্ণ। ভাওয়ালপুর ভাওয়ালনগরের দিকে উষ্ণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। ছোট এয়ারপোর্ট ক্যান্টনমেন্টে এরিয়ার মধ্যেই অবস্থিত। প্লেন থেকে অবতরণ করে ট্রানজিট লাউঞ্জে না গিয়ে মতির সাথে সোজা চলে গেলাম **Arrival** এ। ওখানে **PIA** কাউন্টারে গিয়ে আমার লাহোর যাওয়া **Cancel** করে দিয়ে বেরিয়ে এলাম এয়ারপোর্ট থেকে। মুলতান শহর এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় ৫মাইল দূরে অবস্থিত। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা চলে এলাম শহরে। কিছু কেনাকাটা করার ছিল। **Survival Kit, FirstAid Box, Anti Snake Bite Kit** এগুলো সব সঙ্গে করে আনা হয়েছে। তিনজনের জন্য **Desert Shoes,** এক বোতল ব্রান্ডি, সুইটস-চুইঙ্গাম, বিস্কিটস, কিছু ড্রাই ফ্রুটস প্রভৃতি কেনা হলো।

তারপর গেলাম সোনার দোকানে। ওখানে দু'টো আংটি বানালাম একেকটা দেড় ভরি ওজনের। একটাতে খোদাই করলাম '**S**' এবং অন্যটাতে '**M**'। আমি ও মতি আংটি দু'টো পরে নিলাম। কেনাকাটার পাঠ চুকিয়ে গেলাম **Railway Station**-এ। ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম ১২টার ট্রেন ধরলে দু'টো-সোয়া দু'টোর মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে ভাওয়ালপুর। ঠিক করলাম দুই বাঙ্গালীর একসঙ্গে সফর করাটা ঠিক হবে না। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো মতি যাবে ট্রেনে আর আমি যাব বাসে। বাসে করে আমি মতির আগেই পৌঁছে যাব ভাওয়ালপুর। ওখানে ষ্টেশনে মিলিত হব আমরা। মতিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ট্যাক্সি করে গিয়ে পৌঁছালাম বাস ষ্ট্যান্ডে। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর বাস ছাড়ছে ভাওয়ালপুরের উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষমান বাসে উঠে বসলাম। মালপত্রের বেশিরভাগই মতি নিয়ে গেছে সাথে। আমার কাছে রয়েছে হালকা ছোট্ট একটা ব্যাগ। দু'টো বাজার আগেই পৌঁছে গেলাম ভাওয়ালপুর। বাস ষ্ট্যান্ডে নেমে টাঙ্গা করে পৌঁছলাম ষ্টেশনে। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নূর প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে- একটা খবরের কাগজ হাতে দাড়িয়ে আছে। সোয়া দু'টোর দিকেই মতির ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে এসে দাড়ালো। মতি নামলো ট্রেন থেকে। একে অপরের সাথে চোখাচোখি হল কিন্তু কেউ কারো সাথে কথা বললাম না। তিনজনেই আলাদাভাবে সার্কিট হাউজে পৌঁছলাম। নূরের ঘরে ঢুকেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম উল্লাসে। নূর আগেই আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ঘরেই লাঞ্চ করলাম। লাঞ্চের সময় নূর জানালো পথে ওর কোন অসুবিধেই হয়নি। আরো জানালো ভাওয়ালপুর থেকে ভাওয়ালনগর দু'ভাবে যাওয়া সম্ভব। ট্রেনে করে গেলে লাগবে ঘন্টা তিনেক। ট্রেনের সময় বিকেল ৪টা। আর ট্যাক্সিতে গেলে সময় লাগবে বড়জোর ঘন্টা দু'য়েক। ঠিক হলো ট্যাক্সিতেই যাব। কারণ ভাওয়ালনগর থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ট্রেন ধরতে হবে আমাদের। প্রতিদিন দু'টোই ট্রেন যায় ভাওয়ালনগর থেকে ফোর্ট আব্বাস, একটা সকালে অপরটি সন্ধ্যায়। সাড়ে সাতটার ট্রেন মিস করলে পুরো রাতটা কাটাতে হবে ভাওয়ালনগরে। সেটা হবে আমাদের জন্য খুবই বিপদজনক কারণ সমস্ত ভাওয়ালনগরটাই একটা ক্যান্টনমেন্ট। লোকাল ট্রেনের সময়ের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কোনরকম রিস্ক নেয়া চলবে না। ট্যাক্সিতে গেলে সাড়ে সাতটার অনেক আগেই পৌঁছে যাবো ভাওয়ালনগর। কিছু সময় বিশ্রাম করে বিকেল ৪টায় একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে রওনা হলাম ভাওয়ালনগরের উদ্দেশ্যে। সিন্ধী ড্রাইভার। ওকে বললাম, সাতটার মধ্যে ভাওয়ালনগর পৌঁছে দিতে পারলে বকশিশ মিলবে। তরুণ ড্রাইভার জবাবে বললো,

— কই বাতই নেহি হ্যায় সাব। আপকো সাতসে পেহলেই পৌঁহচা দেঙ্গে।

উল্কাবেগে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি। শেভ-ইম্পালা গাড়ি। সৌখিন ছোকরা ক্যাসেটে ফিল্মী গান লাগিয়ে দিল। আমরা চুপচাপ বসে গান শুনছিলাম আর ভাবছিলাম ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যত। এক সময় ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ বিকট একটা শব্দে চমকে তিনজনেই জেগে উঠলাম। একটা ঝাকুনি দিয়ে ট্যাক্সি ততক্ষণে থেমে গেছে।

— কি হলো? ব্যাপার কি?

প্রায় একেইসাথে বলে উঠলাম তিনজনে।

— দেখতে হেঁ সাব।

দেখতে হেঁ সাব।

বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল ড্রাইভার। কিছুক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফিরে এসে বললো,

— গাড়িকা ক্র্যাঙ্কশাফ্‌ট টুট গিয়া।
বলে কী ব্যাটা!
— ফির আব হাম কেয়া করেঙ্গে? জিজ্ঞেস করল নূর।
— ঘাবড়াও মাত স্যার, পাঁচছে মিল রেহেতে হ্যায় কোই না কোই সোয়ারী জরুর মিল যায়েগা উসমে বেঠা দেঙ্গে আপলোগকো।
কি সর্বনাশ! তবে কি ঘাটে এসে তরী ডুবল? গাড়িটাকে সবাই মিলে ঠেলে রাস্তার সাইডে রাখা হল। অন্য কোন গাড়ি না আসা পর্যন্ত কিছুই করার নেই। অপেক্ষা করতে করতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। দূরে ভাওয়ালনগরের বাতিগুলো এক সময় জ্বলে উঠল। ৭টা বেজে গেল কোন গাড়ির লক্ষণ নেই। অস্থির হয়ে উঠলাম সবাই। হতাশায় মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলাম প্রায়। হঠাৎ দূরে গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল; কিছু একটা আসছে ভাওয়ালপুরের দিক থেকেই। রাস্তা ব্লক করে দাড়ালাম চার জনেই। যাই হোক না কেন থামাতে হবে। কাছে আসতে দেখলাম একটা ল্যান্ডরোভার। আমরা হাত দিয়ে ইশারা করায় গাড়িটা থামল। **Roads & Highways** এর এক ইঞ্জিনিয়ার যাচ্ছেন ভাওয়ালনগর। ভদ্রলোককে সবকিছু বুঝিয়ে বললাম।

তিনজন আর্মি অফিসারের দুর্গতি দেখে ভদ্রলোক সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন,
— আপনাদের কষ্ট না হলে আমি আপনাদের নিয়ে যেতে পারি।
কষ্ট! হাতে আকাশের চাঁদ পেলাম। ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে মালপত্র নিয়ে জিপে উঠে বসলাম। অধাঘন্টার মধ্যেই ভাওয়ালনগর পৌঁছে গেলাম। তখন রাত পৌনে আটটা। আমাদের ট্রেন নিশ্চয়ই এতক্ষনে ছেড়ে চলে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,
— কোথায় নামবেন?
ষ্টেশন এর কথা না বলে বললাম,
— শহরের যে কোন খানে নামিয়ে দিলেই চলবে।
Town Centre এ নামিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। সেখান থেকে একটা টাঙ্গা করে কাছেই ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি অসম্ভব ভীড়। এমনটি তো হবার কথা নয়। ট্রেন চলে যাবার পর ষ্টেশন থাকবে জনশূন্য তাহলে এত লোক কেন ষ্টেশনে? ট্রেন কি তাহলে এখনও আসেনি? হঠাৎ করে কিছুটা আশার আলো ঝলকে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম,
— ফোর্ট আব্বাসের ট্রেনের খবর কি?
দু'বাক্যে ষ্টেশন মাষ্টার বললেন,
— ট্রেন লেট, এখনও এসে পৌঁছেনি।
জানে পানি ফিরে এল। দৌড়ে গিয়ে মতি ও নূরকে খবরটা দিতেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওরা লাফ দিয়ে টাঙ্গা থেকে নেমে পড়ল। কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে প্লাটর্ফমে চলে এলাম। পথে একটি ভিক্ষুক দাড়িয়েছিল। আনন্দের আতিসয্যে একশ টাকার একটি পুরো নোটই তাকে দিয়ে দিলাম। সোয়া আটটায় আমাদের ট্রেন এল। র্ফাষ্টক্লাসের তিনটি টিকেট কাটা হল র্ফোট আব্বাস পর্যন্ত। বর্ডার এলাকার ট্রেন। আমাদের মত ফৌজি ছাড়া ফার্ষ্টক্লাশের যাত্রি বিরল। অতি সহজেই একটা খালি কামরা পেয়ে উঠে বসলাম। ট্রেনে উঠেই বুফে কার থেকে ডিনার আনাবার বন্দোবস্ত করা হল। খাবার সার্ভ করে গেল বেয়ারা। দরজা বন্ধ করে খাওয়ার পাঠ চুকিয়ে নিলাম। ট্রেন ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে। খাওয়া শেষ করার পর পদযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হল। সবাই ডার্ক কালারের কাপড় পরে নিলাম। আমাদের কাছে তখন সর্বমোট প্রায় হাজার বিশেক টাকা। ওগুলো কাপড়ের বিভিন্ন চোরা পকেটে ঢোকানো হল। স্যুটকেস থেকে হ্যাভারস্যাক বের করে ওতে তিন জনের আর এক প্রস্ত করে কাপড় নেয়া হল। প্রয়োজনীয় সাথে নেবার সবকিছু রাখা হল হ্যাভারস্যাক এ। ম্যাপ বের করে নাইট মার্চ চার্ট আঁকা হল। পাকিস্তানের মটরাইজড ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের ডিফেন্সিভ এলাকার মধ্য দিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মির একটি ট্যাংক রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টারস এর পাশ ঘেষে যেতে হবে আমাদের। রাস্তায় পড়বে এ্যান্টিট্যাংক অবস্ট্যাকল মাইন ফিল্ড। এদের মাঝে গ্যাপ বের করে নিয়ে যাত্রাপথ

নির্ধারন করা হয়েছে। পথে দুই তরফের পেট্রোল পার্টির মোকাবেলায় পড়তে হতে পারে। সিদ্ধান্ত নেয়া হল যেকোন উপায়েই হউক **own troops and enemy Troops** -কে এড়িয়ে চলতে হবে আমাদের। নেহায়েত বিপাকে পড়লেই সংঘর্ষের মাধ্যমে শত্রুকে পরাস্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। কোন অবস্থাতেই ধরা পড়া চলবে না। ধরা পড়ার আগেই আমরা আত্মহত্যা করব। কোন কারণে অবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ব্যক্তিগত উদ্যোগে করনপুর পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে। কম্পাসে রুট এবং বিয়ারিং সেট করা হল, পরা হল **Desert shoes.** হাতিয়ার এবং গুলি নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিলাম। ম্যাপ, কম্পাস, বাইনোকুলার, নাইট মার্চ চাটর্, একটি টর্চ, একটি কম্বল এবং সাথে নেবার হ্যাভারস্যাকটি ছাড়া সবকিছুই সুবিধামত কোন জায়গায় লুকিয়ে ফেলতে হবে। নিজেদের **ID Card** ছাড়া অন্যান্য সব কাগজপত্র পুড়িয়ে টয়লেট দিয়ে ফেলে দেয়া হল ট্রেন থেকে। ক্যামেরা দু'টো হ্যাভারস্যাকে ভরে নিলাম। ছোট্ট কোরআন শরীফটাও নেওয়া হল হ্যাভারস্যাকে। অর্ডার অফ মার্চ – মতি আগে তারপর আমি, পেছনে নূর। হ্যাভারস্যাক পালাক্রমে বহন করা হবে। মার্চের সময় প্রতি এক ঘন্টা অন্তর দশ মিনিট বিরতি। বিরতিকালে কম্বলের নিচে ঢুকে টর্চের আলোয় ম্যাপ দেখে নেয়া হবে, ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা? প্রয়োজনে কম্পাস বিয়্যারিং এ্যডজাষ্ট করা হবে। আমরা তিনজনই কমান্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত। নাইট মার্চের সব কৌশলই আমাদের নখদর্পনে।

রাত দশটা বেজে পনেরো মিনিটে আমাদের ট্রেন হারুনাবাদ ষ্টেশনে এসে পৌঁছল। ছোট্ট ষ্টেশন। প্ল্যাটর্ফমের যেখানে আমাদের বগিটা গিয়ে থামল সেখানে বেশ জমাট অন্ধকার। আমরা নেমে পড়লাম। অল্প কয়েকজন যাত্রী উঠা-নামা করল। আমরা আধাঁরে চুপ করে দাড়িয়ে থাকলাম। অল্পক্ষণ পর হুইসেল দিয়ে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। যে সমস্ত যাত্রি ট্রেন থেকে নেমেছিল তারা সবাই ষ্টেশনের চেকিং গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে। চুপচাপ দাড়িয়ে আমরা জায়গাটা ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম। অপর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আলোয় ষ্টেশন ঘরটার সামনে কিছুটা অংশই আলোকিত হয়েছিল। প্ল্যাটফর্মের বেশিরভাগ অংশই ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ষ্টেশনের বাইরে একটা মাঝারি আকারের উঠান, কয়েকটি চায়ের দোকান, তাদের সামনে কয়েকটি টাঙ্গা যাত্রিদের অপেক্ষা করছে। চার পাঁচশ গজ দূরে হাইওয়ে রেল লাইনের প্রায় সমান্তরালভাবেই উত্তর দক্ষিনে চলে গেছে। মাঝে মধ্যে দূরপাল্লার বড় বড় ট্রাকগুলো আওয়াজ তুলে ভীষণ বেগে আসা-যাওয়া করছে। রাস্তার ওপারেই হারুনাবাদ শহর। শহর বলতে একটি বর্ধিষ্ণু বাজার। বাজারের চারদিকে জনবসতি। আমরা হারুনাবাদ শহরের ডানদিক দিয়ে প্রয়োজনীয় দুরত্ব বজিয়ে রেখে যাত্রা শুরু করব। একেতো বর্ডার এলাকার মরু অঞ্চল, রাতও বেশ হয়েছে, লোকজন নেই খুব একটা, সমস্ত শহরটাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা প্ল্যাটফর্ম খালি হয়ে যাবার পর ষ্টেশনের সদর দরজার দিকে না গিয়ে প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে এলাম। অতি সাবধানে হাইওয়ে ক্রস করে একটা বাবলা ঝোপের মধ্যে অবস্থান নিলাম। হারুনাবাদ শহরের বসতির শেষপ্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে মরুভূমি। উচু-নিচু বালির পাহাড়। মাঝে মধ্যে কাটার ঝোপঝাড়। যে জায়গায় পানির আধার রয়েছে সেখানে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট গৃহস্থালি। তাকে কেন্দ্র করেই ছোট ছোট চাষাবাদের খামার। অরহর, কলাই, যব, ভুট্টার ক্ষেত। মোটামুটি এ ধরণের টেরেনই (**Terrain**) অতিক্রম করে যেতে হবে আমাদের। যাত্রা শুরু করার আগে আমি ও মতি কম্বলের নিচে বসে কম্পাস সেটিং ও নাইট মার্চ চার্ট ঠিক করে ম্যাপের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। ম্যাপ অনুযায়ী আমাদের অবস্থানের অদূরেই একটি কারেজ থাকার কথা। কারেজ হল মরু অঞ্চলে গভীর কুয়োঁর সারি। এগুলো খুঁড়ে তাতে বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখা হয় প্রয়োজনমত ব্যবহার করার জন্য। আবাদি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে কারেজ থেকে। নূরকে পাঠানো হল কারেজটি খুঁজে বের করার জন্য। উদ্দেশ্য আমাদের সাথের মালপত্র সব কারেজের কুয়োতেই ডাম্প করব। সেটাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ। অল্পক্ষণ পরেই নূর কারেজের সন্ধান বের করে ফিরে এল। আমরা

সবাই হ্যাভারস্যাকটা রেখে বাকি মালপত্র সব নিয়ে গিয়ে কারেজের একটি কুয়োতে ফেলে দিয়ে এলাম। এবার সর্বিকভাবে যাত্রা শুরু করতে আমরা প্রস্তুত।

বিসমিল্লাহ্ বলে আমরা পদযাত্রা শুরু করলাম শ্রীকরনপুরের উদ্দেশ্যে। ঘন্টায় গড়ে চার থেকে পাঁচ মাইল বেগে চলতে হবে। আকাশে বড় একটা চাঁদ। সপ্তঋষীর মন্ডল, ধ্রুবতারা, ক্যাসোপিয়া, ওরিয়েন্ট বেল্ট সবগুলোই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। কম্পাস ছাড়া তারকারাজির সাহায্যেও আমাদের পদযাত্রা চলতে পারে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কিভাবে তারকারাজির সাহায্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হবে সেটা আগেই ভালো করে রপ্ত করে নিয়েছি প্রত্যেকে। প্রথম ঘন্টা কেটে গেল নির্বিঘ্নে। পথে কোন লোকজনের সামনা-সামনি হতে হয়নি। বিরতি কাটিয়ে চলা শুরু হল আবার। মিনিট দশেক পর থমকে দাড়িয়ে পড়ে ইশারা করল মতি। এন্টি-ট্যাংক অবস্ট্যাকল সামনে। একটি খাল, খালে পানি। খালের দুই দিকেই ৬০μ এ্যাঙ্গেলের বেশি উচু **Any obstacle is always covered by fire** তাই ক্রসিং এর আগে প্রথমে রেকি করতে হবে। মতি ও আমি চললাম। একে অপরকে কভার করে চলেছি। কিছু হলে যাতে অবস্থার মোকাবেলা করা যায়। নূর অপেক্ষায় থাকল একটি বাবলা ঝোপের আড়ালে। রেকি করে দেখলাম। খালে বুক পর্যন্ত পানি। হেটেই ক্রস্ করা যাবে অসুবিধা নই। স্রোতও নেই তেমন। পাড়ে বসে ইনফ্রারেড বাইনোকুলার দিয়ে ক্রসিং এলাকাটা ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম। মতি ফিরে গিয়ে নূরকে সাথে করে নিয়ে এল। অল ক্লিয়ার এর আদেশের সাথে সাথে একে একে ট্যাকটিক্যাল ক্রসিং শুরু হল। সবার শেষে আমিও পার হয়ে গেলাম। ওপারে উঠে রুট অনুযায়ী আবার যাত্রা শুরু করলাম। গতি এবং সময়ের সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে অবিরাম ছুটে চলেছি নিঃশব্দে। ইশারা সঙ্কেতে প্রয়োজনমত ভাবের আদান-প্রদান চলছিল। আর দশ মিনিট হাটলেই দ্বিতীয় বিরতি। মতি সঙ্কেত দিল। সবাই মাটিতে শুয়ে পড়লাম। দেখলাম চারটি উটের একটি ছোট কাফেলা। একটি বর্ডার পেট্রোল মরু অঞ্চলে এভাবেই একটি **BOP (Border Observation Post)** থেকে অন্য **BOP** -তে পেট্রোলিং করা হয়ে থাকে উটের পিঠে চড়ে। ক্রলিং করে কাছেই কাটা ঝোপের মাঝে আস্তে ঢুকে গিয়ে পজিশন নিয়ে নিখর হয়ে শুয়ে থাকলাম। পেট্রোলটি উত্তর দিকে চলে গেল। ওরা হদিসও পেলনা তাদের উটের প্রায় পায়ের নিচেই শুয়ে রয়েছে জলজ্যান্ত তিনজন লোক। আমরা উঠে আবার হাটা শুরু করলাম। দ্বিতীয় বিশ্রামের পর কিছুদূর যেতেই মাটি খোড়ার শব্দ দুর থেকে ভেসে এল। থমকে দাড়িয়ে পড়লাম আমরা। ম্যাপ অনুযায়ী এখানেতো কোন পক্ষেরই কোন ডিফেনসিভ পজিশন থাকার কথা নয়। তবে মাটি খুঁড়ছে কারা? মতিকে পাঠানো হল রেকি করতে। একটি নতুন ডিফেন্সিভ লাইন তৈরি করতে বাংকার খোঁদা হচ্ছে। তাই নির্ধারিত রুট থেকে একটু বেকিয়ে কিছুদূর যেয়ে পরে আবার নির্ধারিত রুটে ফিরে আসতে হবে আমাদের। সেভাবেই কম্পাস বিয়ারিং এবং নাইট মার্চ চার্ট সেট করে আবার যাত্রা শুরু করলাম। ডিফেন্সিভ পজিশন বাইপাস করে এগিয়ে চললাম আমরা।

এখানে আর একটি নালা কেন? তবে কি আমরা ভুল পথে এগোচ্ছি? যাত্রা থামিয়ে ঝোপের আড়ালে তিনজনেই কম্বলের তলায় ঢুকে ম্যাপ দেখতে লাগলাম গভীর মনোযোগ দিয়ে। না আমরা ঠিক পথেই চলেছি। ওটা নতুন করে খোঁড়া হয়েছে। তবে সেটার অবস্থান ম্যাপের মার্কিং-এ নেই কেন? আমরা বর্ডার ক্রস করে ভারতীয় ডিফেন্সের সীমানায় ঢুকে পড়েছি। ঘড়িতে তখন আড়াইটা বাজে। হিসেবমত আমরা এখন ভারতীয় সীমার ভিতরে। এটা ভারতীয় ডিফেন্স এর অবস্ট্যাকল নতুন করা হয়েছে বিধায় ম্যাপের মার্কিং-এ নেই। একইভাবে সতর্কতার সাথে খালটা ক্রস্ করে পাড়ে উঠে এলাম। এখন থেকে বিপদের ঝুঁকি অনেক বেশি। চলতে হবে খুব সাবধানে। আর এক দেড় ঘন্টার মধ্যেই পৌছে যাবার কথা শ্রীকরনপুর শহরের সীমানায়। খালের পরই দেখলাম বাংকারে ভারতীয় সাজোয়া বাহিনীর ট্যাংকগুলো ডিপ্লয় (**Deploy**) করা আছে। বাংকারগুলো থেকে মাঝে মাঝে মানুষের কথোপকথোনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। গভীর রাত; তাই সমস্ত এলাকা জুড়ে ছিল অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। আমাদের এগিয়ে চলার জন্য এ ধরণের পরিবেশ অতি অনুকুল। চারিদিকে সর্তক দৃষ্টি রেখে ক্ষিপ্র গতিতে ভারতীয় ডিফেন্স এর ব্যূহ

ভেদ করে এগিয়ে চললাম আমরা। কেউ কিছু টের পেল না। বেশ কিছুদূর চলে এসেছি। হঠাৎ দেখি অল্প দুরত্বে কয়েকটি ট্যাংক। কতগুলো গাড়ি সেগুলোকে ঘিরে রয়েছে। বুঝলাম এটি হেডকোয়ার্টারস। ঐ অবস্থানকে পাশ কাটিয়ে চুপিসারে এগিয়ে চললাম গন্তব্যস্থলের দিকে। ইতিমধ্যে দূরদিগন্তে শ্রীকরনপুরের আলোকচ্ছটা দেখা যাচ্ছিল। আর মাত্র চার/পাচঁ মাইলের পরই পৌঁছে যাবো শ্রীকরনপুরে। আমাদের জোশ দ্বিগুন হয়ে গেল। পথের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে প্রায় দৌড়ে এগুতে থাকলাম সেই আলোকচ্ছটার দিকে। পৌনে চারটায় পৌঁছে গেলাম শ্রীকরনপুর শহরের সীমানায় একটি গ্রামে। গ্রামের প্রায় সবগুলি ঘর মাটি দিয়েই গড়া। প্রতিটি বাড়ির আঙ্গিনা মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গ্রামের ভেতর কুকুর ডাকছে। আমরা একটি পরিত্যাক্ত বাড়ির উঠোনে গিয়ে বসলাম। উঠোনটিও মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বসে বসে ভাবছি এখন আমাদের কি করা উচিত? ঠিক এ মুহুর্তে এমন অসময়ে জনবিরল শহরে আমাদের ঢোকা ঠিক হবে কিনা? অপরিচিত শহরে এমন অসময়ে তিনজন লোক ঘোরাঘুরি করাটা সন্দেহজনক হবে। তাই ঠিক করা হল সকাল হওয়ার পর আমরা শহরে ঢুকে জনগণের মধ্যে মিশে যাবো। তারপর ঠিক করা হবে কি হবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। চুপচাপ বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ করে ট্রেনের আগমনের আওয়াজ পেলাম। দেয়ালের বাইরে উকিঁ মেরে দেখলাম প্রায় ৬-৭শত গজ দূরে একটি ট্রেন ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে থামল। বুঝলাম এটা একটা ষ্টেশন। মুহুর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া হল ট্রেনে করে এই মুহুর্তেই পালাতে হবে বর্ডার এলাকা ছেড়ে। দৌড়ে ছুটলাম ষ্টেশনের দিকে। কাছে পৌঁছে দেখলাম লাল রঙ্গের একটি ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে আছে। কোথাকার ট্রেন কোথায় যাবে কিছুই জানি না; শুধু বুঝলাম এটা যাত্রী বহনের ভারতীয় ট্রেন। ষ্টেশনে লোকজন একদম কম। দৌড়ে গিয়ে একটি খালি কামরায় উঠে গেলাম নির্দ্বিধায়। উঠেই দরজা-জানালা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর ট্রেন সিটি বাজিয়ে ছেড়ে দিল। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাচঁলাম প্ল্যাটফর্মে উঠেই লক্ষ্য করেছি ষ্টেশনটির নাম শ্রীকরনপুর। শ্রীকরনপুর রাজস্থান প্রভিন্সের জেলা শ্রীগঙ্গানগরের অধীন একটি সাব ডিভিশন। আমাদের লক্ষ্য দিল্লী পৌঁছানো। ট্রেনতো যাচ্ছে দক্ষিনে কিন্তু আমাদের যেতে হবে উত্তর দিকে। কিছুক্ষণ পর ট্রেনটি একটি ষ্টেশনে এসে দাড়াল। একটি জংশন ষ্টেশন। উল্টো দিক থেকে আর একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আগমন ঘটল। আমরা আস্তে করে ট্রেন বদল করে অন্যটির একটি খালি কামরায় উঠে বসলাম। আমাদর ট্রেনটাই আগে ছাড়ল। চলেছি উত্তর দিকে। পথিমধ্যে আবার শ্রীকরনপুর পড়ল। করনপুর পেছনে পড়ে থাকল। আমাদের ট্রেন আমাদের নিয়ে ছুটে চলল। শারিরীক ক্লান্তি এবং মানসিক উৎকন্ঠা সব মিলিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে জেগে উঠলাম। জানাল খুলে দেখি সকাল হয়ে গেছে। ষ্টেশনের নাম শ্রীগঙ্গানগর। সবাই মহা খুশি। নেমে পড়লাম ষ্টেশনে। বর্ডার থেকে তখন আমরা অনেকে ভিতরে চলে এসেছি। আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে যেয়ে ডুকলাম। হাত মুখ ধুয়ে পোষাক বদলিয়ে ভদ্র হয়ে নিলাম প্রথমে। তারপর বসলাম ঠিক করতে, কি করা যায়? ঠিক হল এখন থেকে আমরা তিনজনই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। স্টাডি ট্যুর-এ বেড়িয়েছি, পুরো রাজস্থান ঘুরে বেড়াচ্ছি। তিনজনেই হিন্দু নাম গ্রহণ করলাম। আমি হলাম শ্রী সৌমেন ব্যানার্জি। মতি শ্রী মনোজ বোস আর নূর শ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। টাকা-পয়সার বন্দোবস্ত করতে হবে। কোলকাতা থেকে আগত বাঙ্গালী ছাত্র তাই পাকিস্তানী টাকা ভাঙ্গানো বিপদজনক হবে। ঠিক হল আংটি দু'টো বিক্রি করার চেষ্টা করতে হবে। ষ্টেশন মাষ্টারের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম শহর ষ্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। দোকানপাট ৯টার আগে খুলবে না। অগত্যা ৯টা পর্যন্ত ওয়েটিং রুমেই অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক ৯টায় তিনজনই বেরিয়ে পড়লাম। আমার ও মতির গলায় ঝুলিয়ে নিলাম ক্যামেরা দু'টো, নূরের পিঠে হ্যাভ্যারস্যাক। চোখে রেবনের সানগ্লাস, টুরিষ্টের মতই লাগছিল তিনজনকে। শহরে পৌঁছে দেখলাম কয়েকটা রাস্তাকে কেন্দ্র করেই ডিষ্ট্রিক হেডকোয়ার্টারস গঙ্গানগর শহর। মফস্বল শহর তাই খুব একটা বড় নয়। শহরের প্রধান রাস্তাগুলির দুই দিকে সব দোকানপাট। একসাথে দুই তিনটি সোনার দোকান। সবচেয়ে বড়টিতে গিয়ে ঢুকলাম। দোকানের মালিক ধুতি নিমা পড়া তিলক কাটা মোটা গোছের একটি লোক

ধুপধুনো জ্বেলে গদিতে বসে পূঁজো করছিলেন। পুঁজা সেরে হরিণাম জপতে জপতে আমাদের কাছ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, "কি চাই?" জবাবে বললাম,

— আমরা ছাত্র। কোলকাতা নিবাসী। স্টাডি ট্যুরে এসে টাকা-পয়সার অভাব দেখা দিয়েছে; তাই আংটি দু'টো বিক্রি করতে চাই।

আংটি দু'টো হাতে নিয়ে পরখ করে দেখে মালিক বললো,

— চারশো টাকা পাবে।

বলে কি ব্যাটা! আমরা জানি পাকিস্তান থেকে ভারতে সোনার দাম বেশি। তাছাড়া ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যও অনেক বেশী। সেক্ষেত্রে মালিক আমাদের যে দাম দিতে চাচ্ছে তার দ্বিগুন দামই আমাদের পাওয়া উচিত। ব্যাটা বেনিয়া আমাদের অসুবিধার সুযোগ নিয়ে ডাহা ঠকাবার চেষ্টা করছে। ভীষণ রাগ হল তার ফন্দি বুঝতে পেরে। আংটি দু'টো ফেরত নিয়ে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে। অন্য দোকানে আর গেলাম না। বুঝতে পারলাম ওতে বিশেষ লাভ হবে না। ভীনদেশে অবস্থার সুযোগ নিয়ে সব বেনিয়াই ঠকাবার চেষ্টা করবে। ঠিক করলাম একটা ক্যামেরা বেচে দেব। একই রাস্তার উপর সবচেয়ে বড় ক্যামেরার দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দোকানের মালিক ২৪-২৫ বয়সের এক তরুণ। জামা কাপড়ে বেশ ফিটফাট। হিন্দী-উর্দ্দু মিশিয়ে তাকে আমাদের সমস্যা বুঝিয়ে বললাম,

— একটা ক্যামেরা বেচে দিতে চাই। তরুণ যুবক আমাদের অবস্থা শুনে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলো।

ক্যামেরা দু'টো হাতে নিয়ে বললো,

— এতো অত্যন্ত দামী ক্যামেরা। বিদেশ থেকে ইম্পোর্টেড?

— হ্যাঁ ভাই বিদেশ থেকেই প্রবাসী আত্মীয়ের মাধ্যমে খুব শখ করে আনিয়েছিলাম। নেহায়েত বিপাকে পড়েই বিক্রি করতে হচ্ছে।

— কিন্তু এতো দামী ক্যামেরা এই ছোট শহরে ভালো দামে বিক্রি করতে পারবে না। তাছাড়া শখের জিনিষ কষ্ট করে আনিয়েছ বিক্রি করে দিলে আর কিনতেও পারবে না। তাই বলছি কি, তোমাদের কাছে আর অন্য কিছুই কি নেই?

— আছে ভাই। দু'টো স্বর্নের আংটি। বলে পকেট থেকে আংটি দু'টো বের করে ওর হাতে দিলাম এবং সোনার দোকানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ওকে সব খুলে বললাম।

সব শুনে ও একটু হাসল। বললো,

বলেই যুবক দোকানের কর্মচারীটিকে ডেকে আমাদের চা এনে দিতে বলে বেরিয়ে যাচ্ছিল; চায়ের কথা বলতেই আমরা বলে উঠলাম,

— চায়ের প্রয়োজন নেই ভাই। আমাদের আংটি দু'টো বিক্রি করে দিতে পারলেই আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

— সে আমি দেখছি। চা খাও। এতদূর থেকে তোমরা আমাদের রাজস্থন সফরে এসেছো। তোমাদের একটু আপ্যায়ন করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে?

যুবকের আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করলো। কর্মচারী ইতিমধ্যে চা-নাস্তার যোগাড় করতে বেরিয়ে গেছে। যুবকটিও আমাদের দোকানে বসিয়ে বেরিয়ে গেল। অপরিচিত তিনজন লোকের কাছে পুরো দোকান ফেলে দিয়ে যেতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হল না। অপরিচিত ভীনদেশে এমন একজন সাহায্যকারী পেয়ে ধন্য হলাম। কর্মচারী গরম গরম লুচি তরকারী ও চা এনে রাখল সামনে। খাবারের গন্ধ পেয়ে এতক্ষন কষ্ট করে ভুলে থাকা ক্ষুধা পেটে মোচড় দিয়ে উঠলো। দেরি না করে গোগ্রাসে লুচি তরকারী খেলাম। তারপর আস্তে আস্তে সুখ করে খেলাম গরম ধূমায়িত চা। নাস্তা পেটে পড়ায় শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো। মিনিট বিশেক পর যুবক হাসিমুখে ফিরে এল।

— তোমাদের কাজ হয়ে গেছে এই নাও। বলে আটশত পঞ্চাশ টাকা আমার হাতে দিল। চা নাস্তা খেয়েছতো?

— হ্যাঁ খুব মজা করে খেলাম লুচি তরকারী আর চা। ভাই তোমার নামটা জানতে পারি কি?

— নিশ্চয়ই, রমেশ ত্রিপাঠি। আমরাও আমাদের বাঙ্গালী হিন্দু নামের পরিচয় দিলাম।

— রমেশ ভাই তুমি যদি কখনও কোলকাতায় আস তবে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। বিদেশে তোমার কাছ থেকে পাওয়া আন্তরিকতা এবং সাহায্যের কথা চিরকাল মনে থাকবে।

তিন নম্বর পার্ক সার্কাস, একটা ভুঁয়া ঠিকানা দিয়ে রমেশকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে ওর দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

আজকের পৃথিবীতে ভাল লোক যে একদম নেই তা নয়। রমেশের মতো ভাল লোক কিছু রয়েছে বলেই পৃথিবীর চাকা এখনো ঘুরছে। রমেশের দোকান থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে বসলাম একটা বড় আকারের রেষ্টুরেন্টে। পেটে লুচি তরকারী এবং চা পড়ায় ক্ষুধা বেড়ে গিয়েছিল। পেটপূজা না সারা পর্যন্ত অন্য কিছুতেই মনযোগ দেয়া সম্ভব নয়। পেটভরে খাওয়া হল মুরগির রোস্ট, পরোটা, তরকারী এবং ঘন ডাল। হিন্দুদের অন্য ধাঁচের রান্না। **Change of Test** ভালোই লাগলো। আমাদের খাওয়ার নমুনা দেখে বাচ্চা বয়টা অবাকই হয়ে গিয়েছিল।

পেট পুরে খাওয়ার পর নূর গেল খবরের কাগজ কিনতে। দু'তিনটা খবরের কাগজ নিয়ে সে ফিরে এল। খবরের কাগজ খুলতেই দেখা গেল বাংলাদেশের উপর বিস্তারিত সচিত্র সংবাদ। জনাব নজরুল ইসলাম, জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে প্রবাসে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হওয়ার সংবাদ, মুক্তি ফৌজের সংবাদ, সবকিছুই বিস্তারিতভাবে ছাপা হয়েছে। ভারতীয় সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতার কথাও লেখা হয়েছে। রনাঙ্গনের ছবিতে মেজর খালেদ মোশাররফের ছবি ছাপা হয়েছে। মুক্তি ফৌজের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। কাগজগুলো থেকে বুঝতে পারলাম আমরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যতটুকু জানতাম ঘটনা প্রবাহ তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। সত্যিই যুদ্ধ চলছে বাংলার মাটিতে। স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদানের জন্য ঝুঁকি নিয়ে আমরা ভুল করিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রনাঙ্গনে যেয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হবে আমাদের। তিনজনে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম নিচু স্বরে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের চোখে ফাঁকি দিয়ে মুজিবনগর যাবার চেষ্টা করা হবে রিস্কি। নিয়ম অনুযায়ী বর্ডার ক্রস করার পর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পন করাটাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। স্বেচ্ছায় ধরা দিলে আমাদের উদ্দ্যেশ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ দেখা দেবে না ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মনে। ধরা না দিলে আমাদের উদ্দ্যেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকবে। কিন্তু ধরা দেব কোথায়? গঙ্গানগরে ধরা দিলে অযথা সময় নষ্ট হবে। কারণ আমাদের ব্যাপারে সব সিদ্ধান্তই আসবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে এখানকার কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী হয়ে কেন্দ্রীয় নির্দেশের অপেক্ষায় সময় নষ্ট হবে অযথা। তাছাড়া তিনজন কমান্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য জানার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হবে নিম্ন পর্যায়ে। তা সহ্য করার মত মানসিক এবং শারিরীক অবস্থা বর্তমানে আমাদের কারোই নেই। তার চেয়ে বরং দিল্লী পৌঁছে আত্মসমর্পন করাটাই হবে শ্রেয়। যা হবার সেখানেই হোক। ঠিক হল দিল্লী যেয়েই আত্মসমর্পন করা হবে **Ministry of External Affairs** -এ। কিন্তু বর্ডারে আত্মসমর্পন না করে দিল্লী পর্যন্ত পৌছানোর জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মনে যাতে কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি না হয়- কেন বর্ডারে আত্মসমর্পন না করে আমরা দিল্লী রওনা হলাম, তার যুক্তি বর্ণনা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে একটি আবেদনপত্র লিখে ফেললাম তিনজনে মিলে। ঠিকানা লেখা হল মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার, প্রযত্নে **Ministry of External Affairs**, রাষ্ট্রপ্রতি ভবন, সাউথ ব্লক, নয়া দিল্লী। পোস্ট অফিসে গিয়ে রেজিষ্ট্রারড মেইল-এ চিঠিটা পাঠিয়ে রশিদ নিয়ে ফিরে এলাম রেষ্টুরেন্টে। পোষ্ট মাষ্টার বলেছিলেন দু'এক দিনের মধ্যেই চিঠিটা পৌঁছে যাবে দিল্লীতে। চিঠিটার একটা কপি পাঠাতে হবে মুজিবনগর সরকারের কাছে। এ এলাকা থেকে মুজিবনগর সরকারের কাছে রেজিস্টারড পোষ্ট পাঠান যুক্তিসঙ্গত হবে না। ঠিক করলাম দিল্লী থেকে ওটা পোষ্ট করব। এরপর নূরকে পাঠানো হল ষ্টেশনে দিল্লী যাবার টিকিট করার জন্য। ফিরে এল নূর। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় কালকা মেইলে করে দিল্লী যাব আমরা। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনটি টিকেট কেটে নিয়ে এসেছে নূর। পয়সা কম থাকায় প্রথম শ্রেণীর টিকেট কাটা সম্ভব হয়নি। হাতে প্রচুর

সময়। দুপুরে আর একপ্রস্থ খাওয়া-দাওয়া করে শহরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখার জন্য বেরুলাম। ঘুরে ফিরে দেখছি আর ক্যামেরায় ছবি তুলছি স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখার জন্য। ছোট্ট শহর ঘোরা শেষ হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। ঠিক হল সময় কাটানোর জন্য **Matinee Show** সিনেমা দেখব। একটি হলে গিয়ে দেখলাম 'অঞ্জনা' চলছে। ববিতা-রাজেন্দ্রকুমার অভিনীত। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম। মফস্বল শহরের সিনেমা হল। ব্যবস্থা মোটামুটি। ভরদুপুর রোদে উপরের টিনের চাল তেতে উঠেছে। ভীষণ গরম লাগছিল লোকের ভীড়ে। সদ্য মুক্তি পাওয়া ছবি। **House Full** কিন্তু বেশ মজাই লাগছিল বাদাম, চানাচুড় চিবুতে চিবুতে ছবি দেখতে। ছবি শেষ হল। হল থেকে বেরিয়ে এলাম বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। আবার গিয়ে বসলাম সেই সকালের হোটেলে। আর একপ্রস্থ খাওয়া হল। ধীরে সুস্থে পৌনে সাতটায় ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম। কালকা মেইল ট্রেন আসবে সাড়ে সাতটায় কিন্তু তখনও প্ল্যাটফর্ম একদম খালি। ব্যাপার কি? টিকেট কালেক্টরকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, ট্রেন সাড়ে ছয়টায় ছেড়ে চলে গেছে। মানে? মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! নূর বোর্ড থেকে ট্রেনের সময় সাড়ে ছয়টার জায়গায় সাড়ে সাতটা পড়েছে। ভীষণ রাগ হল। মতি ও আমি নূরকে তার গাফিলতির জন্য বকাবকি করতে লাগলাম। আমাদের বকাবকি শুনে কালেক্টর সাহেব এগিয়ে এসে বললেন,

— যা হবার তা হয়ে গেছে। গোলমাল করে সময় নষ্ট না করে ট্যাক্সি পাকড়ো। ড্রাইভারকে বকশিশ দেবার কথা বললে ও তোমাদের ট্রেন পৌঁছানোর আগেই পরের ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে।

তার মধ্যস্থতায় একটি ট্যাক্সি ঠিক করে উঠে বসলাম। কালেক্টর সাহেব ড্রাইভারকে পাঞ্জাবীতে সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শিখ ড্রাইভার তার হিন্দুস্থান ট্যাক্সি চালিয়ে দিল উল্কা বেগে। রাস্তার অবস্থা মোটামুটি। তীব্র বেগে ছুটে চলেছে আমাদের ট্যাক্সি। ভাবলেশহীন অবস্থায় ষ্ট্যায়ারিং হাতে বসে আছেন সরদারজী। আমরাও চুপ করেই বসেছিলাম। মুখে কেউ কিছু না বললেও প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে বোধ হয় আর যাওয়া হল না। রাজস্থানের এই মরুভূমিতেই মোটর দুর্ঘটনায় অক্কা পেতে হবে। মনে মনে দোয়া-দুরুদ পড়তে লাগলাম। সরদাজীর চেষ্টা সার্থক হল, ট্রেনের আগেই সে আমাদের পৌঁছে দিল পরর্বতী ষ্টেশনে। ড্রাইভার পাঞ্জাবীতে বলল,

— দেখো সাবজি আছি পৌহছ-ই-গ্যায়ে।

সরদারজীর মুখে একটা গর্বের হাসি। আমরা ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়ার উপর মোটা বকশিশ দিতেই সরদারজীর হাসি আরো বড় আকার ধারন করল। মিনিট পনেরো পর ট্রেন এসে গেল। আমরা নিজেদের নির্দিষ্ট কামরায় গিয়ে উঠে বসলাম। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর নেমে গেল। মেইল ট্রেন ছুটে চললো। কামরায় আমরা মোট চারজন যাত্রী। দূরপাল্লার মেইল ট্রেন। বুফে কার আছে। বিছানা পত্রেরও বন্দোবস্ত রয়েছে। পয়সা দিয়ে বিছানা আনিয়ে নিয়ে যার যার বার্থে শুয়ে পড়লাম। রাতে ছুটে চলেছে কালকা মেইল। পরদিন ভোরে দিল্লী পৌঁছবো আমরা। ট্রেনের শব্দ ও মৃদুমন্দ দোলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানান কথা চিন্তা করতে করতে এক সময় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেকদিন পর আরামের ঘুম হল। হঠাৎ করে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখি আমাদের সহযাত্রী পাশের ভদ্রলোক আগেই ঘুম থেকে জেগে জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে বসে আছেন। শুয়ে শুয়েই দেখলাম বাইরের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। ভোরের পূর্বাভাস দেখতে দেখতে চারিদিক ফর্সা হয়ে এল। পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্যের উদয় হল। উদীয়মান সূর্যের লালিমায় রক্তিম হয়ে উঠল পূর্ব আকাশ, সূর্যের আলোয় জেগে উঠল পৃথিবী। জানালা তুলে দিলাম আমি। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগলো চোখেমুখে। মুখ ঘোরাতেই চোখে পড়লো -পাশের ভদ্রলোক সূর্যের দিকে চেয়ে নমষ্কার করছেন, আর বিড়বিড় করে কি সব বলছেন। বুঝলাম সূর্য দেবের ভক্তি করে মন্ত্র পাঠ করছেন ভদ্রলোক। আমি উঠে টয়েলেটে গিয়ে ঢুকলাম। প্রাতঃক্রিয়া সেরে হাতমুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে দেখি মতি ও নূর তখনও ঘুমুচ্ছে। ওদের ডেকে তুললাম। একে একে ওরাও প্রাতঃক্রিয়া সেরে আমার পাশে এসে বসল। কালকা মেইল ঘন ঘন হুঁইসেল দিতে দিতে মন্থর গতিতে এগুচ্ছিল। ঘড়িতে তখন ৬:৩০ মিনিটের উপরে বাজে। বুঝলাম দিল্লীর কাছাকাছি এসে গেছি। ৭টায় পৌঁছানোর কথা। ঠিক সাতটার সময়

কালকা মেইল এসে থামল দিল্লী ষ্টেশনে। বিরাট বড় দিল্লী ষ্টেশন। অসম্ভব ভীড়। এত সকালেও লোকজনের অভাব নেই। ব্যস্তভাবে সবাই ছুটোছুটি করছে। একটির পর একটি গাড়ি দাড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন এসে থেমে গেল। ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না, এত সহজেই দিল্লী পৌঁছে গেলাম। ট্রেন থেকে নেমে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরুতেই ট্যাক্সিওয়ালারা ঝেঁকে ধরল। একজন এসে বললো,

— বাঙ্গালীবাবু, ট্যাক্সি চাইয়ে?

বললাম,

— হ্যাঁ, নিয়ে চল মাঝারি দামের ভাল কোন হোটেলে। সিটি সেন্টারের কাছাকাছি হলে ভাল হয়।

— লে চল্‌তে হে, সাব আইয়ে।

বলে ও আমাদেরকে ওর ট্যাক্সির কাছে নিয়ে গেল। দরজা খুলে আমরা ভেতরে বসলাম। ২০-২৫ মিনিটের মধ্যেই চালক একটি হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল। হোটেল নটরাজ। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রিসেপশনে এগিয়ে গিয়ে দু'টো কামরা বুক করলাম। একটি সিঙ্গেল রুম আমার জন্য, আর একটি ডাবল রুম মতি ও নূরের জন্য। পাশাপাশি কামরাই পাওয়া গেল। পোর্টার আমাদের হ্যাভারস্যাক কাধে তুলে কামরায় পৌঁছে দিল। থ্রি-ফোর ষ্টার হোটেল। ভালোই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। চার্জও রিজেনেবল। প্রতিটি কামরার সাথে ছোট্ট একটা ব্যালকনি। ব্যালকনি থেকে দিল্লী শহরের অনেকদূর দেখা যায়। আমরা রুম পেয়েছিলাম চার তলায়। প্রতিটি রুমের সাথেই রয়েছে এটাচ্যাড বাথরুম। **Hot shower** নেয়ার পর ট্রেন সফরের ক্লান্তি, গ্লানি সব দূর হয়ে গেল। রুম সার্ভিস ডাকিয়ে নাস্তা করলাম তিনজন একত্রে। নাস্তা খেতে খেতে ঠিক করে নিলাম ২০ তারিখ সকালে নিজেদের সমর্পন করব **Ministry of External Affairs** -এ গিয়ে। ইতিমধ্যে আমাদের পোষ্ট করা চিঠিও পৌঁছে যাবে কর্তৃপক্ষের হাতে।

দিল্লীর অভিজ্ঞতা

দিল্লীতে আমাদের মিশ্র অভিজ্ঞতা হয়। উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমরা খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ এবং ভবিষ্যত বাংলাদেশ নিয়ে ভারতীয় নীল নক্শা আমাদের হতাশ করেছিল।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্ল্যান অনুযায়ী ২০শে এপ্রিল **Ministry of External Affairs** এ গিয়ে নিজেদের সারেন্ডার করলাম রাষ্ট্রপতি ভবনের সাউথ ব্লকে। সেখানে আমাদেরকে জেনারেল ওবান সিং (তদানিন্তন রিসার্চ এন্ড অ্যানালাইসিস উইং (**RAW**) প্রধান) এর হাতে আমাদের হস্তান্তর করা হলো। তখন থেকেই আমরা রইলাম তার নিয়ন্ত্রণে। ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ নামের এক ভদ্রলোক হলেন আমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ৪ দিন ৪ রাত্রি আমাদের কঠিন সওয়াল সেশন চললো। সেশনগুলো পরিচালনা করেছিলেন বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা। আমরা যতটুকু সম্ভব সোজাসুজি এবং সত্য জবাবই দেবার চেষ্টা করছিলাম।

একদিন বিকেলে জনাব একে রায় দু'জন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোক দু'জন ছিলেন জনাব শাহাবুদ্দিন ও জনাব আমজাদ হোসেন। জনাব শাহাবুদ্দিন ও জনাব আমজাদ হোসেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় সচিব হিসেবে পাকিস্তান দিল্লী মিশনে কর্মরত ছিলেন। প্রবাসী সরকার ১৭ই এপ্রিল গঠিত হওয়ার খবর জেনে তারা দু'জনে দুতাবাস থেকে **Defect** করে ভারতীয় সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ভারত সরকার তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে তাদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাদেরকেও আমাদের মত গোপন আরেকটি সেফ হাউজে রাখা হয়েছে। আমাদের মত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দু'জন তরুণ অফিসারও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। খুব খুশি হলাম ওদের পেয়ে। তারাও খুশি হলেন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। ওরা বাংলাদেশের সংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছুই বলেছিলেন। আমাদের মতো অভিজ্ঞ অফিসার যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন, তারা সে কথাও উল্লেখ করলেন।

ইতিমধ্যে আমরা বিগ্রেডিয়ার নারায়ণকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মুজিবনগর সরকারের সাথে আমাদের বিষয়ে ভারত সরকার কোন যোগাযোগ করছে কিনা? জবাবে বিগ্রেডিয়ার জানিয়েছিলেন যোগাযোগ করা হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের কয়েকজন নেতা আসছেন দিল্লীতে। তাদের কাছেই আমাদের হ্যান্ডওভার করে দেওয়া হবে। এটা ছিল আমাদের জন্য একটি বিশেষ সুখবর। অবশেষে, একদিন প্রতিনিধি দল এসে পৌছাল। জনাব তাজুদ্দিন আহমদ (প্রধানমন্ত্রী), জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) এবং কর্নেল ওসমানী (মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ) এরাই প্রতিনিধি দলের মূল ব্যক্তি। বৈঠকের এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন হঠাৎ করে বললেন, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাদের আরো সপ্তাহ দু'য়েক দিল্লীতেই থাকতে হবে। এ সময়ে ভারতীয় বিভিন্ন এজেন্সির বিশারদরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সর্ম্পকে ব্রিফিং দেবেন এবং স্পেশালাইজড অফিসার হিসেবে আমাদের যুদ্ধে যোগদানের পর যে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হবে সে বিষয়েও বিস্তারিত জানাবেন।

তার সিদ্ধান্ত শুনে কিছুটা অবাক হলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে না জেনে ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ব্রিফিং নিতে হবে কেন? তাহলে আমাদের সংগ্রামের প্রতি ভারত সরকারের সহানুভূতি নিঃস্বার্থ নয়? বুঝতে পারলাম ভারত সরকারের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর। মুজিবনগর সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। কেমন যেন ঘোলাটে ঠেকলো ব্যাপারটা। বেশ কিছু প্রশ্ন দেখা দিল মনে।

বাংলাদেশের সংগ্রাম কাদের সংগ্রাম? কাদের নিয়ন্ত্রনে সংগঠিত হচ্ছে এ যুদ্ধ? ভারত নেপথ্যে থেকে কি স্বার্থে কলকাঠি নাড়ছে? পৃথিবীর সব দেশের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রাম হিসেবে সংগঠিত হয়েছে, জাতীয় সরকারের অধিনে। আমাদের বেলায় এর ব্যাতিক্রম কেন? কেন তড়িঘড়ি করে প্রবাসে দলীয় আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হল ভারত সরকারের প্রচ্ছন্ন অনুমোদনে? জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত আপামর জনগণের উপর আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়ার উদ্দ্যেশ্য কি? আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে শুরু করে উনসত্তরের গণআন্দোলন সবকিছু সংগঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল সবগুলো রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের একলা চল নীতি কি কারণে সমর্থন করছে ভারত সরকার?

পরদিন আমাদের স্থানান্তরিত করা হল দিল্লীর পালাম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কাছে গ্যারিসন এলাকার একটি সামরিক প্রশিক্ষন কেন্দ্রে। সেখানে পরিচয় হল মেজর সুরজ সিং এর সাথে। পাকানো স্বাস্থের অধিকারী মেজর সুরজ সিং একজন বিচক্ষণ কমান্ডো এবং **Insurgency and counter insurgency expert;** ব্রিগেডিয়ার নারায়ণও তাই। এরা দু'জনেই আমাদের মূল শিক্ষক। আমাদের জন্য দু'সপ্তাহের একটি **crash course** এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে **Insurgency and counter insurgency, guerilla warfare, urban warfare, jungle warfare, shall arms, explosive, unarmed combat** সবকিছুই রয়েছে। **Specialized officer** হিসেবে আমরা তিনজনই এ সমস্ত বিষয়ে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত। তবুও যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দেবার আগে আমাদের জ্ঞানকে ঝালাই করে নেবার সুযোগ পেয়ে ভালোই হল। শুরু হল আমাদের প্রশিক্ষন। এ সমস্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি চললো স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত ব্রিফিং। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান আর্মির শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ প্রভৃতি সংগঠনের বাঙ্গালী সদস্যরা। তাদের কেন্দ্র করে জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে সৃষ্টি হয়েছে মুক্তি সংগ্রাম। এ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে দলমত নির্বিশেষে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য পেশাধারী জনগণের বৃহদাংশ। ভারত সরকার বাংলাদেশের ঘটনাবলী অতি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষন করছে। বাংলাদেশ থেকে বর্ডার ক্রস করে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে লক্ষ লক্ষ শরনার্থী। এভাবেই ভারত সরকার সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে, অনেকটা মানবিক কারণেই। স্বতঃস্ফুর্তভাবে গড়ে উঠা স্বাধীনতার সংগ্রামকে ফলপ্রসু করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের। আওয়ামী লীগকেই দিতে হবে সেই নেতৃত্ব। এর জন্যই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে অস্থায়ী আওয়ামী লীগ সরকার। ভারত আওয়ামী লীগ ও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে বিশ্বাস করে। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বে সংগঠিত করে তুলতে হবে এ সংগ্রাম। আওয়ামী লীগ ও সদ্য গঠিত প্রবাসী সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনের বাইরে অন্য কোন রাজনৈতিক দল ভিন্ন কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী গ্রুপ কিংবা ব্যক্তি কাউকেই কোন সাহায্য করবে না ভারত সরকার। আওয়ামী লীগ সরকারের একক কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বিরোধিতা করতে পারে মূলতঃ দুইটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি।

প্রথমত: পাকিস্তান সেনা বাহিনীর প্রাক্তন সব সদস্যরাই দীর্ঘ দিন যাবত রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদারিত্ব করেছে। তাদের কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে প্রতিরোধ সংগ্রাম। তাই এ সংগ্রামের কর্তৃত্ব দাবি করে তারা ক্ষমতালিপ্সু হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারেন।

দ্বিতীয়ত: হুমকি আসতে পারে চরমপন্থী নকশালীদের কাছ থেকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটেছে চরমপন্থীদের। তাছাড়া বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা মনিপুর, মিজোরাম প্রভৃতি প্রদেশে নকশালী তৎপরতা ক্রমবর্ধমান। ভারতের পূর্বাঞ্চলের নকশালীরা বাংলাদেশের চরমপন্থীদের সাথে এক হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগে মিলিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠতে পারে। এই মিলিত

শক্তি আবার একত্রিতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে নেবার চেষ্টাও করতে পারে ঐ সমস্ত অঞ্চলের চলমান বিচ্ছিন্নবাদী সংগ্রামে। এসমস্ত ক্ষমতালিপ্সু শক্তিসমূহকে সমূলে উৎপাটন করে যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ এখন থেকেই গ্রহণ করা উচিত বলে ভারত সরকার মনে করে। একইভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যাতে কোনক্রমেই ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হয়ে না দাড়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চক্রান্তের ফলে তার জন্যও প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই। এ ব্যাপারে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীও একমত হয়েছেন। যৌথ উদ্যোগে একটি পরিকল্পনাও প্রনীত হয়েছে। ঠিক হয়েছে, আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করা কর্মীদের নিয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হবে। এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হবে এক লক্ষ। বিশেষ ট্রেনিং ক্যাম্পে ওদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। এ বাহিনীর রিক্রুটমেন্ট, ডিপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সব কিছুই থাকবে মুক্তি বাহিনীর কমান্ডের আওতার বাইরে। এ বাহিনী সরাসরিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দ্বারা। এদের সশস্ত্র করা এবং পরিচালনা করার দায়িত্ব নেবে ভারত সরকার। ভারত সরকারের তরফ থেকে এ বাহিনী গঠনের মূল দায়িত্বে থাকবেন জেনারেল ওবান সিং। এদের মূল কাজ হবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা। প্রশিক্ষণের পর এদের দলে দলে পাঠানো হবে বাংলাদেশের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে। ভেতরে গিয়ে নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করে তারা প্রস্তুত হয়ে থাকবে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি যে কোন চ্যালেঞ্জ এর মোকবিলা করার জন্য। এ বাহিনীর নাম রাখা হবে বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স)। যুদ্ধকালে এবং স্বাধীনতার পরে পর্যায়ক্রমে ঐ বাহিনীর নাম রাখা হয় মুজিব বাহিনী এবং কুখ্যাত রক্ষীবাহিনী। বাংলাদেশ সরকার আমাদের তিনজনকে মনোনীত করেছে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সহযোগিতায় এই বিএলএফ গঠন করার জন্য। আমাদের **totally non-political** মনে করে এবং মুজিবর রহমানের প্রতি আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা দেখেই বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আমাদের পেশাগত যোগ্যতা, সাহস, অন্ধ দেশপ্রেম, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং সিনসিয়ারিটি সম্পর্কে নিশ্চয়ই কনভিন্স হয়েছিলেন দুই সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল। সুদূরপ্রসারী এ নীল নকশা এবং ভারত সরকারের মনোভাব জানতে পেরে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে উঠল। গত কয়েকদিন যাবত মনে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো দেখা দিয়েছিল সেগুলোর অনেকগুলোরই জবাব পেয়ে গেলাম। জানবাজী রেখে যারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, অকাতরে প্রাণ দিতে কুন্ঠিত হচ্ছেন না যারা, তাদের প্রতি কী অবিশ্বাস! ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য নিবেদিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করার কী ভয়ানক ষড়যন্ত্র! শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের সাথে কী চরম বিশ্বাসঘাতকতা! চানক্যবুদ্ধির এ নীল নকশা ফাটল সৃষ্টি করবে জাতীয় ঐক্যে। জাতি হয়ে পড়বে বিভক্ত। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত হয়ে উঠবে দুর্বল। নস্যাৎ হয়ে যাবে জাতীয় সংগ্রামী চেতনা। অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত দুর্বল বাংলাদেশ পরিণত হবে একটি করদ রাজ্যে। নাম সর্বস্য বাংলাদেশের খোলসে অর্থহীন হয়ে পড়বে স্বাধীনতা। আট কোটি বাংলাদেশীর মুক্তির আকাঙ্খা পথ হারাবে বিশ্বাসঘাতকতার চোরাবালিতে। একই সাথে নির্মূল করা হবে ভারতের বিভিন্ন জাতিসত্বার স্বাধীনতার সংগ্রামগুলোকেও।

মন বিদ্রোহ করে উঠল। এ চক্রান্তের অংশীদার হতে পারবো না। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এ নীল নকশার বিরুদ্ধে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে সহযোদ্ধাদের। ঐক্যমত্য সৃষ্টি করতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে; অতি সংগোপনে। অন্যের দেয়া নামেমাত্র স্বাধীনতা নয়, প্রকৃত স্বাধীনতাই অর্জন করতে হবে। নিজেদের শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের। শিক্ষা নিতে হবে গণচীন, ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস থেকে।

১৯৭১ সালের ২৫-২৬শে মার্চের কালোরাত্রি, মুক্তিযুদ্ধের জন্য আওয়ামী লীগের প্রস্তুতি এবং যুদ্ধ সর্ম্পকে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি সর্ম্পকে মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি তার বই

'সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট' এ লিখেছেন, "২৫শে মার্চের রাতে সামরিক জান্তার পাশবিক ক্র্যাকডাউনের পর যেহেতু ঐ ধরনের কোন সামরিক অভিযানের মোকাবেলা করার কোনো প্রস্তুতি আওয়ামী লীগের ছিল না সেই পরিপ্রেক্ষিতে নেতাদের সবাই ভারতে পালিয়ে গিয়ে কোলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, 'অখন্ড ভারতের' স্বপ্নদ্রষ্টা পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর যোগ্য উত্তরাধিকারী দীর্ঘদিন যাবত এ ধরনের একটি সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। শ্রীমতি গান্ধী এই সুবর্ণ সুযোগের সময়মত যথাযথ সদব্যবহারই করলেন। ভারত যে শুধুমাত্র তাদের দীর্ঘদিনের প্রধান ও এক নম্বর শত্রু পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করে দেশটিকে দুর্বল করতে সক্ষম হয় তাই নয়; এই মুক্তিযুদ্ধের আবরণে সাফল্যের সাথে পশ্চিমবঙ্গ ও তার আশেপাশের প্রগতিশীল বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলোকেও নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়।"

<u>২৫-২৬শে মার্চ ১৯৭১ এর বিভিষিকাময় কালোরাত্রির প্রত্যক্ষ সাক্ষী:</u>
খালাম্মা, নিম্মী এবং বাপ্পী ২৫-২৬শে মার্চের আর্মি অপারেশন এবং এর ভয়াবহ পরিণামের জীবন- সাক্ষী। তাদের বর্ণনা লোমহর্ষক এবং এক করুণ উপাখ্যান।

ফেব্রুয়ারীর শেষে মা (খালাম্মা) কোলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। উদ্দ্যেশ্য দেশের অবস্থা দেখে শুনে প্রয়োজন হলে আমাকে ও নিম্মীকে সঙ্গে নিয়ে কোলকাতায় ফিরে যাবেন। ২৫শে মার্চ রাত প্রায় ১০টা অব্দি তিনি শেখ সাহেবের বাসাতেই ছিলেন। ৩২নং ধানমন্ডি থেকে লালবাগের বাসায় ফেরেন রাত প্রায় সাড়ে দশটায়। বাসায় ফেরার পর সবাই তাকে ধরে বসলাম নেতা কি বললেন? মা শুকনো বিচলিত কন্ঠে জবাব দিলেন,
-নেতাকে অনেক বোঝানোর পরও তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে রাজি হলেন না। পার্টির নেতা কর্মীরা, ছাত্রনেতারা, অন্যান্য অনেকেই আসন্ন সামরিক অভিযান সম্পর্কে শেখ মুজিবকে সতর্ক করে দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, পাক বাহিনী যদি জনগণের উপর ঝাপিঁয়েই পড়ে তখন জনগণের পাশে থেকে প্রতিরোধ সংগ্রামে তিনি তাদের নেতৃত্ব দেবেন সেটাই তাদের প্রত্যাশা। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমানের এক কথা, তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। অস্ত্রের রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। পাক বাহিনী নিরীহ জনগণের উপর শ্বেত সন্ত্রাসের ষ্টিম রোলার চালিয়ে দেবে এ ধারণা সম্পর্কেও তার দ্বি-মত ছিল। তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেছিলেন, প্রয়োজনবোধে সামরিক জান্তা তাকে বন্দী করবে কারণ তাদের বিরোধ তার সাথে। কিন্তু অনেকেই যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে বর্তমানের দ্বন্দ্ব শুধু সামরিক জান্তা ও শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; আজকের দ্বন্দ্ব সামরিক জান্তা এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে। এ সত্যকে অস্বীকার করা হবে মারাত্মক ভুল। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ। যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতেও তারা প্রস্তুত। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব হবে তাদেরকে সংগঠিত করে যে কোন অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত থাকা। সামরিক অভিযানের মোকাবেলায় প্রয়োজনবোধে অস্ত্রও হাতে তুলে নিতে হতে পারে। এর জন্য মানসিকভাবে নেতৃত্ব ও জনগণকে তৈরি থেকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতিও নেয়া উচিত। এতেই কমবে সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি, জনগণ ছিনিয়ে নিতে পারবে তাদের ইপ্সিত স্বাধীনতা। কিন্তু শেখ মুজিব কোন যুক্তিই গ্রহণ করলেন না। তার শেষ কথা, '২৭শে মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালিত হবে।' এ কর্মসূচী ঘোষণা করে তিনি সবাইকে বিদায় করলেন। ঘোষণার সাথে এটাও তিনি বলেছিলেন,'পাক বাহিনীর আক্রমনের ভয় যারা করেন তারা গোপন আস্তানায় গা ঢাকা দিতে পারেন।' সেদিন রাতে যারা ৩২নং ধানমন্ডিতে সমবেত হয়েছিলেন তারা তার নেতিবাচক মনোভাবে হতাশ হয়েই ফিরে গিয়েছিলেন তার ঘোষণা শোনার পর। মাও ফিরে এসেছিলেন চিন্তিত মন নিয়ে। যেখানে সবাই ধারণা করছে পাক বাহিনী সামরিক অভিযান চালাবে সেখানে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কি কোন কিছুই করার নেই? জনগণকে সে ধরণের শ্বেত সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করার কোন দায়িত্বই কি নেই জনাব শেখ মুজিব ও তার দলের? তাহলে সেই চরম পরিস্থতির হাত থেকে সাধারণ নিরস্ত্র জনগণকে বাচাঁবে কোন নেতৃত্ব? শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগকেই তো নেতৃত্বের স্থানে মেনে নিয়েছে দেশবাসী। তাদের ডাকেই তো সাড়া দিয়ে সংগ্রামকে এ পর্যায়ে

নিয়ে এসেছে জনগণ অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। সংগ্রামের চরম পর্যায়ে কেন তবে নেতা শেখ মুজিব পিছিয়ে যাচ্ছেন জনগণকে আগে ঠেলে দিয়ে? এ সমস্ত প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে না পেয়ে মা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল; আতংকিত হয়ে উঠেছিল তার স্পর্শকাতর মন। সচেতন বিবেক তার কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না নেতার এ ধরণের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত। সব বৃত্তান্ত শুনে আমরা সবাই হতবাক! এটাই যদি শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে কি আর করার আছে? শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় সময় অতিবাহিত করা ছাড়া কিছুই করার নেই। একমাত্র সময়ই বলতে পারবে শেখ মুজিবের চিন্তা-ভাবনা ও তার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা কতটুকু!

মার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ রাতটা সবাই জেগেই কাটাব ঠিক হল। বাবুন ও আমি খাবার পর কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বের হলাম অবস্থা বুঝে আসার জন্য। রাত প্রায় ১১.৩০ মিনিটের দিকে ফিরে এসে জানালাম নিউমার্কেট, ইউনিভার্সিটি এলাকায় আর্মি টহল দিচ্ছে। রেডিও ষ্টেশনেও কড়া আর্মি নিরাপত্তা বহাল করা হয়েছে। সমস্ত শহর ছেয়ে গেছে আর্মিতে। রাত বেশ গভীর। হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দ করে কিছু একটা এগিয়ে আসছে বলে মনে হল। শব্দটা ভালো করে শুনে আমি বললাম, শহরে ট্যাংক নামানো হয়েছে। ঐ বিকট ঘড়ঘড় শব্দটা ট্যাংক চলার শব্দ। শহরে এত রাতে ট্যাংক কেন! এক অজানা আশংকায় সবার চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল। দেয়াল ঘড়িটাতে সময় এগিয়ে চলছে টিক্‌টিক্‌। রাত প্রায় বারোটা। আচমকা রাতের নিরবতা ভেঙ্গে গর্জে উঠলো কামান, মর্টার, ট্যাংক, মেশিনগান, রিকয়েলেস্‌ রাইফেল। কেপে উঠল গোটা ঢাকা শহর। জানালার কয়েকটি কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল ভূ-কম্পনে। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হুমড়ি খেয়ে পরলাম ঘরের মেঝেতে। আমি তড়িৎ গতিতে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। সবরকম অস্ত্র নিয়ে পাক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতির উপর। গোলাগুলির আওয়াজ আসছে সবদিক থেকেই। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালাম, সমস্ত আকাশ ফ্লেয়ার ও ট্রেসারের আলোতে উদ্ভাসিত। আগুনের ফুলকির মত ছুটে চলেছে অগুনিত ট্রেসার বুলেট। আজিমপুর, নিউমার্কেট, পিলখানা, ইউনিভার্সিটি এলাকায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আকাশে পেঁচিয়ে উঠে যাচ্ছে কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী, অল্পক্ষণ পরে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে শোনা গেল মানুষের মরনকান্না, আহতের আর্তনাদ। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মৃত্যু যন্ত্রনার হাহাকার পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। শ্বেত সন্ত্রাসের পাশবিক তান্ডবলীলায় কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে পরে থাকলাম সবাই। এভাবেই কেটে গেল রাত। সকাল হল। পোড়া বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। রেডিও খুলতেই শোনা গেল বিশেষ জরুরী ঘোষণা, গতকাল মধ্যরাত থেকে কারফিউ জারি করা হয়েছে। জনগণকে বাইরে বেরুতে মানা করা হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের সাথে না জড়ানোর জন্য হুশিঁয়ার করে দেয়া হচ্ছে সবাইকে। কারফিউ জারি করা হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্যে, কিছুই করার নেই। শেখ মুজিব ও তার দলের চিন্তা-ভাবনা ভুল প্রমাণিত হল। আমরা সবাই নেতার কথাই ভাবছিলাম। ক্ষণিকের জন্য মনে ভেসে উঠেছিল তার চেহারাটা। নেতা কি অবস্থায় আছেন? আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দই বা কোথায়? কারফিউ চলছে। বেরোবার কোন উপায় নেই। বাসায় দরজা-জানালা বন্ধ করে পুরো ২৬শে মার্চ সবাই অন্তরীন হয়ে থাকলাম। সন্ধ্যার পর আবার গোলাগুলি, আর্তনাদ, মিলিটারি বহনকারী যানবাহন চলাচলের শব্দ, ভারী বুটের আওয়াজ রাস্তায়। নিশ্চুপ হয়ে আলো নিভিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দোয়া-কালাম পড়তে থাকলেন সবাই। অত্যন্ত অসহায় অবস্থা। যে কোন মুহূর্তে দরজা ভেঙ্গে বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে জল্লাদ বাহিনী। শুরু হতে পারে লুটতরাজ, মারপিট, ধর্ষণ। বাড়ির সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে ছিলাম আমি, বাবুন, মুন্নি, নুন্নি এবং মাও। মেয়েদের সবাইকে ছাদে পানির ট্যাংকে লুকিয়ে রাখা হল। চরম যে কোন অঘটন ঘটার প্রতীক্ষায় অসহায় চেতনাহীন অবস্থায় বসে রইলেন মুরুব্বীরা। সময় কাটছিল না কিছুতেই। ভোর হল একসময়। সূর্যের আলোয় প্রাণ ফিরে পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠলাম সবাই। রেডিও খুলতেই ঘোষণা শোনা গেল, সরকার কিছু সময়ের জন্য কারফিউ তুলে নিয়েছে সাধারণ জনগণের সুবিধার্থে। ঘর থেকে সামনের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। ৫-৬ জন ইপিআর এবং বাঙ্গালী সৈনিকদের একটি ছোট দল

ছুটে আসছে দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে দু'জন গুরুতরভাবে আহত। রক্তে ভেসে গেছে ওদের পরিধেয় কাপড়-চোপড়। কাছাকাছি পৌঁছে তাদের একজন আকুতি জানালো,

— ভাই একটু পানি দেন।

বললাম,

— নিশ্চয়ই। আসুন আমাদের বাসায়।

— না ভাই, আমাদের সময় নেই। অতি কষ্টে পালিয়ে বেচেছি। নদীর ওপারে না পৌঁছার আগে আমরা নিরাপদ নই। খান সেনারা আমাদের মত সবাইকে হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেলে রক্ষা নেই। কুকুরের মত গুলি করে মারবে।

আমি দৌড়ে গিয়ে বাবুনের সহায়তায় বালতি করে পানি এনে তাদের খাওয়ালাম। পানি খাবার পর ওরা কিছুটা প্রকৃতস্থ হল।

— আপনাদের এ অবস্থা কেন? জিজ্ঞেস করলাম।

— ভাই হানাদার বাহিনী সব শেষ করে ফেলেছে। তারা মাঝরাতে অতর্কিতে হামলা করে পিলখানা, পুলিশ লাইন ও ক্যান্টনমেন্টের বাঙ্গালী ইউনিটগুলির উপর। ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেছে হাজার হাজার সৈনিক। যারা পেরেছে তারা পালিয়ে বেচেঁছে আমাদের মত। বস্তিগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইউনিভার্সিটির হলগুলোকে গোলার ঘায়ে ধুলিস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে। মারা গেছে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। সমস্ত শহরে আর্মি টহল দিচ্ছে। কাউকে দেখে এতটুকু সন্দেহ হলেই গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। আপনাদের মত তরুণরাই ওদের টার্গেট। ভাই আপনারাও পালান। চলে যান শহর ছেড়ে গ্রামে। হানাদার বাহিনীর কবল থেকে জাতিকে বাঁচাতে হলে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ সংগ্রাম। এ সংগ্রামে আপনাদের মত তরুণ যুবকদের প্রয়োজন হবে সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা চলি ভাই। বেচে থাকলে দেখা হবে ইনশাল্লাহ্।

বিদায় জানিয়ে একইভাবে দৌড়ে চলে গেল ওরা। জোয়ান ভাইদের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম সবাই। একি ব্যাপার! কি করে এতটা বর্বর আর হিংস্র হয়ে উঠতে পারল পাকিস্তানের শাসকরা! তাদের হঠকারী পদক্ষেপ পাকিস্তানের অখন্ডতার মূলেই কুঠারাঘাত হেনেছে। এরপর পূর্ব পাকিস্তান কোনক্রমেই আর পাকিস্তানের অংশ হিসাবে থাকতে পারে না। স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করেই এই ন্যাক্কারজনক শ্বেত সন্ত্রাসের জবাব দিতে হবে। কারফিউ উঠিয়ে নেয়ার সুযোগে বাইরে বেরিয়ে অবস্থাটা সচক্ষে একটু দেখে আসার ইচ্ছে হল। বাসায় ফিরে প্রস্তাবটা দিতেই মা, বাবুন এবং নিম্মী সঙ্গে যেতে চাইলো। কোন যুক্তিই তারা শুনল না। একা আমাকে কিছুতেই ছাড়বেনা ওরা। অগত্যা চারজনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় অসম্ভব ভীড়। লোকজন, যানবাহন সবই ছুটে চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে। সবাই চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কেউ বেরিয়েছে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। বাসার কাছের বস্তি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত বস্তি লোকশূন্য। নিউমার্কেটের পাশে, কাটাবন, নীলক্ষেত বস্তিরও একই অবস্থা। সমস্ত পিলখানা আর্মি ঘিরে রেখেছে। প্রতিটি রাস্তায় মেশিনগান ফিট করা খান সেনা বহনকারী ট্রাকগুলো টহল দিচ্ছে। রাস্তার স্ট্র্যাটেজিক পজিশনে ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে। ইউনিভার্সিটি এলাকা একদম ফাঁকা। থমথম করছে। ইকবাল হল (ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রস্থল), জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল মর্টার ও ট্যাংক ফায়ারে ইট ও কংক্রিটের ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। হলগুলোর মাঠে বুলডোজার দিয়ে গণকবর খুড়ে পুতে দেয়া হয়েছে মৃত ব্যক্তিদের লাশগুলো। রোকেয়া হলের কাছে এ ধরণের একটি গণকবরে তাড়াহুড়া করে পুতে রাখা একটি লাশের দু'টো পা বেরিয়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। দেখে আতঁকে উঠলাম সবাই। মিলিটারি গাড়িগুলো থেকে খান সেনারা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল আমাদের। হঠাৎ মার খেয়াল হল এভাবে ঘোরাফেরা করাটা মোটেও নিরাপদ নয়। বাসাবো, রামপুরা টিভি ষ্টেশন, কমলাপুর রেল ষ্টেশন, রেডিও ষ্টেশন ঘিরে রেখেছে শত শত আর্মি। কালো পোশাক পরিহিত মিলিশিয়া বাহিনীকেও নামানো হয়েছে। সব জায়গায় বস্তিগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে দু'রাতের মধ্যেই। মালিবাগে তোদের বাসায় সবার খবর নিতে গেলাম। আমাদের দেখে চাচা অবাক হয়ে গেলেন। ভীষণ রেগে গিয়ে মাকে বললেন,

— কোন সাহসে আপনারা বেরিয়েছেন? এক্ষুণি ফিরে যান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসা ছেড়ে গ্রামে চলে যান নদী পার হয়ে। আমরাও সরে পড়ছি। ঢাকা শহর মোটেও নিরাপদ নয়।

যে স্ফুলিঙ্গ লেলিহান শিখার জন্ম দিয়েছিল

২৫-২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালের বিভিষিকাময় কালোরাত্রির কয়েকদিনের মধ্যে পাকিস্তান আর্মি ঢাকা শহর তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। টিভি এবং বেতারে সরকারি প্রচারণা স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের কর্মস্থলে ফিরে যেতে নির্দেশ জারি করা হয়। কিন্তু সমগ্র জাতি তখন যুদ্ধে নিয়োজিত।

মেজর জিয়ার তূর্যধ্বনি অগ্নিশিখার সৃষ্টি করেছিল সমগ্র জাতির মধ্যে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যরা সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সারাদেশে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুললো। শুধুমাত্র ঢাকা শহরই পাক বাহিনীর নিয়ন্ত্রনে রইলো। মুক্তিযোদ্ধারা জয় করে নিয়েছিলো দেশের অন্যান্য প্রায় সব অঞ্চল- চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর। পুরো দেশটাই তখন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রনে। স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং আপমর জনসাধারন যোগ দিলেন বিদ্রোহী সৈনিকদের সাথে।

পুরো পূর্ব পাকিস্তানে এভাবেই তখন পরিণত হয়েছে এক যুদ্ধক্ষেত্রে। বিভিন্ন জায়গায় প্রচন্ড লড়াই হয়। সদ্য গঠিত মুক্তিবাহিনী সব জায়গাতেই অসীম সাহসিকতার সাথে খান সেনাদের সাথে আগ্রাসনের বিরোধিতা করছিল বীরবিক্রমে এবং প্রচন্ড সাহসিকতার সাথে। যতটুকু সম্বল ছিল তা দিয়েই সৈনিকরা ট্রেনিং দিচ্ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। সবকিছুই ঘটছিল স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্থানীয় ভিত্তিতে। পাক বাহিনী দেশের শহরগুলো পুনরোদ্ধার করার জন্য বিপুল পরিমাণে রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাচ্ছিল প্রতিটি জেলা এবং মহকুমায়। ফলে এপ্রিলের মাঝামাঝি খানসেনারা শহর বন্দরগুলো দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এর ফলে সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে নিজেদের পুর্নগঠিত করে দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে হাজার হাজার শরনার্থী ভারতে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের বেশিরভাগই ছিল 'হিন্দু' সম্প্রদায়ের লোকজন। ভারত সরকার পরোক্ষভাবে প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানায়। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের অনেকেই ভারত চলে যায় নিজেদের বাহিনী পুর্নগঠনের জন্য। কারণ সেই মুহুর্তে পাক বাহিনীর সুশিক্ষিত এবং উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তির মুখোমুখি মোকাবেলা করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে। এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কমান্ডাররা সিদ্ধান্ত নেন দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত করে দেশ স্বাধীন করার।

১৯৭১ সালের ২৫-২৬শে মার্চ কালোরাত্রির সাক্ষী হয়ে আছে সেই সময়ের দেশি-বিদেশি সংবাদ মাধ্যমগুলি।

ভয়াবহ সামরিক অভিযানের নিষ্ঠুর পাশবিকতার লোমহর্ষক কাহিনী প্রচার করেছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকগন। তাদের বর্নিত ঘটনাবলী ছিল অতি করুণ এবং মর্মান্তিক।

২৫শে মার্চের কালোরাত্রির শ্বেত সন্ত্রাস এবং নৃশংস হত্যাযজ্ঞের লোমহর্ষক কাহিনী ও চাক্ষুস বিবরণ আজঅব্দি অনেক ছাপা হয়েছে। ভুট্টোর আমলের সেনা প্রধান '১৯৭১ সালের জল্লাদ' জেনারেল টিক্কা খান প্রখ্যাত মিশরীয় সাংবাদিক জনাব হাইকেলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তার আমলে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আমি যখন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানে যাই তখন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি ছিল অতি দুর্বল। সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে অপারগ ছিল। তাদের সাথে জনগণ কোনরূপই সহাযোগিতা করছিল না। গোয়েন্দা বিভাগসমূহের বাঙ্গালী কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিকতায়ও যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করি। এর আগে এমন পরিস্থিতি কখনও হয়নি। সেনাবাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরাই ছিল আমাদের খবরা-খবরের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র। বেঈমান মুজিবের কারসাজিতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই তখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা সেনাবাহিনীকে রীতিমত বয়কট করেছে।" জনাব হাইকেলের মতে জেনারেল টিক্কা বুঝতে পারেননি তিনি একটি জাতীয় বিপ্লবের মোকাবেলা করছিলেন। তিনি জানতেন না এ বিপ্লবের শিকড় প্রথিত ছিল তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনায়। বাঙ্গালীর স্বাধীকারের দাবির পেছনে যুক্তিও ছিল প্রচুর। এরপর ঢাকা আলোচনা কিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল সে কথা বলতে গিয়ে জেনারেল টিক্কা খান জনাব হাইকেলকে বলেন, "ঢাকা আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর রাষ্ট্রপতি আমাকে আদেশ দেন, ২৫শে মার্চ রাতে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে বাঙ্গালী বিদ্রোহ দমন করে পূর্ব পাকিস্তানে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য।" জনাব হাইকেল এর বর্ণনায়, "২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রি প্রায় ১১টা ৩০ মিনিটে পাক বাহিনী ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গুলির আওয়াজে ভীত-সন্ত্রস্ত বাঙ্গালীরা জেগে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল, পুলিশের হেডকোয়টার্স মতিঝিল এবং ইপিআর এর সদর দফতর পিলখানায় মূল আঘাত হানা হয়। অবিশ্রান্তভাবে গোলাগুলি চলতে থাকে। মেশিনগান, রকেট, এমনকি ট্যাঙ্ক ফায়ারিং এর আওয়াজও শোনা যায়। সাথে মুমুর্ষ ব্যক্তিদের মরন চিৎকার। রাতের আকাশ আলোকিত হয়ে উঠে ক্লেয়ার ফায়ারিং এ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল এবং জগন্নাথ হলকে রিকয়েলেস রাইফেল এবং মর্টার ফায়ারে ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়। মারা যায় অসংখ্য ছাত্র। ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণ হারায় অগনিত লোক।" তার প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাক বাহিনীর আক্রমণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লেখেন, "মাঝরাতের পরপরই পাকিস্তান আর্মির সাঁজোয়া বাহিনীর একটি কলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ক্ষিপ্ত গতিতে ছুটে যায়। সেনাবাহিনী বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী দখল করে সেটাকে ফায়ার বেস করে ছাত্রাবাসগুলির উপর আক্রমণ চালায়। ঘুমন্ত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ইকবাল হলের দুইশতেরও বেশি ছাত্র প্রাণ হারায়। বিদ্রোহী ছাত্রদের একটি কেন্দ্র ছিল ইকবাল হল। দু'দিন যাবত অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে ছিল মাঠে, পথে, হলগুলির চত্বরে এবং কক্ষগুলিতে। দু'দিন পরই সৈনিকরা হলগুলির প্রাঙ্গনে গর্ত খুড়ে মৃতদেহগুলিকে মাটি চাপা দেয়। গণ কবরগুলি খুড়তে বড় বড় বুলডোজার ব্যবহার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় বস্তিগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।"

জনাব হেনড্রিক ভানডার হেইজডেন, আন্তর্জাতিক ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা সে সময় ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দি নিউইয়র্ক টাইমস-এ এক প্রতিবেদন ছাপান। সেটা ১৪ই জুলাই লন্ডনের দি টাইমস এ প্রকাশিত হয়। তার উপর ভিত্তি করে একই দিনে দি টাইমস-এ একটি সম্পাদকীয়ও ছাপা হয়। পাক বাহিনীর পাশবিক আচরনের বিবরণ তাতে বিস্তারিতভাবে লেখা

হয়। সেই প্রতিবেদন পড়ে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে যান। বিশ্ব পরিসরে বাঙ্গালীদের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে জনাব হেনড্রিকের প্রতিবেদন ও দি টাইমস এর সম্পাদকীয় বিশেষ অবদান রাখে। ২৭শে মার্চ সকাল ৯টার সময় কারফিউ উঠিয়ে নেয়া হয় দুপুর পর্যন্ত। হাজার হাজার ভীত-সন্ত্রস্ত নর-নারী প্রাণভয়ে গ্রামের দিকে যাত্রা করে। পথে পাক বাহিনীর সৈন্যরা তাদের উপরও গুলিবর্ষন করে। অনেক নিরীহ ব্যক্তি এতে প্রাণ হারায়। উড়ন্ত হেলিকপ্টার থেকেও পলায়মান নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলি চালানো হয়। এভাবে জনগণের মনে ভীতি সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা চালানো হয়। সেনা ছাউনিতে আচমকা আক্রমণের ফলে শত শত নিরস্ত্র পুলিশ এবং ইপিআরের সৈনিকরা প্রাণ হারান। যারা বেচে যান তারা অস্ত্রাগার লুট করে শহরের জায়গায় জায়গায় সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু বিপুল আক্রমণের মুখে তাদের অসংগঠিত প্রতিরোধ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা ছড়িয়ে পরেন গ্রামে-গঞ্জে। পাক বাহিনী নৃশংস হিংস্রতায় তাদের ধাওয়া করতে থাকে।

সেনাবাহিনীর জেনারেল ফজলে মুকিম খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতের নিষ্ঠুর আগ্রাসনের তারিফ করে বলেন, "প্রয়োজনের খাতিরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহ দমন করার জন্য মর্টার, রিকয়েলেস রাইফেল, মেশিনগান, এমনকি ট্যাঙ্কও ব্যবহার করতে হয়েছিল। সে রাতে মারণাস্ত্রসমূহের শব্দ থেকে মনে হচ্ছিল সমস্ত ঢাকা শহরই একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।"

ঢাকায় অবস্থানরত সব বিদেশী সাংবাদিকদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সেনা নিবাসে। সেখান থেকে তাদের সোজা এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়ে বিশেষ প্লেনে তুলে দিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। সে রাতে বন্দী অবস্থায় তাদের সাথে সেনাবহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত র্দুব্যবহার করে। সেনাবাহিনীর হাত থেকে মাত্র তিনজন বিদেশী সাংবাদিক রেহাই পান। এরা গোপনে ঢাকায় লুকিয়ে থেকে সেনাবাহিনীর চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা ছিলেন জনাব আরণল্ড জেইথলিন, জনাব মিসেল লরেন্ট এবং সাইমন ড্রিংগ। তাদের মাধ্যমেই পরে বিশ্ববাসী ২৫-২৬শে মার্চ রাত্রের ঘটনাবলী এবং সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাকান্ড সম্পর্কে জানতে পারে। জনাব সাইমন ড্রিংগ ডেইলি টেলিগ্রাফ-এ এক বিবরণীতে লেখেন, "পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য ঢাকাকে চরম খেসারত দিতে হয়েছিল।"

খালাম্মা, নিম্মী এবং বাপ্পির দুঃসাহসিক পলায়ন

কোলকাতা দূতাবাসের ডিফেক্শনের পর চৌধুরী পরিবারের জন্য ঢাকা কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের কোন জায়গাই নিরাপদ ছিল না।

কোলকাতার মিশনের ডিফেকশ্নের খবরও আমরা জানতে পারি। এ খবর জানার পর পরিবারের সবাই বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাবাও ডিফেক্ট করেছেন সবার সাথে। খবর পেলাম তার এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে পাকিস্তান সরকার। প্রতিশোধের আক্রোশে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে সামরিক জান্তা। সবাই একমত হলেন, আমাদের আর লালবাগে থাকা ঠিক হবে না। সরে পড়তে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি (বাপ্পি), মা ও নিম্মী বাসা থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলাম আমাদেরই এক ফুপুর বাড়ি। কোন জায়গায় বেশিদিন একনাগাড়ে থাকা ঠিক নয়। তাই আমরা পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম বাড়ি থেকে বাড়ি। এভাবে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম আনু মামার বাড়ি, শহিদ মামার শ্বশুর বাড়ি, আত্মীয় অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজার পেরু মামার বাড়িতে। সে বাড়িতেই ঘটল বিভ্রাট। একদিন গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার এলেন পেরু মামার বাসায় কোন এক কাজে। সেখানে ঘটনাক্রমে তিনি মাকে হঠাৎ করে দেখে ফেলেন। মিসেস চৌধুরীকে চিনতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না তার। সন্দেহপ্রবন হয়ে ফিরে গেলেন ভদ্রলোক। তিনি জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরে খবরটা পৌঁছে দেন। পরদিনই পেরু মামার বাড়ি ও লালবাগের বাসায় একই সাথে রেইড করা হল আমাদের খোঁজে। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবসাব বুঝে আমরা ভদ্রলোক চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেরু মামার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই। এভাবে আমরা বেঁচে যাই সে যাত্রায়। এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল পাকিস্তানী গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিশোধ হিংসায় হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদের। বাংলাদেশে আর থাকা সম্ভব নয়। পালিয়ে যেতে হবে সীমান্ত পেরিয়ে।

ইতিমধ্যে স্বপন, বদি ওরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। আমিও যাব তাদের সাথে। মা বাধ সাধলেন, 'মুক্তিযুদ্ধে যাবে সেতো গর্বের কথা। কিন্তু তার আগে আমাদের কোলকাতায় তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। আমাদের পৌঁছে দিয়ে তুমি যুদ্ধে যাবে তার আগে নয়।' মার যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। মা ও সমর্থ বোনের পালিয়ে যাবার দায়িত্ব যার তার উপর বিশ্বাস করে দিয়ে দেয়া চলে না। আমাকেই নিতে হবে এ কঠিন দায়িত্ব । পালাবার পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ঠিক করা হয় ঢাকা থেকে পালিয়ে যাব নানা বাড়ি নবীনগর। সেখান থেকে সুযোগ মত কস্বা সেক্টর দিয়ে আগরতলায় পাড়ি জমাতে হবে। নবীনগর থেকে কি করে বর্ডার ক্রস করতে হবে সেটা নবীনগর গিয়েই ঠিক করতে হবে অবস্থা বুঝে। আনু মামা, আলতু নানাকে সঙ্গে নিয়ে মা, নিম্মী ও আমি এক রাতে নরসিংদী হয়ে নবীনগর এসে পৌঁছালাম। ঢাকা থেকে নরসিংদীর গাড়িতে। সেখান থেকে লঞ্চে নবীনগর একদম বাড়ির ঘাটে। নবীনগর গ্রামে খান সেনারা তখনও হানা দেয়নি। কিন্তু তবুও দলে দলে হিন্দুরা সব বসতবাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল ভারতে। বর্ধিষ্ণু নবীনগর গ্রামে খাঁ বাড়ি বিশেষ পরিচিত। বড় আব্বা ও নানা দাপটশালী জমিদার হিসাবে এক কালে দশ গ্রামে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বড় আব্বাকে বৃটিশ সরকার খেতাবেও ভূষিত করেছিল। প্রাসাদপম জমিদার বাড়ির সামনে জোড়া দীঘি। নবীনগরের মুক্ত পরিবেশে পৌঁছে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাচঁলাম। আনু মামা দু'একদিন বিশ্রাম করে ঢাকায় ফিরে গেলেন। তার পুরো পরিবার তখনও রয়েছে সেখানে। খান সেনাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে আমরা পালিয়ে আসতে পারায় বাড়ির সবাই মহাখুশি। নবীনগরের শান্ত পরিবেশ এবং প্রকৃতির নির্মল সংস্পর্শে কয়েক দিনেই ভুলে গেলাম ঢাকার দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা। ২৫-২৬শে মার্চ রাতের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বাড়ি বাড়ি লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাবার বিড়ম্বনা, ২৭শে মার্চ সকালের তিক্ততা সবকিছুই দুঃস্বপ্নের মত অতীত হয়ে গিয়েছিল আমাদের কাছে। সনাতন দা গ্রামের বাড়ির মুরুব্বীদের একজন। পুরনো বিশ্বাসভাজন আপনজন।

বংশানুক্রমে তারা খাঁ বাড়ির জমিদারী তদারক করে এসেছেন। তিনিই সব দায়িত্ব নিলেন আমাদের বর্ডার পার করে দেবার। সার্বিক দেখাশুনা ও পালাবার পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারিনী সবার অতি আদরের ছোট নানী বেগম আমির আলী খান ও কবির। ছোট নানীর বড় ছেলে, হবিগঞ্জের এসডিও (SDO) জনাব আকবর আলী খান (খসরু মামা) খান সেনাদের শ্বেত সন্ত্রাসের বিরোধিতায় ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই সময় আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অবস্থান করছিলেন। ঠিক হল আগরতলাতে খসরু মামার কাছেই যাব আমরা। একই গ্রামের কলেজ পড়ুয়া ছেলে মোমেন আমাদের গাইড হয়ে সঙ্গে যাবে। সনাতন দা যাত্রার সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। অসম্ভব উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী তরুণ যুবক মোমেন অসীম সাহসীও বটে। ইতিমধ্যেই সে কয়েকটি শরনার্থী দলকে আগরতলায় নিজ তদারকিতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে খান সেনাদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। কসবা সেক্টর দিয়ে আগরতলা পৌঁছানোর চোরা রাস্তাগুলো ওর নখদর্পণে। ঠিক হল নৌকাযোগে মেঘনা, তিতাস পাড়ি দিয়ে খরস্রোতা গোমতী নদী বেয়ে কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া GT Road পর্যন্ত গিয়ে তারপর পদযাত্রা। বর্ডার পার হওয়ার পর পথিমধ্যে পড়বে একটি বড়সড় বাজার। সেখান থেকে ভাড়াটে গাড়িতে আগরতলা। বড় একটা গয়না নৌকা ঠিক করলেন নানী ও সনাতন দা। মাঝি-মাল্লারা সবাই অত্যন্ত বিশ্বস্ত। দুর্যোগপূর্ণ এক ঝড়ের রাতে আল্লাহ্‌র নাম করে মোমেন, কবির ও আলতু নানাকে সঙ্গে করে নৌকায় উঠে পাড়ি জমালাম এক অজানা ঠিকানায়। দুর্যোগের রাতে খান সেনাদের চোখ অতি সহজেই ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলেই ঝড়ের রাতে নৌকা যাত্রার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। বদর বদর বলে মাঝি-মাল্লারা মেঘনার উত্তাল বুকে অন্ধকারে নৌকা ভাসিয়ে দিল। ভাল করে সাঁতার জানি না আমি ও নিম্মী দু'জনেই। ঝড়ো হাওয়ায় মেঘনা হয়ে উঠেছে বিক্ষুব্ধ। বিশাল ঢেউয়ের পাহাড় ভেঙ্গে নৌকা এগিয়ে চললো দুলতে দুলতে। ঢেউয়ের দোলা ও ঝড়ের তীব্রতার ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে চুপ করে বসে আল্লাহ্‌-রাসূলকে স্মরন করতে থাকলাম সবাই। এমনি করে সারারাত একটানা নৌকা বেয়ে ফজরের ওয়াক্তে এক জায়গায় নৌকা ভেড়ালো মাঝিরা। সেখানে নেমে পড়তে হল সবাইকে।

শুরু হল পদযাত্রা। ধানক্ষেত, পাটক্ষেতের আলের উপর দিয়ে, কাদা পলির উপর দিয়ে খালি পায়ে হেটে পাহাড়ী টিলাগুলো পার হচ্ছিলাম। পরনে সবার গ্রাম্য লেবাস। দুপুরের আগেই GT Road এর কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। একটি পাটক্ষেতের মধ্যে সবাইকে লুকিয়ে রেখে মোমেন আর আমি এগিয়ে গেলাম রাস্তাটা রেকি করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলাম আমরা। রাস্তা ক্লিয়ার। ক্ষিপ্র গতিতে রাস্তা পার হয়ে দূরে চলে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দূরের জঙ্গলে গা ঢাকা দেবার আগে খান সেনাদের দৃষ্টিতে পড়লে রক্ষে নেই। নির্ঘাত মৃত্যু। পরি কি মরি সবাই দৌড়ে ছুটে চলেছি রাস্তা ক্রস করার জন্য। আর একটু গেলেই উচুঁ রাস্তা। হঠাৎ মোমেন বলে উঠলো, 'সবাই শুয়ে পড়ুন, খান সেনাদের টহল গাড়ি আসছে।' তার নির্দেশে সবাই ধানক্ষেতের কাঁদা পানিতে অসাড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। চারদিকে যতটুকু দৃষ্টি যায় ছোট ছোট পাহাড়, টিলা, ধান আর পাটের ক্ষেত। লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। ধানক্ষেতের কাদা-পানিতে মুখগুজে পড়ে থেকে সবাই প্রমাদ গুনছিলাম, 'যদি টহলদার খান সেনারা দেখে ফেলে!' ভয়ে নিম্মীর দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। আল্লাহ্‌ই বাঁচানে ওয়ালা। খান সেনাদের গাড়িটা অল্প কয়গজ দূর দিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল। ওরা ধানক্ষেতে পড়ে থাকা মানুষগুলি দেখতে পেল না। গাড়িটি অনেক দূরে দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলে সবাই উঠে এক দৌড়ে রাস্তা ক্রস করে অপরদিকের পাটক্ষেতে গিয়ে বসে পড়লাম। একটু দম নেয়া দরকার। মা বেচারীর ডান পা'টা কিছুদিন আগে ভেঙ্গে গিয়েছিল ইউনিভার্সিটির সিড়ি থেকে পিছলিয়ে গিয়ে। ভাঙ্গা পা'টা দুঁনিয়ে ফুলে উঠেছে। অসম্ভব সহ্য শক্তি মার। মুখ ফুটে কখনও নিজের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করে না। তাই শুধু বলল, একটু দম নেয়া যাক। আমি ও নিম্মী মার পায়ের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম হাটতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে তাঁর। বুঝতে পারলেও কিছুই করার নেই।

বাকিটা পথ হেটেই যেতে হবে তাঁকে। মাঝামাঝি পথ অতিক্রম করেছি আমরা। এখন থেকে বাকি পথের সবটুকুই পাহাড়ী উচু-নিচু পিচ্ছিল পথ। সবাই কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু

মুখে কিছুই বললাম না। মাকে উৎসাহ দেবার জন্য হেসে বললাম, 'মা তুমি দেখছি হাটাতে আমাদেরকেও হার মানিয়ে দিলে। কষ্ট হচ্ছেনা তো?' কোন জবাব না দিয়ে মা উঠে দাড়াল। আবার শুরু হল হাটা। হাটতে হাটতে সন্ধ্যার সময় আমরা পৌঁছলাম সেই বাজারে। বর্ডার এলাকার বাজার। কিন্তু শরণার্থীদের ভীড়ে পুরো বাজারটাই গমগম করছে। চালের বস্তা ভর্তি অসংখ্য ট্রাক দাড়িয়ে আছে। মোমেন বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি।' ঐ চাল বাংলাদেশ থেকে স্মাগলড হয়ে চলে যাচ্ছে ইন্ডিয়ায়। কিছুদূর এগুতেই বাজারের অন্যপ্রান্তে একইভাবে দাড়িয়ে আছে পাট ভর্তি ট্রাকের সারি। ওগুলোও পাচার হচ্ছে বাংলাদেশ থেকেই।

দীর্ঘপথ চলায় সবাই তখন পরিশ্রান্ত। একটা চায়ের দোকানে বসে পানি, কিছু চা-নাস্তা খেলাম সবাই। খাওয়া শেষে একটি পুরনো জিপ গাড়ি ভাড়া করে আগরতলার পথে রওনা হলাম। ছোট্ট জিপটাতে প্রায় ১২জন যাত্রী ঠাসাঠাসি করে ঢোকালো ড্রাইভার। কিছুই বলার নেই। এটাই রীতি। বাজার থেকে আগরতলার দূরত্ব প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল। পুরনো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার আমলের জিপ। ১২-১৪ জন যাত্রীর ভারে আর্তনাদ করতে করতে কোনমতে এগিয়ে চললো আগরতলার পথে। কিছুদূর যাবার পর গাড়ি থামিয়ে বনেট খুলে পানি ঢেলে বুড়ো ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করতে হচ্ছিল বারবার। এভাবেই অতি কষ্টে রাত প্রায় ১২টায় আমরা এসে পৌঁছালাম আগরতলা শহরে।

শহর থেকে ৫-৬ মাইল দূরে এক পোড়া রাজবাড়িতে খসরু মামা ও আরো কয়েকজন পদস্থ বাঙ্গালী অফিসার সপরিবারে অবস্থান করছিলেন। মোমেন জায়গাটা আগেই দেখে গেছে। জিপ থেকে নেমে রিক্সা করে চলে গেলাম সেই আস্তানায়। রাজবাড়িতে পৌঁছে খুজে বের করতে বেগ পেতে হলনা খসরু মামাকে। খসরু মামা আমাদের সবাইকে দেখে অবাক,
-হেনা বুজি আপনারা?
-হ্যাঁ পালিয়ে এলাম। মোমেনই নিয়ে এসেছে আমাদের। ঢাকায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

মুক্তি ফৌজের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী

তার স্বপ্ন এবং পরিকল্পনা।

মুজিব নগর হেডকোয়াটার্সে আমরা পৌছানোর পর কর্নেল ওসমানী মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে শুরু হয়েছিল; বর্তমান এবং ভবিষ্যত নিয়ে এক বিশদ বিবরণ দিলেন। তিনি শুরু করলেন, "তোমাদের মনে রাখতে হবে ২৫শে মার্চের পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমনের পর ২৬শে মার্চ থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈনিক, প্রাক্তন ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বীর জোয়ানরা। ২৬-২৭শে মার্চ মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বীর জোয়ানদের সঙ্গে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এসে যোগ দিয়েছিলেন ছাত্র, যুবক এবং আপামর জনসাধারণ। সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয় নিয়মিত পদ্ধতিতে। আর এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলতে থাকে মে মাস পর্যন্ত। শত্রুকে ছাউনিতে যথাসম্ভব আটকে রাখা এবং যোগাযোগের কেন্দ্রসমূহ তাদের কব্জা করতে না দেয়ার জন্য নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হচ্ছিল। নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, যত বেশি বাধা সৃষ্টি করা যায় তা সৃষ্টি করা হবে। যে সমস্ত ন্যাচারাল অবস্ট্যাকল রয়েছে তা রক্ষা করতে হবে, সাথে সাথে শত্রুর প্রান্তভাগে এবং যোগাযোগের পথে আঘাত হানতে হবে। মূলতঃ এটাই ছিল নিয়মিত বাহিনীর রণকৌশল। সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সাথেই এ পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি রেজিমেন্টকে দু'টি ব্রিগেডের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হয়। সংখ্যায় কম থাকায় নিয়মিত বাহিনীর রণকৌশলে পরে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। কমান্ডাররা ছোট ছোট পেট্রোল বা ছোট ছোট কোম্পানী, প্লাটুনের অংশ দিয়ে শত্রুপক্ষের তুলনামূলক অধিক সংখ্যক সৈন্যকে এনগেজড করে রাখছিলেন। একই সাথে শত্রুর উপর আচমকা হামলাও চালানো হচ্ছিল। এভাবেই চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, যশোর, খুলনাতে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিল। সে সময় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররা বুঝতে পারছিলেন, কেবলমাত্র নিয়মিত পন্থায় যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। কারণ তখনকার পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছিল সর্বমোট ৫টি ব্যাটালিয়ন। তাদের সাথে ছিল ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ, ছাত্র, যুবক ও জনতা। কমান্ডাররা ছাত্র যুবকদের অল্প কিছুদিনের ট্রেনিং দিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে যোদ্ধার সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করেন। এ ধরণের শক্তি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাক বাহিনীর ৩-৪টি ডিভিশনকে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাদের উপুর্যপরি আক্রমনের মুখে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধ ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সে ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের এই বিশাল শক্তিকে ধ্বংস করে দেশকে স্বাধীন করা অসম্ভব হয়ে উঠে। তখনই কমান্ডাররা অনুভব করেন তাদের প্রস্তুত হতে হবে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের জন্য। এই পাঁচটি ব্যাটালিয়নকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে এক বিশাল গেরিলা বাহিনী। একমাত্র বিশাল গণবাহিনীই পারবে শত্রুপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নিউট্রেলাইজড করতে। এ গণবাহিনী এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যেমন মানুষের পেটের অন্ত্রে একটি শক্তিশালী জীবানু অন্ত্রটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে, তেমনি ভেতর থেকে শক্তিশালী দক্ষ গেরিলা বাহিনী শত্রুর অস্ত্রকেও বিনষ্ট করে দেবে। এছাড়া দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। কারণ শত্রুপক্ষের সংখ্যা বেশি। ওদের বিমান বাহিনী রয়েছে তাছাড়া সম্বলও তাদের অনেক বেশি।

কর্নেল ওসমানীর কথা শুনে মনে প্রশ্ন দেখা দিল? ২৫শে মার্চ রাতে পাক বাহিনী যদি নিরীহ জনগণের উপর পৈশাচিক শ্বেত সন্ত্রাস না চালাত; একই সাথে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ এবং অন্যান্য সামরিক ইউনিটগুলোর বাঙ্গালী সদস্যদের উপর হামলা না চালাত; তবে কি স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটত? স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বাঙ্গালী বীর জোয়ানরা? এ ধাঁধাঁর জবাব ঐতিহাসিকরাই আগামীতে খুঁজে বের করবেন সে বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চললাম। কর্নেল ওসমানী বলে চলেছেন, "আমার বিশ্বাস ক্লাসিক্যাল গেরিলা ওয়ারফেয়ার

করে দেশ মুক্ত করতে হলে বহুদিন যুদ্ধ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ জনসম্পদ। সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

জনাব ওসমানীর কথায় টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী চিন্তাধারা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ল। পৃথিবীর কোন জাতি তাদের মুক্তি অল্পত্যাগে পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। যারা হয়তো বা পেয়েছেন তাদের সে স্বাধীনতা অর্থবহ হয়নি। প্রসুতির আতুঁর ঘর থেকেই বিভিন্ন চক্রান্তের স্বীকারে পরিণত হয়েছে তাদের সে স্বাধীনতা। ভৌগলিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও স্বাধীনতার সুফল জাতীয় মুক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। নেতৃত্ব পৌঁছে দিতে পারেননি স্বাধীনতার সুফল জনগণের ঘরে ঘরে। অদৃশ্য কলকাঠির নড়াচাড়ায় যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে; সে সমস্ত দেশের পুতুল সরকারগুলোর কাছ থেকে জনগণ পেয়েছে শুধুই বঞ্চনা, প্রতারণা আর দারিদ্রের অভিশাপ।
আবার কর্নেল ওসমানীর বক্তব্য শুনতে মনযোগ দিলাম, "যুদ্ধকে স্বল্পস্থায়ী করার জন্য এপ্রিল মাসেই আমার মাথায় একটি প্ল্যান এসেছে। একাটি বড় গেরিলা বাহিনী গঠন করে ভেতর থেকে শত্রুর আঁতে আঘাত হানতে হবে এবং পাশাপাশি নিয়মিত বাহিনীর ছোট ছোট ইউনিট অর্থাৎ কোম্পানী বা প্লাটুন দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে হবে এবং বিচ্ছিন্ন হবার জন্য তাকে বাধ্য করতে হবে, যাতে করে কনসেনট্রেটেড অবস্থা থেকে তারা ডিসর্পাসড হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে তাদের সংখ্যাগরিষ্টতা অকেজো হয়ে পড়বে। শত্রুপক্ষ ছোট ছোট গ্রুপে নিজেদের কমিট করতে বাধ্য হবে। তখন গেরিলা পদ্ধতিতে তার যোগাযোগের রাস্তা, বেতার সংযোগ, রি-ইনফোর্সমেন্টের পথ ধবংস করে তাকে ছোট ছোট পকেটে আইসোলেটেড করে চরম আঘাতে তাদের ধ্বংস করতে হবে। এজন্য আমার নিয়মিত বাহিনীরও প্রয়োজন রয়েছে। আমার এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিটেইলড প্ল্যান ইতিমধ্যেই অস্থায়ী সরকার এবং মিত্রদের কাছে পেশ করেছি। তাতে আমি উল্লেখ করেছি, কমপক্ষে দু'লাখের মত গেরিলা বাহিনী এবং ২৫ হাজারের মত নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে কমান্ডারদের অধিনে যে সমস্ত মুক্তিফৌজ রয়েছে তাদের ছাড়া এই নূন্যতম শক্তি আমাকে অবশ্যই গড়ে তোলার অনুমতি দিতে হবে।

বর্তমানে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে রয়েছে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ বাহিনীর সদস্যগন তাদের আমি বলি নিয়মিত বাহিনী। সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্র যুবকদের বলি অনিয়মিত বাহিনী। ভারতীয়রা তাদের বলেন **FF (Freedom Fighters).** আমার মতে পরীক্ষিত যোগ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সাথে নতুন রিক্রুটেড বীর জোয়ানদের ট্রেনিং দিয়ে তিনটি নিয়মিত ইনফ্যানট্রি ব্রিগেড গঠন করার পরিকল্পনা নিতে হবে। নিয়মিত বাহিনীর বাকি সদস্যরা **Sector troops** হিসাবে স্থানীয় কমান্ডারদের অধিনে থাকবে। তাদের মূল দায়িত্ব হবে গেরিলাদের জন্য বেইস তৈরি করে তাদের ট্রেনিং দেয়া এবং দেশের ভেতর ছোট ছোট গ্রুপে তাদের **induct** করা। গেরিলাদের অপারেশন কোঅর্ডিনেট করার দায়িত্ব থাকবে সেক্টর কমান্ডারদের উপর। সেক্টর কমান্ডারদের সাহায্যের জন্য গেরিলা অ্যাডভাইজার নিয়োগ করা হবে। সমগ্র বাংলাদেশের রনাঙ্গনকে তিনি ১১টি সেক্টরে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেক্টরের তত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবেন একজন সেক্টর কমান্ডার। সেক্টরগুলোর হেডকায়ার্টারস স্থাপিত হবে বাংলাদেশের ভেতর মুক্তাঞ্চলে। সেক্টরগুলোই হবে গেরিলা যুদ্ধের মূল ভিত্তি। কারণ, বাংলাদেশের মত এত বড় একটা থিয়েটার অর্থাৎ দেশব্যপী রণক্ষেত্রে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা ও ব্যাপক দূরত্ব। কেন্দ্রীভূতভাবে দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে যুক্ত সামরিক সদর দফতর, উপযুক্ত সামরিক অফিসার ও ষ্টাফ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সম্পদ এবং সঙ্গতির প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আমার থাকবে ১০জন অফিসার বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনীর হেডকোয়ার্টারস। এত বড় একটা বিরাট অঞ্চলব্যাপী সামগ্রিক যুদ্ধে একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে দৈনন্দিন আদেশ, নির্দেশ প্রেরণ করা ও সে অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনা শুধু অসম্ভবই নয়, অবাস্তবও বটে। তাই আমি আমার কমান্ডারদের কাছে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য, আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক বিবেচ্য বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন

এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের কার্যক্রমের কোন কোন পথ উন্মুক্ত রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব সেক্টর কমান্ডারদের একটি জরুরী বৈঠক তলব করার চিন্তা-ভাবনা করছি। জাতীয় লক্ষ্য, আমাদের বাহিনীর করণীয়, বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং সাংগঠনিক ও যুদ্ধ পরিচালনার নীতি নির্দেশ জারি করার দায়িত্ব হবে আমার হেডকোয়ার্টারসের। আমাদের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারের নীতি নির্ধারণ ও স্থানীয়ভাবে তাদের দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। সেক্টর কমান্ডারদের সাথে লিয়াঁজো অফিসার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলার ইচ্ছা রয়েছে আমার। এছাড়া আমার কমান্ডারদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা এবং যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমি এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে যাতায়াতও করবো প্রয়োজনে।" কর্নেল ওসমানীর যুদ্ধ প্রস্তুতির বিশদ বিবরণ আমরা তিনজনই মনযোগ দিয়ে শুনলাম। তার বক্তব্যে সামরিক প্রস্তুতির বিশদ বিবরণ থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের মূল বিষয় তথা রাজনৈতিক দিকটির সম্পর্কে তেমন কিছুই বললেন না তিনি।

যে কোন জাতির মুক্তি সংগ্রামকে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সফল করে তোলার জন্য রাজনৈতিক আদর্শ ও নেতৃত্বের ভূমিকা মূখ্য। জনগণকে সাথে নিয়েই সংগঠিত করা হয় গেরিলা যুদ্ধ। জনগণকে গেরিলা যুদ্ধে আকৃষ্ট করতে হয় রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। কারণ রাজনৈতিক নীতি আদর্শের মাধ্যমেই জনগণ দেখতে পায় তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন এবং বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি। তাই অতি প্রয়োজনের খাতিরেই জনগণের মুক্তি ও তাদের আশা-আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি ও আদর্শ প্রণয়ন করে জাতীয় পরিসরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদানের জন্য গঠন করতে হয় সর্বদলীয় জাতীয় সরকার। এ সরকার সাধারণতঃ গঠিত হয় পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে। এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত জনযুদ্ধের প্রক্রিয়া। সমসাময়িক পৃথিবীতে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে পরীক্ষিত এ প্রক্রিয়ার বিপক্ষে একদলীয় একটি অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের নিয়ন্ত্রনে দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সফলভাবে এগিয়ে নেয়া কি করে সম্ভব? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম হয়েছে দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন পেশার জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের আদর্শ এবং নীতিমালায় সর্বস্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন নেই। আওয়ামী লীগ মূলতঃ বাংলাদেশের উঠতি বুর্জুয়া এবং পাতি বুর্জুয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক দল। সেক্ষেত্রে আপামর জনসাধারণকে সশস্ত্র সংগ্রামে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের একক সরকার নেতৃত্ব দেবে কোন যুক্তিতে? '৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে ভোট নিয়েছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে, ধর্মীয় আদর্শের আওতায় পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে সে দাবিতে। সেখানে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের কোন অঙ্গীকার ছিল না। কর্নেল ওসমানীর বক্তব্য থেকে একটি বিষয়ও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার সংগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের আহ্বানে শুরু হয়নি। স্বাধীনতার প্রথম ডাক দিয়েছিলেন অখ্যাত এক তরুণ মেজর জিয়াউর রহমান আর তার ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ। তাদের অংশগ্রহণে বাঙ্গালী বীর সৈনিক ও নওজোয়ানরা সংগঠিত করেছিলেন প্রতিরোধ মুক্তি সংগ্রাম বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, আনসার, মুজাহিদ, ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর দেশপ্রেমিক যোদ্ধারাই অগ্রণী হয়ে স্বীয় উদ্যোগে গঠন করে তুলেছিলেন মুক্তিফৌজ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয়া তো দূরের কথা। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও শেখ মুজিব কখনোই চিন্তা করেননি সশস্ত্র সংগ্রামের কথা। তাই ছিলনা তাদের কোন পূর্বপ্রস্তুতি। তাদের পার্টি মেনিফেষ্টো, নির্বাচনী প্রচারণা এবং পরবর্তী সময়ে ইয়াহিয়া শাহীর সাথে তাদের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও অন্যান্য কার্যক্রম থেকে এ সত্যই প্রমাণিত হয়। এ সত্যকে অস্বীকার করে আজ কোন অধিকারে প্রবাসে দলীয় অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের সকল কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবিদার হয়ে উঠলেন তারা? "মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যে

ছিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। অনেকেরই বক্তব্য ছিল আওয়ামী লীগ একাই মুক্তিযুদ্ধ করবে। অন্য কোন দল বা গোষ্ঠি করুক তা হবে না।" (দৈনিক ইনকিলাবের সাথে জনাব শান্তিময় রায়ের সাক্ষাৎকার)।

এ ধরণের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের অধিনেই দেশ স্বাধীন করে গণমুক্তির স্বপ্ন দেখছেন কর্নেল ওসমানী। পরিকল্পনা করেছেন গেরিলা যুদ্ধ করার। অবশ্য তাঁর কথার ফাকে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পক্ষপাতী তিনি ও তার সরকার নন। তার মানেই বা কি? তবে কি পর্দার অন্তরালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অন্য কোন ষড়যন্ত্র চলছে প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার এবং ভারতীয় সরকারের বোঝাপড়ার মাধ্যমে? তড়িঘড়ি করে অস্থায়ী দলীয় সরকার কায়েম করার মত তাড়াহুড়া করে স্বাভাবিক পরিণতির পরিবর্তে অস্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশকে তথাকথিত স্বাধীনতা প্রদানের ফন্দি আটা হচ্ছে কি সবার অলক্ষ্যে? ভারতীয় নীল নকশা যা আমরা দিল্লীতে অনুভব করে এসেছি তার সাথে কোথায় যেন একটা যোগসুত্র খুজে পেলাম। তবে কি কর্নেল ওসমানীও ভারতীয় নীল নকশা বাস্তবায়নেরই একজন? এ কথা বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। কর্নেল ওসমানীকে আমরা চিনি একজন নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, স্বাধীনচেতা একজন বাঙ্গালী সৈনিক হিসেবে। অবসর গ্রহণের পর হালে রাজনীতিতে যোগদান করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে এমপি হয়েছেন তিনি। কিন্তু তাই বলে কোন লোকের চরিত্রতো রাতারাতি সম্পূর্নভাবে বদলে যায় না। তার বেলাই বা সেটা কি করে সম্ভব? একবার ভাবলাম আমাদের দিল্লীর অভিজ্ঞতা তাকে সম্পূর্ণ খুলে বলে আমাদের মনোভাব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করি। আবার ভাবলাম আগে তার কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে তিনি এসবের সাথে কতটুকু জড়িত। সেটা না বুঝে সবকিছু খুলে বললে হিতে বিপরীতও হতে পারে। আমরা তিনজনই মহা বিপদের সম্মুখীন হতে পারি। প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে উভয় সংকটে পড়লাম।

আলোচনাকালে কর্নেল ওসমানী হঠাৎ করেই বলে উঠলেন, "I have decided to send you and Moti as Guerilla Advisor to the sector commanders and Noor shall be at the HQ as my ADC & Personal Staff Officer (PSO)."তার কথা শুনে চমকে উঠলাম। কি অবাক কান্ড! তাহলে কর্নেল ওসমানী আমাদেরকে নিয়ে ভারতীয় সরকার এবং প্রবাসী সরকার কি ভাবছে সে সম্পর্কে কি কিছুই জানেন না? মনে খট্‌কা লাগলো। মনে করলাম আমাদের ব্যাপারে হয়তো বা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্বয়ং তাজুদ্দিন ও ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধিরা। জনাব তাজুদ্দিন তখন পর্যন্ত কর্নেল ওসমানীকে তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছুই জানাননি। আশ্চর্য! মুক্তিফৌজের কমান্ডার-ইন্তচীফ এর কাছে বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স) নামের স্পেশাল পলিটিক্যাল ফোর্স গঠনের ব্যাপারে সবকিছুই গোপন রেখেছেন অস্থায়ী সরকার প্রধান জনাব তাজুদ্দিন আহ্‌মদ। তার মানে এ ব্যাপারে কর্নেল ওসমানীকেও বিশ্বাস করেনি ভারত এবং আওয়ামী লীগ সরকার।

মনে আশার সঞ্চার হল। কর্নেল ওসমানী নীল নকশার প্রণেতাদের একজন নয়। নিশ্চিন্ত হলাম। তাকে বিশ্বাস করে সবকিছুই বলা যায়। বেচারা কর্নেল ওসামানী! তাকে Side track করে ইতিমধ্যেই অন্য খেলা শুরু হয়ে গেছে অথচ তিনি তার কিছুই জানেন না। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে আমি বললাম,

— স্যার আপনি আমাদের গেরিলা অ্যাডভাইজার হিসাবে নিয়োগ করতে চাচ্ছেন এতে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু স্যার, জনাব প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের নিয়ে অন্য কিছু চিন্তা করছেন। আপনি কি BLF গঠন করার ব্যাপারে কিছুই জানেন না?

— What is BLF? Can you frankly tell me what is going on? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

— নিশ্চয়ই বলবো স্যার। আপনাকে বিশ্বাস করে সবকিছুই খুলে বলবো। মুক্তিযুদ্ধের কর্ণধার হিসেবে আপনার উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। জাতির সাথে আপনি কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না সেটা আমাদের বধ্যমূল ধারণা। জাতীয় স্বার্থ বিরোধী যে কোন চক্রান্তকে নস্যাত করে দেবার মত দৃঢ়তাও আপনার রয়েছে, সে ব্যাপারেও আমরা তিনজনই একমত। আমাদের অনুরোধ সবকিছু শুনে আপনি উত্তেজিত না হয়ে অত্যন্ত ধীরসস্থিভাবে চিন্তা করবেন ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে। যে কোন অসতর্ক পদক্ষেপের চরম

মূল্য দিতে হতে পারে আমাদের সবার।

— **I promise you. It will be just between me and you three. Now, let me hear everything that you want to tell in details.**

তার অভয় অঙ্গীকারে আন্তরিকতার আবেদন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। আমি বলতে লাগলাম,

— স্যার, দিল্লীতে আমাদের সময় কেটেছে জেনারেল ওবান সিং ও তার সহকর্মীদের সাথে। গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রশিক্ষন ছাড়াও রাজনৈতিক মটিভেশন দেয়া হয়েছে আমাদের। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহ্মদ বর্তমান অবস্থায় গঠিত মুক্তিবাহিনীর বেশিরভাগ কর্মকর্তা এবং সদস্যদের পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করতে পারছেন না। প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি তাদের সার্বিক আনুগত্য সর্ম্পকেও তারা সন্দিহান। প্রবাসী আওয়ামী সরকার ও তাদের দল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কার্যকরী **effective** নেতৃত্ব সফলতার সাথে কতটুকু দিতে পারবে সে সর্ম্পকেও ভারত সরকার সুনিশ্চিত নয়। রাজনৈতিক দল হিসাবে চারিত্রিক দুর্বলতা আওয়ামী লীগের রয়েছে প্রচুর, আদর্শগতভাবে রক্তক্ষয়ী একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবার মত মানসিকতা ও প্রস্তুতি কিংবা চরম ত্যাগ স্বীকার করার মত চারিত্রিক গুনাবলীও নেই দলের বেশিরভাগ সদস্যদের মধ্যে। সেক্ষেত্রে এ সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়লে নেতৃত্ব চলে যেতে পারে আওয়ামী লীগের হাত থেকে। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে মূলতঃ দু'টি শক্তি। চরমপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীরা অথবা প্রাক্তন সেনা বাহিনী, আনসার, ইপিআর, মুজাহিদ এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুক্তি বাহিনীর মধ্যে এদের অবস্থান অতি সুদৃঢ়। দীর্ঘকালীন যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে তাদের শক্তি বেড়ে যাবে। পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই অবস্থায় ভারতের বিভিন্ন জাতিসত্বার স্বাধীনতা সংগ্রামগুলোও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে তারা বিশেষভাবে চিন্তিত। যেহেতু ভারত সরকার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের বাইরে অন্য কাউকেই বিশ্বাস করছে না, সে জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে একমাত্র আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রনেই পরিচালিত করতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধাত্তোর উভয় অবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে কোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য বিশেষভাবে গঠন করা হবে একটি সম্পূর্ন রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী। বাহিনীর নাম হবে **BLF (Bangladesh Liberation Force)** এ বাহিনীর সংখ্যা হবে প্রায় এক লক্ষ। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা এবং কেন্দ্রীয় যুব এবং ছাত্র নেতারাই বিভিন্ন অঞ্চল এবং যুব শিবির এবং শরনার্থী শিবির থেকে রিক্রুটমেন্টে সহযোগিতা করবেন এই **BLF** গঠনের ব্যাপারে। রিক্রুটেড সদস্যদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর বিশেষ সদস্যরা। ট্রেনিং শেষে ওদের ভরনপোষণ এবং **deployment** করা প্রভৃতি বিষয়ে সবকিছুই করবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। এ বাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহ্মদ এবং আমরা তিনজন ছাড়া কেউ কিছু জানতে পারবে না। আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে ভারতীয় সেনা বাহিনী ও প্রধানমন্ত্রীর মাঝে লিয়াঁজো অফিসার হিসেবে। এ বাহিনীর মূল কাজ হবে স্বাধীনতা উত্তরকালে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রনে থেকে আওয়ামী লীগ এবং তদীয় সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা। পরে প্রয়োজনে এ বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হতে পারে মুজিব বাহিনী। কোন সন্দেহ অথবা ভুল বোঝাবুঝির উদ্রেক যাতে না হয় তার জন্য যুক্তি হিসাবে প্রচার চালানো হবে, এ বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ এক প্রয়োজনে। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের কারাকুঠির থেকে মুক্ত করে আনার জন্য এদের দায়িত্ব দেয়া হবে। রিক্রুটমেন্টে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় সরকার ইতিমধ্যেই চারজন যুব ও ছাত্রনেতাকে সিলেক্ট করে নিয়েছে। তারা হলেন জনাব শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক এবং জনাব তোফায়েল আহ্মদ (পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারনের কাছে 'চার খলিফা' বলে পরিচিতি লাভ করেন)। **RAW (Research and**

Analysis Wing) ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্সীর প্রধান জেনারেল ওবান সিং এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেরাদুনের অদূরে চাকুরাউল-এ এদের ভারতীয় সেনা বাহিনীর বিশেষ সদস্যরা ট্রেনিং দেবে। ট্রেনিং পর্যায়ে এবং পরবর্তিকালে ওদের রি-অর্গানাইজ করার দায়িত্বে ভারতীয়দের সাথে আমাদেরও থাকতে হবে। মানে পর্যায়ক্রমে আমরাও হয়ে পড়বো মুজিব বাহিনীর সদস্য।

আমাদের কথা শুনে কর্নেল ওসমানী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হতবাক হয়ে বললেন,

— **How strange!** এ সমস্ত ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। **I must find out from the Prime Minister how much does he know?**

— অবশ্যই তা আপনাকে জানতে হবে তবে সেটা করতে হবে বিশেষ সতকর্তার সাথে। অত্যন্ত সেনসেটিভ ব্যাপার। তাই বুঝে শুনে কথা বলতে হবে আপনাকে। জনাব তাজুদ্দিনের সাথে আপনার আলাপের পরই না হয় আমরা সিদ্ধান্ত নেব কি করা যায়।

সেদিনের মত আমাদের একান্ত বৈঠক শেষ হল। কর্নেল ওসমানী শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলেন। আমরা তার ঘরের অপরপ্রান্তে মেঝেতে বিছানা পেতে তিনজনই শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালেই কর্নেল ওসামানী জনাব তাজুদ্দিনের কাছে গিয়ে গত রাতের আলোচনা সম্পর্কে আলাপ করে ফিরে এসে জানালেন,

— প্রধানমন্ত্রীও এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

— এ কি করে সম্ভব! দিল্লীতে আমাদের বলা হয়েছে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে সবকিছুই জানেন।

— **No, Boys. He is as much as in dark as I am. And I don't think he is lieing.** এ ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ থেকে তিনি যতটুকু সম্ভব জানার চেষ্টা করবেন। **of course not exposing anyone.** তোমরাও যদি আরো কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পার তবে আমাকে জানাবে। **Prime Minister wants to know everything about this nefarious plan.** তোমাদের ব্যক্তিগত কার্যক্রম সম্পর্কে ভেবেচিন্তে আমাকে জানিও তোমরা কি করবে? বললেন তিনি।

এখানে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে, **BLF** পরবর্তিকালে মুজিব বাহিনী গঠন এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা **RAW (Research & Analytical Wing)** সর্ম্পকে জেনারেল অরোরার মন্তব্য তুলে ধরা হল:-
মুজিব বাহিনী এমন এক বাহিনী যা মুক্তি বাহিনী থেকে ছিল একেবারেই আলাদা। আমি এই বাহিনী সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। একদল ছাত্র যারা নির্বাচনের সময় মুজিবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে তারা অর্থাৎ আওয়ামী লীগের এই তরুণ অংশ আমাদের ইনটেলিজেন্সকে জানায় তারাই মুজিবের প্রকৃত সমর্থক। তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে পাঠালে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে ভালো যুদ্ধ করতে পারবে। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। তবে মুক্তি বাহিনীর সাথে যখন তাদের গোলমাল হয় তখন প্রবাসী সরকার (তাজুদ্দিনের সরকার) এ বাহিনী সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চায়। আমি আমাদের চীফ অফ ষ্টাফ জেনারেল মানিক শ'-কে এ ব্যাপারে জানাতে বলি। তিনিই আমাকে জানান যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা **RAW** এই বাহিনী গড়ে তুলেছে। এই বাহিনী নিয়ে সমস্যা যখন বাড়তে থাকে তখন দূর্গা প্রসাদ ধর (ইন্দিরা গানন্ধীর তৎকালীন মূখ্যসচিব) আমাকে জানালেন, "মুজিব বাহিনীর ব্যাপারটা বাংলাদেশ সরকারকে না জানানোর কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত নেই। ব্যাপারটা পরিস্থিতির জন্যই বর্তমানে গোপন রাখা হয়েছে মাত্র।" (বাংলাদেশ যুদ্ধের স্মৃতিচারন শিরোনামে নিখিল চক্রবর্তীকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার)

এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে বুঝা যায় প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিনকে সত্যিই ভারত সরকার এবং "র" এই বাহিনী গঠনের ব্যাপারে অন্ধকারেই রেখেছিল নিজেদের স্বার্থে।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

জাতির সাথে বেঈমানি করে "র" এর হাতে বড়ে হতে মন আমাদের বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত কর্নেল ওসমানীকে জানিয়ে দিলাম। ভারতীয় নীল নকশার সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়তে চাই না আমরা। রাজনৈতিক একটি দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য গঠিত ঠেঙ্গারে বাহিনীর নেতা হওয়ার খায়েশ নেই আমাদের তিনজনের একজনেরও। আমরা এতদূর থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসেছি অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার জন্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই যুদ্ধ করব আমরা। কর্নেল ওসমানীর সাজেশান অনুযায়ী গেরিলা অ্যাডভাইজার হয়ে সেক্টর কমান্ডারদের সাহায্য করে মুক্তিফৌজ (অনিয়মিত বাহিনী) গঠন করার দায়িত্ব নিয়ে তখনই কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত জানালাম আমরা। কর্নেল ওসমানী আমাদের জবাবে খুশি হলেন। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে কি বলা যায়? তারা যদি জানতে পারে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করেছি তবে অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠবে। অনেক চিন্তাভাবনা করে কর্নেল ওসমানী ঠিক করলেন, যদি প্রশ্ন উঠে তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে তিনি বলবেন, **BLF** কিংবা মুজিব বাহিনীর মত রাজনৈতিক একটি বাহিনী তৈরি করার দায়িত্ব সার্বিকভাবেই থাকা উচিত রাজনৈতিকভাবে সচেতন পরীক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হাতে। প্রধানমন্ত্রী এবং তার মতে আমাদের তিনজনের একজনেরও সে ধরণের রাজনৈতিক ওরিয়েন্টেশন অথবা কমিটমেন্ট কোনটাই নেই। **Therefore we are not fit for such as important assignment. Some more politically conscious persons have to be found out to lead such a highly politisized force.** সময় মত তাদের এ যুক্তি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিলেন। ফলে "চার খলিফা"কেই দায়িত্ব নিতে হয়েছিল ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় **BLF** তথা মুজিব বাহিনী গড়ার। আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম রাহুগ্রাস থেকে। আমাকে গেরিলা অ্যাডভাইজার টু দ্যা সেক্টর কমান্ডার হিসাবে ৮নং এবং ৯নং সেক্টরে পোষ্টিং অর্ডার ইস্যু করে দেন কর্নেল ওসমানী। মতিকেও একই দায়িত্ব দেয়া হল ১০ এবং ১১ নং সেক্টরে। নূরের সব যুক্তিকে খন্ডন করে প্রায় জোর করেই তাকে কর্নেল ওসমানী পার্সোনাল ষ্টাফ অফিসার হিসেবে নিয়োজিত করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীন কলহকে কেন্দ্র করে বহুমূখী চক্রান্তের সূচনা ঘটে।

কোলকাতায় অবস্থিত প্রবাসী সরকার এবং মুক্তিযুদ্ধ

৫৮ নং বালিগঞ্জ, কোলকাতা

মুজিব নগর সরকারের পিঠস্থান। লোকাকির্ণ ছোট্ট একটা জায়গা। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা ছিল অসম্ভব।

বালিগঞ্জের বাড়িটা নেহায়েতই ছোট। সবসময় অসংখ্য লোকজন ভীড় করে থাকে। নিরাপত্তা রক্ষা করা দুঃস্কর, কথাটা অতি সত্য। সর্বক্ষণ অগুনিত লোক মাছির মত ভনভন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক কামরা ছেড়ে অন্য কামরায়, কেউবা এমপি, কেউবা জাদরেল আমলা, কেউবা নেতাদের বিশেষ পরিচিত এবং আস্থাভাজন চামচা। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য নেতা, পাতি-নেতার ভীড়। গায়ে মানে না সকলেই আপনে মোড়ল। যার যার হাতে প্রত্যেকেই সাড়ে তিন হাত। গেটে প্রহরীরা কিছু জিজ্ঞাসা করলেই লংকাকান্ড বেধে যায়। সবাই যারা আসছেন তাদের ভাবসাব হচ্ছে, 'আমরা কি হনুরে'। সবার পরিধানে নতুন নতুন কাপড়-চোপড়। হাল ফ্যাশনের অন্ত নেই। দিব্যি হেলেদুলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেখা হলে দাত বের করে নিজের পরিচয় দিয়ে খাজুরে আলাপ জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। ঢালাওভাবে ভাত, গোস্ত আর ডাল রান্না হচ্ছে কিচেনে। যে আসছেন সেই খাচ্ছেন নির্দ্বিধায়। কেউ কাউকে কিছু বলছেন না। ভুড়ি ভোজনের পর বিভিন্ন ঘরে চেয়ারের উপর, বসার বেঞ্চে এমনকি টেবিলের উপরও সটান হয়ে শুয়ে পড়ে দিবা নিদ্রা কিংবা রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে নিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করছেন না এ সমস্ত ভিআইপি ব্যক্তিদের দল। প্রত্যেকের হাতে একটা নতুন ব্রিফকেস কিংবা ছোট এট্যাচী। কোন কোন নেতার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। তারা যা কিছুই করছেন এ সমস্ত জিনিসগুলোও থাকছে তাদের সাথে সাথে। এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাবার সময়ও সেগুলো সাথে নেয়া হচ্ছে, পাছে হারিয়ে যায়। ব্যাপার কি? এ সমস্ত ব্রিফকেস, এট্যাচী এবং ঝোলায় কি এমন দুর্লভ জিনিষ রয়েছে ভেবেই পাচ্ছিলাম না। রহস্যটা মতিই উৎঘাটন করল কিছুদিন পর। ও জানালো,

— স্যার, সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ও সাব-ডিভিশন থেকে মুক্তিফৌজের সাথে বর্ডার ক্রস করে আসার সময় ব্যাংক ট্রেজারীগুলো সব উজাড় করে নিয়ে এসেছেন স্থানীয় প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। যার ভাগ্যে যতটুকু পরেছে সেগুলো রাখা আছে এ সমস্ত ব্রিফকেসে, এট্যাচীতে এবং ঝোলায়। তাই এগুলোকে এভাবে হেফাজত করা হচ্ছে।

— বলো কি?

— বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখেন? বলল মতি।

একদিন কোন এক অজানা মহারথী তার মাথার নিচে ব্রিফকেসটা রেখে খাবার পর সুখনিদ্রা দিচ্ছিলেন। ঘুমের ঘোরে ব্রিফকেসটা মাথার নিচ থেকে সরে গিয়েছিল। আশেপাশে কাউকে না দেখে মতি সেটা চট করে তুলে নিয়ে খুলে ফেলল। ভদ্রলোকের ব্রিফকেসে তালা ছিল না। খুলতেই মতি ও আমার চোখ চড়কগাছ! একি! থরে থরে সাজানো পাকিস্তানী পাচঁশত টাকার নোটের বান্ডিলে ব্রিফকেসটা বোঝাই। ব্রিফকেসটা নিয়ে আমরা চুপিসারে কেটে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর ঘুম থেকে উঠে ভদ্রলোক তার ব্রিফকেসের হদিস না পেয়ে সারা বাড়ি মাথায় তুলে হায় হায় করতে লাগলেন। আরদালীকে পাঠিয়ে ভদ্রলোককে ডেকে পাঠালাম। তিনি এলেন। জিজ্ঞেস করলাম,

— কি ব্যাপার? এতো হৈ চৈ করছেন কেন?

— আমার ব্রিফকেস চুরি হয়ে গেছে। তিনি কাদো কাদো হয়ে বললেন।

— কি ছিল তাতে?

— আমার কিছু কাপড় ও প্রয়োজনীয় জরুরী কিছু কাগজপত্র ছিল।

টাকা সম্পর্কে সবটাই গোপন করলেন ভদ্রলোক। ইতিমধ্যে নূর উঠে গিয়ে পাশের ঘরে কর্নেল ওসমানীকে সবকিছু খুলে বলেছে। সব শুনে কর্নেল ওসমানী আমরা যে ঘরে বসেছিলাম সেখানে আসেন। তিনি ভদ্রলোককে অনেকভাবে জেরা করেন। ভদ্রলোক টাকার কথা সম্পূর্ন চেপে গিয়ে ঝোলাতে শুধু কিছু কাপড় ও জরুরী কাগজপত্র ছিল সে কথাই কর্নেল ওসমানীকে জানান। সব শুনে কর্নেল ওসামানী নূরকে আদেশ করেন ব্রিফকেসটি ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিতে। ইতিমধ্যেই ব্রিফকেস থেকে প্রায় ১২ লাখ টাকা আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কাপড়-চোপড় ও কিছু কাগজপত্রসহ ব্রিফকেসটি ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তিনি তাড়াতাড়ি ব্রিফকেস খুলে দেখেন টাকা ছাড়া অন্য সবকিছুই ঠিক আছে। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু অবস্থা বেগতিক বুঝে ব্রিফকেস বন্ধ করে নিয়ে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সুর সুর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর সেই ভদ্রলোককে আর কখনও দেখিনি পুরো ৯ মাস সংগ্রামকালে। উদ্ধারকৃত টাকাটা প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে জমা করে দেয়া হয়। এ ঘটনার অবতারনা এখানে এজন্য করলাম, তখন তথাকথিত মুজিবনগর সরকারের কার্যালয় দেখে বোঝা কষ্ট হত যে একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চলছে বাংলাদেশে। আর সে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন প্রবাসী বালিগঞ্জস্থ লোকজন। যে সমস্ত লোকজন তখন অকারণে বালিগঞ্জের বাড়িতে ভীড় করে সর্বদা ঘুর ঘুর করতেন তাদের হাবভাব দেখে মনে হত সবাই যেন বরযাত্রী হয়ে এসেছেন কোন দূরদেশ থেকে! কোন ভাবনা নেই, কোন চিন্তা নেই! নির্বিঘ্নে হেসে খেলে সময় কাটিয়ে আনন্দেই আবার ফিরে যাবেন তারা।

৮নং এবং ৯নং সেক্টরে যোগদান

স্বয়ং কর্নেল ওসমানীই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ৮নং এবং ৯নং সেক্টরের অধিনায়কদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে।

থিয়েটার রোড থেকে কর্নেল ওসমানী একদিন আমাকে নিয়ে চললেন ৮নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারস বনগাঁয়, সাথে নূর। শহর থেকে প্রায় ৯০-৯৫ মাইল দূরে যশোর বর্ডারের গা ঘেসে বনগাঁ। ওখানে পৌঁছে কর্নেল ওসমানী আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ৮নং সেক্টর কমান্ডার মেজর ওসমান এবং ৯নং সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন জলিলের সাথে। তাদের বিস্তারিত ব্রিফিং দিলেন তিনি। সেখানে পরিচয় হল বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন হাফিজ, লেফটেন্যান্ট হালিম, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন, পুলিশের এসডিপিও মাহবুব, সিএসপি কামাল সিদ্দিকী এবং তৌফিক এলাহী চৌধুরী ও লেফটেন্যান্ট মাহবুবের সাথে। ওরা সবাই আমাকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। দুপুরের খাওয়ার পর কর্নেল ওসমানী নূরকে নিয়ে ফিরে গেলেন। যাবার আগে জানিয়ে গেলেন শীঘ্রই তিনি সেক্টর কমান্ডারদের একটি গুরত্বপূর্ন কনফারেন্স ডাকবেন কোলকাতায়। সে কনফারেন্সে মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান স্তর এবং ভবিষ্যত রনকৌশল ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে কর্মপদ্ধতি ঠিক করা হবে। থিয়েটার রোড ছেড়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে পৌঁছে ভীষণ ভালো লাগছিল। মতিও আমি চলে আসার পরপরই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সেক্টরগুলোর দায়িত্ব নিয়ে চলে যায়।

শুরু হল নতুন কর্মজীবন। খুলনা, যশোরের ছিন্নমূল ও বিক্ষিপ্ত অনেক ইপিআর, কিছুসংখ্যক নিয়মিত বাহিনীর সৈন্য, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে মেজর ওসমানের অধিনে শুরু হয় প্রতিরোধ সংগ্রাম। তার সাথে যোগ দেয় স্থানীয় ছাত্র-জনতা। নড়াইলের তরুণ এসডিও জনাব কামাল সিদ্দিকী, মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরী এবং মাগুরার এসডিও ওয়ালীউর রহমানও প্রতিরোধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মেজর ওসমান তার অধিনস্থ সমস্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের ৭টি কোম্পানীতে বিভক্ত করে সীমান্তবর্তী এলাকায় তাদের নিয়োগ করেন।

১) প্রথম কোম্পানী উত্তরে মহেশকুন্ড বিওপি এলাকায় লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীরের অধিনে।

২) দ্বিতীয় কোম্পানী তার দক্ষিনে ইছাখালী বিওপি এলাকায়। কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী।

৩) তৃতীয় কোম্পানী আরো দক্ষিনে জীবননগর বিওপি এলাকায়। নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমান।

৪) চতুর্থ কোম্পানী কাশিমপুর-মুকুন্দপুর-বয়ড়া এলাকায় ক্যাপ্টেন খন্দোকার নাজমুল হুদার অধিনে।

৫) পঞ্চম কোম্পানী বেনাপোল কাস্টমস্ চেকপোষ্ট এলাকায় লেফটেন্যান্ট আবদুল হালিমের অধিনে। এ কোম্পানী পরবর্তী পর্যায়ে ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী সিএসপির অধিনে দেওয়া হয়।

৬) ষষ্ঠ কোম্পানী আরও দক্ষিনে বকশা-কাকডাঙ্গা-বেনাপোল থানার এলাকায় ক্যাপ্টেন শফিকউল্লার অধিনে।

৭) সপ্তম কোম্পানী ভোমরা এলাকার গোজভাঙ্গায় ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিনের অধিনে।

মে মাসের শেষে ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিনকে হেডকোয়ার্টারসে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব নেয়ার জন্য চলে যেতে হয় মুজিবনগর তথা ৮নং থিয়েটার রোডে। তখন ঐ সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয় পুলিশের এসডিপিও মাহবুবউদ্দিনকে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাক্তন ফ্ল্যাইট লেফটেন্যান্ট জামালউদ্দিন এমপি, ক্যাপ্টেন ওয়াহাব এবং লেফটেন্যান্ট এনামুল হক ৮নং সেক্টরে যোগদান করেন। ফ্ল্যাইট লেফটেন্যান্ট জামালউদ্দিনকে সেক্টর হেডকোয়ার্টারস এ ষ্টাফ অফিসার হিসাবে নিয়োজিত করা হয়।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাক বাহিনীর ব্যুহ ভেদ করে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধ করতে করতে বর্ডার পেরিয়ে ৮নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেন ফার্ষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অকুতোভয় সেনারা। বেনাপোল বর্ডার পর্যন্ত মাত্র ১৮৮ জন সৈনিককে জীবিত অবস্থায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল হাফিজ। পুরো রেজিমেন্টের বাকি সবাই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। বেনাপোল পৌঁছে সেক্টর হেডকোয়ার্টারস এর কাছেই সে তার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। বনগাঁ বিওপির বিপরীতে মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশের পতাকা সমুন্নত রাখার পবিত্র দায়িত্ব যথাযথ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে ফার্ষ্ট ইস্ট বেঙ্গলের বীর জোয়ানরা শেষদিন পর্যন্ত পালন করেছিলেন। ক্যাপ্টেন হাফিজ আমার বিশেষ বন্ধু বিধায় ওর সাথেই আমার থাকার বন্দোবস্ত করি।

বরিশাল ও খুলনায় একইভাবে ২৫শে মার্চ রাতের পর থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন জলিল। তিনি ছিলেন আর্মড কোরের একজন সৈনিক এবং পরে মেধাবলে অফিসার হয়েছিলেন তিনি। পুলিশ বাহিনীর অস্ত্রাগার লুন্ঠন করেই তিনি শুরু করেন প্রতিরোধ সংগ্রাম। তার সাথে যোগ দেন লেঃ মেহেদী, লেঃ জিয়া এবং লেঃ নাসের। এছাড়াও তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর, লেঃ খুরশীদ প্রমুখ। লেফটেন্যান্ট খুরশীদ তথাকথিত আগরতলা মামলার একজন আসামীও ছিলেন। এরপর এমএ বেগ নামে একজন যুবক এসে নবম সেক্টরে যোগ দেয়। তিনি পাকিস্তান সেনা বাহিনীর একজন দক্ষ প্যারাস্যুট জাম্পার ও ফ্রগম্যান হিসেবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিক বিধায় পরে তাকে নৌবাহিনীতে শীপম্যান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ৯নং সেক্টরকে গঠন করা হয় খুলনার কিছু অংশ, ফরিদপুরের কিছু অংশ এবং পুরো বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন ক্যাপ্টেন জলিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথমার্ধে বরিশাল, পটুয়াখালীতে ক্যাপ্টেন মেহেদী, খুলনার সুন্দরবন এলাকায় লেঃ জিয়া এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় ক্যাপ্টেন হুদা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। জুলাই মাসে ৯নং সেক্টরকে পুনর্গঠিত করা হয়। বরিশাল জেলার দায়িত্ব দেয়া হয় পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরকে। পটুয়াখালীর দায়িত্ব দেয়া হয় ক্যাপ্টেন মেহেদীকে। সুন্দরবন ও খুলনার দায়িত্ব দেয়া হয় লেঃ জিয়াকে। পিরোজপুর, বাগেরহাট এলাকা দেয়া হয় সুবেদার তাজুল ইসলামকে। ক্যাপ্টেন হুদাকে দেয়া হয় সীমান্তবর্তী এলাকা। সেক্টর হেডকোয়ার্টারস প্রথম স্থাপন করা হয় হাসনাবাদে। পরে সরিয়ে নেয়া হয় টাকীতে। সেক্টর হেডকোয়ার্টারসে থাকতেন ক্যাপ্টেন জলিল, এডজ্যুটেন্ট এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ফ্ল্যাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও মফিজ। এদের সাথে ষ্টাফ অফিসার হিসেবে ছিল ক্যাপ্টেন আরিফিন। সেক্টরের প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল তকিপুর। ইনচার্জ ছিলেন সুবেদার গোলাম আজম। ৯নং সেক্টরের নৌবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন চীফ পেটি অফিসার এম ইউ আলম। সুন্দরবনে লেঃ জিয়ার অধিনে ছিলেন ফুল মিয়া ও মধু। প্রথম পর্যায়ে টাকী, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ এবং শমসের নগরে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হল। এরপর হিঙ্গলগঞ্জের ক্যাম্প উক্শা পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। এরপর বরিশাল, খুলনা অঞ্চলে ক্রমে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল।

ক্যাপ্টেন জলিলকে শাসানো হয়

সীমিত গোলাবারুদ ও অস্ত্র নিয়ে মোকাবেলা করতে ভিষণ অসুবিধার সম্মুখিন হতে হচ্ছিল ক্যাপ্টেন জলিল এবং অন্যান্য অধিনায়কদের। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ক্যাপ্টেন জলিল কোন সোর্স এর মাধ্যমে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং ভারতীয় বিএসএফ এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তাদের মাধ্যমে তিনি কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হন। ইষ্টার্ণ কমান্ড হেডকোয়াটার্স তাকে কিছু হাতিয়ার ও গোলাবারুদ দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলো বরিশাল নিয়ে যাবার পথে পথিমধ্যে খানসেনাদের এক আচমকা অ্যামবুশ আক্রান্ত হয়ে কোনরকমে প্রাণে বেচে ফিরে আসেন।

প্রবাসী সরকার এবং কর্নেল ওসমানী তার এই ধরনের উদ্যোগে ক্ষেপে উঠেন। বিশেষ করে কর্নেল ওসমানী তার প্রতি ভিষণভাবে রাগান্বিত হন এবং তাকে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে অপসারনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অন্যান্য কমান্ডাররা এবং আমি ও নূর কোন রকমে কর্নেল ওসমানীকে বোঝাতে সক্ষম হই যুদ্ধের সেই প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন জলিলের মতো একজন বীর এবং জনপ্রিয় কমান্ডারকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হবে। আমাদের সবার আকুতি এবং অনুরোধে কর্নেল ওসমানী তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন জলিলকে ঐ ধরনের উদ্যোগ ও গাফিলতির জন্য হুশিঁয়ার করে তাকে শাসিয়েছিলেন কড়াভাবে। কিন্তু আর্শ্চয্যের বিষয় হলো প্রবাসী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একাংশ ঐ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে নাখোশ হয়েছিলেন।

অন্যান্য অভিজ্ঞতা

আমি সালাম জানাই ঐ সমস্ত যুবকদের চেতনা এবং দেশপ্রেমকে যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জাতির মেরুদন্ড হয়ে উঠেছিলেন।

ইতিমধ্যে ঝড়ের বেগে আমার কাজ এগিয়ে চলেছে। কৃষ্ণনগর থেকে তকীপুর, সমস্ত সেক্টর আমি ঝাটিকা সফর করে বেড়াচ্ছি। আমার মূল দায়িত্ব যুবশিবির ও শরনার্থী শিবির থেকে গেরিলাদের রিক্রুট করে তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা। সাথে সাথে সেক্টর ট্রুপসদের প্রশিক্ষন ও অপারেশনে সাব সেক্টর কমান্ডারদের সাহায্য করা। এরই ফাকে ১ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে পুনর্গঠিত করার কাজেও ক্যাপ্টেন হাফিজকে সাহায্য করছিলাম যতটুকু সম্ভব। রাতদিন পরিশ্রম করে জুন মাসের মধ্যেই প্রায় হাজার দশেক গেরিলা রিক্রুট করে ফেলেছিলাম। তাদেরকে ২০০ থেকে ৫০০ এর একটি ব্যাচে বিহারের চাকুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের ট্রেনিং এ পাঠানো হচ্ছিল। একই সাথে যুব শিবির এবং সাব সেক্টরগুলোতেও আমরা কয়েকটি ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। সেক্টরের নিয়মিত বাহিনীর অভিজ্ঞ সৈনিকরা গেরিলাদের হালকা অস্ত্র, গ্রেনেড, ডেমোলিশন, রেইড, অ্যামবুশ, আনআর্মড কাম্বেট, ম্যাপ রিডিং, আরবান এবং জঙ্গল ওয়ারফেয়ার, অবস্ট্যাকলস প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষন দিচ্ছিলেন। লাইভ ফায়ারিং এর বন্দোবস্তও করা হয়েছিল টেম্পোরারী রেঞ্জ তৈরি করে। একই সাথে চলছিল মটিভেশন ক্লাশ।

এখানে রিক্রুটিং এর কাজে নিয়োজিত থাকাকালে একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। যুদ্ধকালে প্রায় এক লাখের মত মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নেয়। কিন্তু এর মধ্যে শতকরা একভাগও শরনার্থী শিবিরের লোক ছিল না। শরনার্থী শিবিরের আশ্রয় গ্রহণকারী বেশিরভাগ লোকই ছিলেন হিন্দু। তাদের মধ্যে খুব কম লোকের মাঝেই ট্রেনিং গ্রহণ করে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহ দেখা যেত। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে শরনার্থী শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা পরিবারের সব সদস্য নিয়েই সেখানে থাকত। জীবন বাচাঁনোর জন্য দু'বেলা দু'মুঠো আহারের নিশ্চয়তাও শিবিরে তাদের ছিল। বাংলাদেশ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করার মত তাদের খুব বেশি কেউই ছিল না। শিবিরে তাদের জীবনের নিরাপত্তাও ছিল। তাদেরকে নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা কারা করছে, কিভাবে করছে, এ নিয়ে তাদের তেমন কোন মাথাব্যাথা ছিল না। মনে মনে হয়তো বা তারা চাইত কষ্টের কাজটুকু অন্যে করুক, তারা একদিন ধীরে সুস্থে ফিরতে পারলেই হয়। শরনার্থী শিবিরের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেরই আবার পশ্চিমবঙ্গে আত্মীয়-স্বজন বিভিন্ন শহর গ্রামে পার্টিশনের সময় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার চাপ এড়াতে বয়স্করা যুবকদের বর্ডার থেকে দূরে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে দিত। ওরা সেখানে কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে জীবন চালাত। শরনার্থীদের মধ্যে এবং নিছক প্রাণের ভয়ে যারা দেশত্যাগ করেছিল তাদের মধ্যে সুবিধাবাদী মনোবৃত্তিই লক্ষ্য করা গেছে। যুদ্ধে তাদের বিশেষ কোন অবদান ছিল না। কিছু থাকলে তা ছিল পরিস্থিতি সাপেক্ষে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নয়। অনেক ক্ষেত্রে শরনার্থী শিবিরগুলোতে খুঁজেও সমর্থ লোক পেতাম না। পাওয়া যেত শুধু বুড়ো মানুষ, শিশু ও মহিলাদের।

এরই বিপরীত অবস্থা ছিল যুব শিবিরগুলোতে। হাজার হাজার তরুণ, যুবক, ছাত্র/ছাত্রী, সমাজের অন্যান্য পেশাজীবি, সমর্থ ছেলেদের ভীড়ে প্রতিটি যুব শিবিরই ভরে থাকত সবসময়। বাসস্থানের সংকুলানের অভাবে অনেককে ফিরিয়েও দেয়া হত বাধ্য হয়ে। তারা তাদের আত্মীয়-পরিজনদের বাংলাদেশে ফেলে রেখে ছুটে আসত সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করে হাতিয়ার নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে খান সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তারা অতি কষ্টকর পরিবেশে যুব শিবিরে দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে অনেকক্ষেত্রে অভূক্ত থেকে উদ্গ্রীব

হয়ে অপেক্ষা করত কবে তাদের রিক্রুট করে ট্রেনিং এ পাঠানো হবে। শতকষ্টে ও তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে দেখিনি। প্রত্যেকের মধ্যে দেখেছি প্রতিশোধের স্পৃহা এবং দেশকে স্বাধীন করার অঙ্গীকার। আজ একটি কথা স্পষ্ট করে স্বীকার করছি, শরনার্থী শিবিরে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে যারা নিরাপদ জীবন-যাপন করেছিল তাদের তুলনায় হাজার রকমের ভয়ভীতি, অজানা আশংকা ও সমূহ বিপদের মোকাবেলা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী যারা দেশেই থেকে গিয়েছিল, স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদানের মূল্য কোন অংশে কম নয়। তাদের অনেককেই দিতে হয়েছে চরম আহুতি।

তাদের আত্মত্যাগের স্পৃহা, আবেগ এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রত্যয় ছিল জাতির গর্বের বিষয়। তাদের ঐ ধরনের চারিত্রিক মনোবল দেখে আমার আত্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছিল যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোন অপশক্তি, কোন ষড়যন্ত্রই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। আল্লাহ কখনোই তাদের এই ধরনের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ব্যর্থ হতে দেবেন না। জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজের এমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যোগদানের নজীর বিশ্বে খুব কম জাতির স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে খুজে পাওয়া যায়। গণচীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইন্দোচায়না, আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপের এ ধরনের গর্বের দাবি করতে পারে না। এ সমস্ত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে বৃহত্তর কোন সংঘর্ষের সুযোগ কিংবা যুদ্ধকালিন এবং এর পরবর্তী অবস্থাতে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রস্তুতির পর। এ সত্য খন্ডাবার কোনো সুযোগ নাই। অন্য কেউ নয় শুধুমাত্র তারাই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যদি কোন গোষ্ঠি, পার্টি এককভাবে নিজেদের স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মনে করে তবে সেটা হবে সত্যের বরখেলাপ এবং এক অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। সার্বিকভাবে স্বাধীনতার কৃতিত্ব দেশের জনগণের এবং বিশেষভাবে নিঃস্বার্থ, ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধাদের।

বিনা মেঘে বজ্রপাত

কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ করলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঠিক অধিনায়কদের মহাসম্মেলনের প্রাক্কালে।

ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সহায়তায় ক্যাপ্টেন জলিলের ফোর্ট উইলিয়ামের পূর্বাঞ্চলীয় হেডকোয়ার্টারসের কর্মকর্তাদের সাথে গোপন যোগাযোগ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠল। ভারতীয় সরকার শুধুমাত্র প্রবাসী সরকার এবং মুক্তি বাহিনীর সদর দপ্তরের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক গতিধারাকে নিয়ন্ত্রন করছিল তা নয়, তারা ক্ষমতাধর কমান্ডারদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। অত্যন্ত চতুরতার সাথে তারা তাজুদ্দিনের প্রবাসী সরকারের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাকেও দুর্বল করে চাপের মুখে রাখছিল যাতে তিনি তাদের নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থাকতে বাধ্য হন। অপরদিকে মুজিবনগর সরকার ও মুক্তিযোদ্ধের সর্বাধিনায়ক জনাব ওসমানীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কর্নেল ওসমানীর ক্ষমতা সীমিত করে রাখা হচিছল একইভাবে। কর্নেল ওসমানীকে সাইড ট্র্যাক করে প্রবাসী সরকার ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের এ ধরণের কার্যকলাপে কর্নেল ওসমানী অতি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভীষণভাবে অপমানিত বোধ করছিলেন। তার বক্তব্য ছিল পরিষ্কার। ভারত বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী মানবিক কারণে সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে সেটার জন্য বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামটা পূর্ব বাংলার ৮ কোটি বাঙ্গালীর নিজস্ব সংগ্রাম। এ সংগ্রাম তাদেরই সংগঠিত করতে হবে। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে তাদেরকেই অর্জন করতে হবে জাতীয় স্বাধীনতা, সংগ্রামের নেতৃত্ব ও সব দায়িত্বও থাকতে হবে মুক্তিফৌজ কমান্ড ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অধীন। জনাব ওসমানী নীতির এ প্রশ্নে কখনোই আপোষ করেননি। এ বিষয় নিয়ে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বের সাথে অনেক বির্তক হয়েছে তার। কিন্তু তার এ নীতির প্রতি সমর্থন দেননি আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ নেতৃত্ব ও গণপরিষদ সদস্যরা।

ইতিমধ্যেই ৮ই জুলাই কোলকাতায় সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলন ডাকা হয় কর্নেল ওসামানীর নির্দেশে। কিন্তু সম্মেলনের কয়েকদিন আগে হঠাৎ করেই একদিন ঘটল এক ঘটনা। ক্যাবিনেট মিটিং এ কর্নেল ওসমানী প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিনকে পরিষ্কার ভাষায় হুশিয়াঁরী দিয়ে বললেন,

— ভারতের গোয়েন্দা ও সেনা বাহিনীর কর্তৃপক্ষ যদি মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের কার্যক্রম চালাতে থাকেন তবে শুধুমাত্র শিখন্ডী কমান্ডার ইন চীফ হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে আমি স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেব।

তিনি মিটিং এ জনাব তাজুদ্দিনকে প্রশ্ন করেন,

— বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামটা কাদের সংগ্রাম? এটা যদি ভারতের সংগ্রাম হয়ে থাকে তবে আমরা সবাই কি তাদের হাতে ক্রিয়ানক হয়ে ইসলামাবাদ থেকে দিল্লীতে তথাকথিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী স্থানান্তরের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছি?

ঐ বক্তব্যের পর তিনি একটি পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সকলকে স্তম্ভিত করে সভা কক্ষ ত্যাগ করেন। কথাটা মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত থিয়েটার রোড হেডকোয়ার্টারসে ছড়িয়ে পড়ল। আমরা ইয়াং অফিসার যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম তাদের মাঝে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হল। আমাদের হাবভাব দেখে কয়েক মিনিটের মধ্যে থিয়েটার রোড ছেড়ে সংসদ সদস্যদের দল, মন্ত্রীবর্গ সবাই কেটে পড়লেন। আমরা সোজা প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে অনুরোধ জানালাম, যে করেই হোক কর্নেল ওসমানীকে আপনার আশ্বাস দিতে হবে যাতে তাকে বাইপাস করে ভারতীয়রা কোন কিছু না করে। আপনি যদি এ আশ্বাস তাকে দিতে পারেন তবে আমরা তাকে তার পদত্যাগ পত্র ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ জানাব এবং যে করেই হোক তাকে রাজি করাব। এটা যদি আপনি করতে ব্যর্থ হন তবে দু'দিন পর সেক্টর কমান্ডারদের যে মিটিং এখানে হবে তার পরিণতি কি হবে সেটা আপনি নিশ্চয়ই ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছেন। আপনাকে শুধু এতটুকুই বলছি,

আমাদের মুক্তি বাহিনীর একজন সৈনিক বেঁচে থাকতে কর্নেল ওসমানীর গায়ে এতটুকু আচড় কেউ দিতে পারবে না। আমরা কেউ তার এতটুকু অপমানও বরদাস্ত করব না।

তাছাড়া তার বক্তব্যে যুক্তি রয়েছে। আগে আপনি বলেছেন বিএলএফ-মুজিব বাহিনী গঠনের ব্যাপারে আপনি কিছুই জানতেন না। এ খবর আপনি জানতে পেরে নাকি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তার অ্যাডভাইজারদের সাথে এর প্রতিবিধান করার চেষ্ঠা করে ব্যর্থ হয়ে তাদের সিদ্ধান্ত নেহায়েত অপারগ হয়েই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আপনাদের এ ধরণের অপারগতার সুযোগে তারা তাদের নীল নকশার জাল বিস্তার করে চলেছে। তাদের জালে আটকে পড়ে থাকা নির্জীব বাংলাদেশ আমাদের কাম্য নয়। পরনির্ভরশীল পঙ্গু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য হাজার হাজার বাঙ্গালী রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে না বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে। আমরা তথা আপমর জনসাধারণ বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যদি ১২ বছর, ১৫ বছর, ২০ বছর রক্তক্ষরণের ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের শক্তির বলে তাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতা অর্জন করে থাকতে পারেন তবে আমরাই বা পারব না কেন আমাদের নিজ শক্তিতে স্বাধীনতার সূর্যকে হানাদার বাহিনীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে? পৃথিবীর অনেক জাতি তাদের মুক্তি সংগ্রামে মিত্র দেশের সহযোগিতা গ্রহণ করেছে সংগ্রামকালে কিন্তু তাই বলে তারা নিজেদের সত্বাকে তো বিকিয়ে দেয়নি। আপনি প্রধানমন্ত্রী। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সব কিছু দেখে বুঝে শুনে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে দৃঢ়তার সাথে সমস্যার মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়া। আপনি যদি সততা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে চলেন তবে আপনি আপনার যাত্রা পথে নিঃসঙ্গ হবেন না। আমরা সবাই থাকব আপনার সাথে।

প্রধানমন্ত্রী আমাদের বক্তব্য শুনে বললেন তিনি কিছু একটা করবেন। কর্নেল ওসমানীকে **passify** করার দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। বাইরে এসে শুনলাম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, তাজুদ্দিন এবং প্রবাসী সরকারের সাথে কর্নেল ওসমানীর মতানৈক্য ঘটায় তিনি নাকি কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে হুকুম দিয়েছেন সমস্ত আওয়ামী লীগ সরকারকে অ্যারেষ্ট করতে। প্রধানমন্ত্রীকে ইতিমধ্যেই নাকি অ্যারেষ্ট করে রাখা হয়েছে থিয়েটার রোডেই! বাকিরা পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন। গুজবটা শুনে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। ভাবলাম, গুজবটা ছড়িয়ে আওয়ামী লীগাররা তাদের দুর্বলতাটাকেই প্রকাশ করে দিলেন তাদের অজান্তে।

অধিনায়কদের মহাসম্মেলন

৮ই জুলাই মহাসম্মেলনের দিন ধার্য্য করা ছিল। অধিনায়কদের অনেকেই কোলকাতায় পৌঁছে গেছেন। আমরা তখনও চেষ্টা করছিলাম যাতে কর্ণেল ওসমানী তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

এদিকে কনফারেন্সের দিন ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে। বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডাররাও ইতিমধ্যে কোলকাতায় এসে উপস্থিত হচ্ছেন। কর্নেল ওসমানীকে আমরা একনাগাড়ে বুঝিয়ে চলেছি। অনুরোধ করে চলেছি তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিতে। ভীষণ একরোখা মানুষ কর্নেল ওসমানী। যারা তার সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন তারা সবাই সেটা জানেন। অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধী এবং অভিমানী তিনি। নীতির প্রশ্নে জীবনে কেউই তাকে আপোষ করাতে সক্ষম হয়নি। নূর ও আমাকে তিনি ভীষণভাবে স্নেহ করতেন। বকাও খেয়েছি অনেক। কোন সময় অযৌক্তিকভাবেও বটে। তবুও তার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তার যে আন্তরিক ভালোবাসা আমি পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেটা এক অমূল্য অনুভূতি। একান্ত নিভৃতে শ্রদ্ধার সাথে তাকে ও তার স্মৃতিগুলো আমি স্মরন করে যাব সারাজীবন। চাকুরিতে থাকাকালীন এবং চাকুরিচ্যুত অবস্থায় আমরা নিজেদের মাঝে অনেক মতামত বিনিময় করেছি নির্দ্বিধায়। এমনকি অনেক ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কেও তার পিতৃসুলভ আচরণ ও উপদেশাবলীর কথা আজও মনে হলে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

যাক সে কথা। বাইরের ওসমানীর চেয়ে তার অন্তরের কিছুটা জানতে পারার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল বলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। আমাদের আকুতি-মিনতির জবাবে তিনি কিছুই বলছেন না; এমন একটা অনিশ্চিতয়তার মাঝেই শুরু হল সম্মেলন ১১ই জুলাই ১৯৭১-এ। অধিবেশনের আগে যখন এ সমস্ত ঘটনা ঘটছিল তখনই মে মাসের শেষ দিকে একদিন বয়রা সেক্টর এর একটি অপারেশনে আমি প্রথমবারের মত গুলিবিদ্ধ হই। ইনজ্যুরিটা বিশেষ সিরিয়াস ছিল না। ডান হাতের মাঝের আঙ্গুলটা ভেঙ্গে গিয়েছিল গুলি লেগে। আল্লাহর অসীম কৃপায় প্রাণে বেঁচে যাই। ক্ষত নিয়েই আমার দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলাম। হাতের ব্যান্ডেজ নিয়েই সেক্টরে সেক্টরে ঘুরে ফিরেছি। ফলে ঠিকমত ঔষধ এবং কেয়ার না নেয়ায় ক্ষতে একটা খারাপ ধরণের ইনফেকশান দেখা দেয়। ফলে হেডকোয়ার্টারসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আমি রক্ষা করতে পারিনি। অবশ্য নূরের মাধ্যমে মাঝেমধ্যে খবরা-খবর যতটুকু সম্ভব জানার চেষ্টা করেছি। সেক্টর থেকে যোগাযোগের ব্যবস্থাও ছিল খুবই সীমিত। সম্মেলনে সব সেক্টর থেকে কমান্ডাররা এসেছিলেন। সম্মেলনের দিন সকালে নূর এসে বলল, কর্নেল ওসমানী কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করবেন না। কারণ প্রধানমন্ত্রী ও মুজিবনগর সরকারের কাছ থেকে তিনি তার পদত্যাগের ব্যাপারে সন্তোষজনক কোন জবাব পাননি। সেক্ষেত্রে তার পক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়াটা হবে অসম্মানজনক। তাছাড়া সম্মেলনে সবাই তাকে পদত্যাগের কারণও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। পদত্যাগের সঠিক কারণ এই মুহূর্তে সবাইকে জানানোটা সমীচীন মনে করছেন না কর্নেল ওসমানী। নূর এ খবরটা আমাকে জানিয়ে অনুরোধ করল সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে। মুজিবনগর সরকারের প্রতিক্রিয়া দেখে কর্নেল ওসমানী তার পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবেন আভাস পেলাম।

থিয়েটার রোডেই কনফারেন্স শুরু হল। সবাই উপস্থিত। জনাব তাজুদ্দিন আহ্মদ প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে হাজির হলেন। বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর সেনা প্রধান হিসাবে ওসমানী অনুপস্থিত। তিনি জানিয়েছেন বিশেষ কারণবশতঃ তার পক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কর্নেল ওসমানীর উপস্থিতি সেখানে ছিল অপরিহার্য। কিন্তু তিনি নেই দেখে

সবার কাছে ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক মনে হল। যাই হোক জনাব তাজুদ্দিন লম্বা-চওড়া ভাষণ শুরু করলেন। তার ভাষণে তিনি সবাইকে জানালেন,

-সেক্টর কমান্ডারদের অনাস্থাবশতঃ কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন।

উপস্থিত সবাই প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কথাটা এতই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিল যে, কমান্ডারদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কর্নেল ওসমানীর উপর কমান্ডারদের আস্থা নেই এ কথা প্রধানমন্ত্রী কি করে জানলেন সে বিষয়ে অনেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার কোন জবাব দিতে পারলেন না। বাক-বিতন্ডার মাঝে অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে কনফারেন্স হল ত্যাগ করে চলে যেতে হল। সম্মেলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররা। কর্নেল ওসমানী সবার কাছে বিশেষ করে বাঙ্গালী বীর যোদ্ধাদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তার উপর অনাস্থা এনেছেন কারা সে রহস্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত কোন কনফারেন্স হবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হল প্রধানমন্ত্রীর অবর্তমানেই। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে আমি ও নূর মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ এবং উইং কমান্ডার বাশারকে একান্তভাবে কর্নেল ওসমানীর পদত্যাগের আসল কারণ খুলে বললাম। আমরা এটাও তাদের বুঝিয়ে বললাম কর্নেল ওসমানীর এ ধরণের ষ্ট্যান্ড এ অস্থায়ী সরকার ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নীল নকশা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা অতি কৌশলে কমান্ডার ইন চীফের পদ থেকে তাকে বাদ দেয়ার পরিকল্পনা আটছে তার পদত্যাগের সুযোগ গ্রহণ করে। তাদের এ পরিকল্পনার পেছনে মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন কমান্ডারও পরোক্ষভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা তাদের আমাদের দিল্লীর অভিজ্ঞতা এবং বিএলএফ-মুজিব বাহিনী গড়ে তোলার নীল নকশার কথাও খুলে বললাম। সব কিছু বিস্তারিত জানিয়ে তাদের অনুরোধ করলাম, যে করেই হোক কর্নেল ওসমানীকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাখতে হবে। তাকে সম্মুখে রাখতে না পারলে নীল নকশার মোকাবেলা করতে আমরা সবাই ব্যর্থ হব। আর তাতে জাতীয় স্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের সাথে তারা একমত হলেন। ঠিক হল উপস্থিত সবার তরফ থেকে তারা কর্নেল ওসমানীর সাথে দেখা করে তাকে তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানাবেন। একইসাথে তাকে আশ্বাসও দেয়া হবে তিনি যাতে স্বসম্মানে তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিতে পারেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য করা হবে সমগ্র মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে। কর্নেল ওসমানীর সাথে গোপন বৈঠক হল। আমরা যা বলেছিলাম তার পুনরাবৃত্তিই তিনি করলেন তাদের কাছে। সবাই তার পদত্যাগ করার পেছনের যুক্তি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। সব বুঝে তারা তাকে অনুরোধ জানালেন জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সব ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করার জন্য তার নেতৃত্ব বিশেষভাবে প্রয়োজন। একমাত্র তিনিই মুক্তি বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কোন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাদের দেয়া **Assurance** এর পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল ওসমানী তার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করবেন বলে আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তার সাথে আলাপের পর আমরা গেলাম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জনাব নজরুল ইসলাম ও অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিনের কাছে। আমাদের দেখে দু'জনই বেশ কিছুটা অস্বস্থিবোধ করছিলেন। সকালের মিটিং-এর অবস্থা বুঝে জনাব তাজুদ্দিন ইতিমধ্যেই শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। সরাসরিভাবে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হল,

— আপনি কোন যুক্তির ভিত্তিতে সকালে আপনার বক্তব্যে বললেন সেক্টর কমান্ডারদের অনাস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

জবাবে কিছুটা বিব্রত হয়ে তাজুদ্দিন সাহেব বললেন,

— তার কাছে খবর রয়েছে যে বেশ কিছু কমান্ডার জনাব ওসমানীর উপর অনাস্থা পোষণ করছেন।

— মহামান্য প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, শুধুমাত্র কমান্ডারদের তরফ থেকেই নয়, সমগ্র মুক্তি ফৌজের তরফ থেকে আমাদের পূর্ণ আস্থাই যে রয়েছে কর্নেল ওসমানীর উপর মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তা নয় তিনি আমাদের অতি শ্রদ্ধার পাত্রও বটে। তার পরিবর্তে অন্য কাউকে যদি কমান্ডার ইন চীফ বানাবার চিন্তা-ভাবনা

করে থাকেন তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধার কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারেন। প্রবাসী সরকারের হয়তো বা ক্ষমতা থাকতে পারে, সরকার ইচ্ছামত একজন সর্বাধিনায়কও নিয়োগ করতে পারে কিন্তু তার পরিণতি কি হবে সেটাও একটু ভেবে দেখবেন। মেজর জিয়াই প্রধানমন্ত্রীর কথার জবাব দিলেন।

জনাব নজরুল ইসলাম ও তাজুদ্দিন দু'জনই মেজর জিয়ার কথা শুনে ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষন ভেবে তাজুদ্দিন সাহেব বললেন,

— ওসমানী সাহেব স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। তিনি সেটা প্রত্যাহার করলে সরকার তার পূনর্নিয়োগ সর্ম্পকে পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

— তিনি স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছেন সেটা ঠিক। কিন্তু সম্মেলনে আপনি যে কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা সত্য নয়। কি কারণে তিনি পদত্যাগপত্র সরকারকে স্বেচ্ছায় দিয়েছেন সেটা আমরা অবশ্যই শুনব তার কাছ থেকেই। আমাদের অনুরোধ কাল সম্মেলনে আপনি বলবেন, আপনার কাছে যে খবর এসেছিল কিছু কমান্ডারের অনাস্থার ব্যাপারে সেটা তদন্তে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয় আপনি আরও বলবেন উপস্থিত সব কমান্ডার এবং সমগ্র মুক্তি ফৌজের দাবি একমাত্র কর্নেল ওসমানীই থাকবেন কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে। অন্য কেউ নয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সবার তরফ থেকে আপনি স্বয়ং তাকে তার ইস্তফা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য অনুরোধ জানাবেন এবং একমাত্র সে ক্ষেত্রেই তিনি তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করবেন।

কথার ধরণ থেকে বুদ্ধিমান জনাব তাজুদ্দিন আহ্মদ বুঝে নিলেন মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডাররা ইতিমধ্যে অনেক কিছুই জেনে গেছেন। পর্দার অন্তরালে পাশা খেলার চালগুলো সম্পর্কেও হয়তোবা অনেকেই অবগত হয়ে পড়েছেন। তাই কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে না পড়ার জন্য মেজর জিয়ার অনুরোধ মেনে নিতে রাজি হলেন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন। পুরো মিটিং এ নির্বাক নিরব সাক্ষী হয়ে নিশ্চুপ বসে ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব নজরুল ইসলাম। মিটিং এর বিস্তারিত বিবরণ নূরের মাধ্যমে জানানো হল কর্নেল ওসমানীকে। পরদিন কথামত কাজ করলেন প্রধানমন্ত্রী। তার অনুরোধে কর্নেল ওসমানী তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে সম্মেলনের নেতৃত্ব দেবার স্বীকৃতি জানালে করতালির মাধ্যমে উপস্থিত সবাই কর্নেল ওসমানীর সিদ্ধান্তকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে সম্মেলন শুরু হল। চানক্য বুদ্ধির দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে কর্নেল ওসমানীকে কমান্ডার ইন চীফ পদে বহাল রাখতে পেরে আমরা তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পেরেছিলাম বলে নিজেদের আত্মপ্রত্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের এই বিজয় থেকে আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে, জানবাজ মুক্তিসেনারা অন্যায় ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কোন কিছুই মুখ বুজে সহ্য করবেন না। এ সম্মেলনে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন সমস্যা এবং ভবিষ্যতে কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কর্নেল ওসমানীর মনোভাব আমাদের আগেই জনা ছিল, সে আলোকেই আলোচনা পরিচালিত হয়। ঐ বৈঠকে লেঃ কর্নেল এম এ রব বাংলাদেশ মুক্তি ফৌজের চীফ অফ ষ্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দোকার ডেপুটি চীফ অফ ষ্টাফ নিযুক্ত হন। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেসব নেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে :-

১) বিভিন্ন সেক্টরের সীমানা নির্ধারন।

২) মুক্তিযুদ্ধের কৌশল পদ্ধতির সারসংক্ষেপ এবং বর্ণনা।

(ক) নির্ধারিত এলাকায় নির্দিষ্ট দায়িত্বে পাঁচ অথবা দশজনকে নিয়ে গঠিত ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা দলগুলোকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হবে।

(খ) গেরিলাদের শ্রেণী বিভক্তি :-

এ্যাকশন গ্রুপ :

এ গ্রুপের সদস্যরা শত্রুর বিরুদ্ধে সরাসরি তবে গেরিলা হামলা চালাবে। তারা শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ হাতিয়ার বহন করবে।

গোয়েন্দা সেনা :

এই গ্রুপের গেরিলারা হেডকোয়ার্টারসের অধিনে প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এরা সাধারণত সম্মুখ সংঘর্ষে জড়িত হবে না। এদের মূল দায়িত্ব হবে খবরা-খবর সংগ্রহ করা। এদের কাছে শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগের বেশী অস্ত্র থাকবে না।

গেরিলা ঘাটি :

প্রতিটি গেরিলা ঘাটি সেক্টর ট্রুপস এর দ্বারা রক্ষিত হবে। প্রতিটি ঘাটিতে গেরিলাদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ঘাটিতে একটি করে মেডিকেল টিম থাকবে প্রয়োজনে গেরিলাদের চিকিৎসার জন্য। প্রত্যেক ঘাটিতে গেরিলাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্য একজন রাজনৈতিক নেতা থাকবেন। তার দায়িত্ব হবে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তানীদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়া এবং একই সঙ্গে বাঙ্গালীরা যেন মানসিক সাহস ও শক্তি হারিয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। শত্রুর বিরুদ্ধে বড় ধরণের আক্রমন পরিচালনার উদ্দ্যেশ্যে আরো বেশি সংখ্যক গেরিলা কিংবা নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের সংকুলানের জন্য প্রতিটি ঘাটিকে তৈরি রাখাও এদের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু বাস্তবে পরবর্তিকালে এই রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য মুজিবনগর সরকার থেকে কোন প্রতিনিধিই আসেনি। সেক্টর এবং সাব-সেক্টর কমান্ডারদেরকেই নিজেদের উদ্যোগে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল।

৩) নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের অবিলম্বে ব্যাটালিয়ন ফোর্স এবং সেক্টর ট্রুপস এ সংগঠিত করতে হবে।

৪) যুদ্ধ পরিকল্পনার পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ:-

(ক) প্রতিটি সুবিধাজনক স্থানে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য বিপুল সংখ্যক গেরিলাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে হবে।

(খ) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে দেয়া হবে না। বিদ্যুতের খুঁটি, সাবস্টেশন প্রভৃতি ধ্বংস করে বিদ্যুৎ সরবরাহ অচল করে দিতে হবে।

(গ) কোন কাঁচামাল কিংবা উৎপাদিত পণ্য রফতানি করতে দেয়া হবে না। এ সমস্ত জিনিস যে সমস্ত গুদামে থাকবে সেগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে।

কোন কাঁচামাল কিংবা উৎপাদিত পণ্য রফতানি করতে দেয়া হবে না। এ সমস্ত জিনিস যে সমস্ত গুদামে থাকবে সেগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে।

(ঘ) শত্রুপক্ষের সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম, রসদপত্র আনা নেয়ার জন্য ব্যবহারযোগ্য যানবাহন, রেলপথ, নৌযান, রাস্তা, পুল প্রভৃতি পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে হবে।

(ঙ) রণকৌশলগত পরিকল্পনা এভাবে করতে হবে যাতে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

(চ) শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করার পর তাদের বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোর উপর গেরিলারা মরণপন আঘাত হানবে।

এ সম্মেলনে বাংলাদেশকে নিম্মোক্ত এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয় :-

১নং সেক্টর : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার অংশ বিশেষ মুহুরী নদীর পূর্ব এলাকা নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সমগ্র সেক্টরকে ৫টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। মেজর জিয়া সেক্টর কমান্ডার নিয়োজিত হন। (পরে জিয়া জেড ফোর্স কমান্ডার নিযুক্ত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন রফিক ১নং সেক্টর কমান্ডার নিয়োজিত হন।) এ সেক্টরের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ২১'শত। এর মধ্যে ১৫'শত ইপিআর, ২'শ পুলিশ, ৩'শ সামরিক বাহিনী এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১'শ। এখানে গেরিলাদের সংখ্যা ছিল প্রায়

২০ হাজার। এদের মধ্যে ৮ হাজারকে এ্যাকশন গ্রুপ হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শতকরা ৩৫ ভাগ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেয়া হয় এই সেক্টরকে।

২নং সেক্টর : কুমিল্লা, ফরিদপুর জেলা, নোয়াখালী ও ঢাকার অংশ বিশেষ নিয়ে এ সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর খালেদ মোশাররফ। সেক্টরটিকে ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সমগ্র সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ হাজার। গেরিলা ছিল ৩০ হাজার। (মেজর খালেদ মোশাররফ ফোর্স কমান্ডার হিসেবে গুরুতরভাবে আহত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন হায়দার সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।)

৩নং সেক্টর : মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টরটিকে ১০টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। গেরিলাদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর শফিউল্লাহ। (এস' ফোর্স গঠনের পর মেজর শফিউল্লাহর জায়গায় মেজর নূরুজ্জামানকে ৩নং সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়।)

৪নং সেক্টর : উত্তরে সিলেট সদর এবং দক্ষিনে হবিগঞ্জ থানার মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ৪নং সেক্টর। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত। সেক্টরটিকে ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার। গেরিলা ছিল প্রায় ১২ হাজার।

৫নং সেক্টর : সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় এই সেক্টর। কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর মীর শওকত আলী। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮'শ, গেরিলা ছিল প্রায় ৫ হাজার। সেক্টরটিকে ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

৬ নং সেক্টর : এই সেক্টর রংপুর এবং দিনাজপুর নিয়ে গঠিত হয়। উইং কমান্ডার এম কে বাশার নিযুক্ত হন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে। সাব-সেক্টর ৫টি। নিয়মিত বাহিনী সংখ্যা প্রায় ১২'শ। গেরিলা ছিল প্রায় ৬ হাজার।

৭নং সেক্টর : রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা এবং দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত হয় এ সেক্টর। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর নাজমুল হক। (যুদ্ধকালীন সময় এক মটর দুর্ঘটনায় তিনি শহীদ হলে তার স্থলে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর এম হাসান।) সাব-সেক্টরের সংখ্যা ৮টি। সৈন্য সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। গেরিলা প্রায় ৮ হাজার।

৮নং সেক্টর : কুষ্টিয়া, যশোর এবং খুলনার অংশ বিশেষ নিয়ে এ সেক্টর গঠন করা হয়। ১৫ই জুলাই পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ ওসমান চৌধুরী। পরবর্তিকালে মেজর ওসমানকে হেডকোয়ার্টারসএ বদলি করে নিয়ে আসা হয়। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার পর মেজর মঞ্জুর ৮ নং সেক্টরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার। গেরিলা প্রায় ৮ হাজার। সাব-সেক্টরের সংখ্যা ৭টি।

৯নং সেক্টর : বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনার অংশ বিশেষ, ফরিদপুরের একাংশ নিয়ে এ সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল। সাব-সেক্টরের সংখ্যা ৮টি। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫'শ। গেরিলা প্রায় ১৫ হাজার।

১০নং সেক্টর : এ সেক্টরের কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিলনা। নৌ কমান্ডোরাই এ সেক্টরের অধিনে ছিল। শত্রুপক্ষেও টার্গেট ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজন মত বিভিন্ন

সেক্টরে গ্রুপ গঠন করে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্বে পাঠানো হবে সেই সিদ্ধান্তই নেয়া হয়। তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয় সেক্টর কমান্ডারদের। দায়িত্ব সম্পন্ন করার পর নৌ কমান্ডোরা সব আবার তাদের মূল আস্তানা ১০নং সেক্টরে ফিরে আসবে ঠিক করা হয়।

১১নং সেক্টর : এ সেক্টর ছিল বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং তুরা ও গারো অঞ্চল নিয়ে। কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর তাহের। (১৫ই নভেম্বর এক অভিযানে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে একটি পা হারান।) সাব-সেক্টর ছিল ৮টি। গেরিলা সংখ্যা ২৫ হাজার।

এ সম্মেলনে সেক্টরসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার পর মুক্তি ফৌজের সৈনিকদেরকেও নিম্নলিখিত ক্যাটাগরিতে পূনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়:-

নিয়মিত বাহিনী : ২৫শে মার্চ রাতের শ্বেত সন্ত্রাসের পর ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ কোর এবং অন্যান্য সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যদের নামকরণ করা হয় নিয়মিত বাহিনী।

বিশেষ ফোর্স : আর্মি ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে তিনটি ব্রিগেড গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তখনকার ৫টি ব্যাটালিয়নকে কেন্দ্র করেই নিয়মিত বাহিনীর পূনর্গঠনের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এইসব ব্যাটালিয়নের জনশক্তি ছিল খুবই কম। প্রত্যেক সেক্টর থেকে উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করে এদের শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে নতুন আরও ব্যাটালিয়ন দাড় করানোর সিদ্ধান্ত হয়।

এগুলোকে পরে ব্রিগেড গ্রুপে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এদের দ্বারা গঠিত তিনটি ব্রিগেড গ্রুপই পরে জেড' ফোর্স, এস' ফোর্স এবং কে' ফোর্স নামে পরিচিত হয়।

সেক্টর ট্রুপস্ : উপরোক্ত ব্যাটালিয়নগুলোতে যেসব ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের অর্ন্তভুক্ত করা সম্ভব হবে না তাদেরকে সেক্টর ট্রুপস হিসাবে যুদ্ধ করার জন্য ইউনিট এবং সাব-ইউনিটে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন ধারনের জন্য নগন্য সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের তরফ থেকে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের বেশিরভাগই ঐ অর্থ গ্রহণ না করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনিয়মিত বাহিনী অথবা ফ্রিডম ফাইটার্স (এফ এফ) : গেরিলা হিসেবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যাদের ট্রেনিং দেয়া হত তাদের বলা হত অনিয়মিত বাহিনী, গণবাহিনী, অথবা ফ্রিডম ফাইটার্স। প্রথম পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলার অভাব ছিল। সঠিক রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ এবং কঠোর সংগ্রামী জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তাদের সুশৃঙ্খল গেরিলা হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গণবাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিংকালে সামান্য পকেট খরচা এবং বাংলাদেশের ভেতরে পাঠাবার সময় প্রথমবার তাদের কিছু রাহা খরচ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এরপর তাদের বিশাল জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমাকে, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন, লেঃ মতি ও লেঃ নূরকে আগের দায়িত্বেই বহাল রাখা হয়।

কনফারেন্সে কমান্ডারদের নিয়মিত এবং অনিয়মিত বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো এবং সদস্য সংখ্যা হিসাব করে তাদের জন্য কাপড়-চোপড়, রেশন, অস্ত্র, গোলা-বারুদ, ওয়্যারলেস সেট, টেলিফোন, অতি আবশ্যকীয় রসদপত্রের তালিকা তৈরি করে মুজিবনগর সরকারের কাছে পেশ করতে বলা হয়। অস্থায়ী সরকার চাহিদা অনুযায়ী ভারত সরকারের কাছ থেকে জিনিসগুলো সংগ্রহ করবে সেই কথাই জানানো হয়েছিল মিটিং-এ। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কয়েকটি ফিল্ড হাসপাতাল গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এছাড়া সেক্টর এবং সাব-সেক্টরগুলোতেও চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্তও গৃহিত হয়। কনফারেন্সে কর্নেল ওসমানী সবাইকে জানালেন ইতিমধ্যে পাকিস্তান থেকেও বাঙ্গালী সামরিক বাহিনীর অফিসাররা পালিয়ে আসার চেষ্টা এবং উদ্যোগ নিচ্ছে। এপ্রিল মাসে তিনজনের সর্বপ্রথম দলটির মাঝে রয়েছি আমি, লেঃ মতি ও লেঃ নূর। আমাদের কাছ থেকে জানা তথ্যের ভিত্তিতে তিনি আরও বলেছিলেন অনেক বাঙ্গালী অফিসারই স্বাধীনতা যুদ্ধ যোগ দেবার জন্য পালিয়ে আসার সুযোগ খুঁজছে কিন্তু সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পালিয়ে এসে তারপর যুদ্ধে যোগ দেয়ার কাজটি খুবই বিপদজনক; বিশেষ করে পাকিস্তানে পরিবার-পরিজন নিয়ে যারা বসবাস করছে তাদের জন্য তো বটেই। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারত সরকারের মনোভাব কি সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে না পারায় অনেকেই পালিয়ে ভারতে আসতে ভরসা পাচ্ছে না। তাদের এ ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করার আহ্বান জানানো হয়েছে বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। পাকিস্তান থেকে অফিসাররা চলে আসছে জানতে পেরে সকলেই খুশি হলেন। আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হল।

অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে পরে আমাদের হয়েছিল তিক্ত অভিজ্ঞতা। কখনোই আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং রসদপত্র পাইনি। যা পেয়েছি তার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় খুবই সামান্য। নিঃসন্দেহে এ সমস্যার কারণে আমাদের যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় শত্রুর হাতে মার খেতে হয়েছিল অনেকক্ষেত্রে। পরবর্তিকালে কমান্ডাররা ক্রমান্বয়ে নিজেরাই সব ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ন হবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যান। শত্রুপক্ষ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রই ছিল আমাদের হাতিয়ারের মূল উৎস। এতে করে আমাদের পাঁচমিশালী হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। ফলে গোলাবারুদ নিয়ে আমাদের নিদারুণ সংকটে পড়তে হত। যানবাহনের সমস্যা ছিল অতি প্রকট। আমরা সম্পূর্নভাবে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা এবং মুক্তাঞ্চল থেকে কব্জা করা গাড়িগুলোর উপরই নির্ভরশীল ছিলাম। এদের রক্ষনা-বেক্ষনের দায়িত্বও নিতে হয় কমান্ডারদেরকেই। আমাদের চিকিৎসার সমস্যাও ছিল প্রকট। ভারতীয় হাসপাতালগুলো প্রায় সময় ভরে থাকত শরনার্থীতে।

যুদ্ধকালীন সময় সবচেয়ে বড় ফিল্ড হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছিল ২নং সেক্টরের বিশ্রামগঞ্জে। বৃটেন থেকে আগত ডাঃ জাফরুল্লাহ, ডাঃ মোমেন এবং তাদের আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের উদ্যোগে এবং প্রবাসী বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী হিতৈশীদের সাহায্যে এই বেসরকারি ফিল্ড হাসপাতাল অতি কষ্টে স্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধে তারা অমূল্য অবদান রাখেন। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে খুব কম সংখ্যক চিকিৎসকই যুদ্ধে যোগদান করে। তাই তাদের ঘাটতি পূরণ করতে হয়েছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে। তাদের নিঃস্বার্থ প্রাণঢালা সেবার কথা মুক্তিযোদ্ধারা কখনোই ভুলতে পারবেন না।

এ ধরণের আরো অনেক সমস্যা ও সমাধানের উপায় কনফারেন্সে যদিও বা আলোচিত হয়েছিল এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সব চাহিদাই পূরণ করা হবে বলে মুজিবনগর সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু যুদ্ধকালীন সময় মুক্তিযোদ্ধারা কখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে কিছুই পায়নি। ঠিক সময়মত পাওয়া যায়নি অতি প্রয়োজনীয় যুদ্ধসম্ভার। বর্ষাকালে জরুরী ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আচ্ছাদন নির্মানের কথা থাকলেও সে আচ্ছাদন তৈরি করতে পারেনি আওয়ামী লীগ সরকার। মুক্তিযোদ্ধারা হাড়কাপুনী শীতে রাত কাটিয়েছেন খোলা আকাশের নিচে। তাবু এবং শীতবস্ত্রের পর্যাপ্ত কোন বন্দোবস্তই করা সম্ভব হয়নি সরকারের পক্ষে। কম্বলের উষ্ণতা

থেকে বঞ্চিত থেকেছেন আহত মুক্তিযোদ্ধারা। অধিকাংশ বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন আধপেটা খেয়ে, খালিগায়ে, খালিপায়ে। সব কষ্ট, সব অসুবিধা তারা হাসিমুখে মোকাবেলা করেছিলেন একটি স্বপ্নের নেশায়। সে স্বপ্ন স্বাধীন শোষণমুক্ত বাংলাদেশ।

জুলাই মাসে পৌঁছলেন ক্যাপ্টেন তাহের, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী এবং মেজর মঞ্জুর-তার পরিবার এবং দু'জন সৈনিক দেহরক্ষী। তারা শিয়ালকোট সেক্টর দিয়ে পালিয়ে আসেন। তাদের পর আরো যারা পালিয়ে আসেন তারা হল ক্যাপ্টেন খায়রুল আনাম, ক্যাপ্টেন পাশা, ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার রশিদ খান, লেঃ বজলুল হুদা, ক্যাপ্টেন রাশেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন ফারুক রহমান, ক্যাপ্টেন রশিদ, লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর প্রমুখ। কনফারেন্সের সুযোগে অনেকের সাথেই আমাদের মত বিনিময় হয় ভারতীয় নীল নকশার প্রভাব ও পরিণতি নিয়ে। যাদের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম শুধু তাদের সাথেই গোপনে আলোচনা করা হয়েছিল এই অতি স্পর্শকাতর বিষয়টি। মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন জলিল এবং উইং কমান্ডার বাশার এর অন্যতম। পরবর্তী পর্যায়ে মেজর মঞ্জুর, ক্যাপ্টেন তাহের, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন, ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার, ক্যাপ্টেন হাফিজ, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন রশিদ, ক্যাপ্টেন মহসীন, ল্যোটেনেন্ট হুদা, লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর ছাড়াও যাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল তাদের সাথেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। পর্দার অন্তরালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন মহল, অস্থায়ী সরকার ও ভারতীয় প্রশাসনের চক্রান্ত ও স্বার্থ নিয়ে আলোচনার ফলে কতগুলো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ঐক্যমত্যের সৃষ্টি হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারত সরকারের নীতি এবং মুজিবনগর সরকারের অযোগ্যতাকে নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করা ঠিক হবে না। আমাদের বিভিন্ন মহলের উদ্দ্যেশ্য এবং তাদের হীন উদ্দ্যেশ্য হাসিলের চক্রান্তের ব্যাপারে সদা সচেতন থাকতে হবে। একইসাথে মুক্তিযোদ্ধাদের পূনর্গঠন করে তাদেরকে সামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে চক্রান্তের বিভিন্ন দিক। তাদের মটিভেট করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে সব চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়ে আমাদের দেশ স্বাধীন করতে হবে আমাদের নিজেদেরকেই। শুধুমাত্র ইসলামাবাদ থেকে দিল্লীতে রাজধানী বদলের জন্য যুদ্ধ করছি না আমরা, প্রয়োজনে পাক বাহিনীর সাথে সাথে অবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের। আট কোটি বাঙ্গালীর জন্য হাসিল করতে হবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে একটি যথার্থ স্বাধীন বাংলাদেশ। কোন করদ রাজ্য কিংবা নামেমাত্র স্বাধীনতা নয়, চাই প্রকৃত স্বাধীনতা এবং জাতীয় মুক্তি। প্রত্যেক কমান্ডারকে তার কর্মদক্ষতা, শৌর্য্য-বীর্য, সাংগঠনিক দক্ষতা, আত্মত্যাগ, রাজনৈতিক সচেতনতা, দেশপ্রেম, রণযোগ্যতা, সাহস ও নৈতিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তাঙ্গনের জনগণের হৃদয়ে নেতৃত্বের স্থান করে নিতে হবে যাতে করে যুদ্ধত্তোর পর্বে প্রয়োজনে যে কোন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে তৈরি করে তুলতে হবে জনগণের **Natural Leader** হিসেবে। এভাবেই সম্ভব হবে নিজেদের শক্তির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। এভাবে নিজেদের তৈরি করতে পারলে ভবিষ্যতে যে কোন হুমকির মোকাবেলায় জনগণকে সাথে নিয়ে পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হবেন যে কোন ক্রান্তিলগ্নে। স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

ভৌগলিক সীমানা বিকৃত করার চক্রান্ত

বর্তমান বাংলাদেশ আদি বঙ্গের একটি অংশমাত্র। ১৯৭১ সালে জাতীয় পতাকার মাঝখানে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র বসিয়ে দেয়ার বিষয়টি ছিল চক্রান্তমূলক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা এবং সচেতন জনতার বিরোধিতার চাপে মুজিবনগর সরকার মানচিত্র সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আদি বঙ্গের পরিসীমা নির্ধারিত ছিল এভাবে:-

উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, নেপাল, সিকিম এবং ভূটান। উত্তরপূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র এবং এর অববাহিকার গড়ে উঠা ব-দ্বীপ অঞ্চল, উত্তর পশ্চিমে দাড় গঙ্গা, উত্তরে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত ভাগিরথী নদীর অববাহিকার সমতলভূমি, পূর্বদিকে বার্মার পর্বতমালা, পশ্চিম বঙ্গের সর্বাঞ্চল, বীরভূম, মালভূম, ধলভূম, কেওঞ্জর, ময়ুরভঞ্জের অরণ্যময় মালভূমি, দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর। এই সমগ্র জায়গা নিয়েই ছিল প্রাচীনকালের বঙ্গ অথবা বাংলাদেশ। উল্লেখযোগ্য জনপদগুলো ছিল গৌড়, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাড়, সুহম্ন, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বাঙ্গাল, হরিকল প্রভৃতি জনপদ গড়ে তুলেছিল বঙ্গবাসী বা বাংলাদেশীরা। কোল, ভীল, সাবর, পুলিন্দ, হড়ী, ডোম, চন্ডাল, সাওঁতাল, মুন্ডা, ওরাঁও, ভূমিজ, বাগদী, বাউড়ী, পোদ, মালপাহাড়ী প্রমুখ অন্তজ এদের সমন্বয়েই সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গবাসী অথবা বাঙ্গালী জাতিগোষ্ঠি। কালের আবর্তে বিদেশী আগ্রাসী শক্তিসমূহ এদেশকে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশকে বিভক্ত করেছে তাদের শাসন ও শোষণ কায়েম রাখার জন্য ভৌগোলিক দ্বিধা-বিভক্তির ফলে জাতি হয়ে পরেছে বিভক্ত। কিন্তু ভৌগোলিক সীমানা অপরিবর্তনীয় নয়। আমাদের পূর্ব পুরুষরা গড়ে তুলেছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট জনপদ, শহর, নগর, বন্দর এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ও জনপদ। তারা সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন উন্নতমানের সংস্কৃতি এবং বিষ্ময়কর ঐতিহ্যবাহী শিল্প ব্যবস্থা। এর সবকিছুই আমাদের জাতীয় গৌরব। কায়েমী স্বার্থবাদীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন আমাদের আবাসভূমি সীমানা সর্ম্পকে ধূম্রজাল সৃষ্টি করতে এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে জটিলতা এবং উৎভ্রান্তি সৃষ্টি করতে যাতে করে তাদের কায়েমী স্বার্থ টিকে থাকে তা একদিন নস্যাৎ হয়ে যাবে। কোন বিতর্ক সৃষ্টি করতে জনগণকে সর্বকালের জন্য বোকা বানিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব হবে না। জাতি একদিন ঐতিহাসিক সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে এবং ইনশাল্লাহ এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যখন তারা তাদের দীর্ঘদিনের অন্যায় এবং বঞ্চনার হিসাব-নিকাশ করে তাদের ঐতিহাসিক পাওনা আবার আদায় করে নেবে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ই কাদের সিদ্দিকীকে আলোচ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তোলে।

আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি। পুরোপুরিভাবে সুস্থ না হলেও সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি আমি সেক্টরে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেই।

কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠার পর সেপ্টেম্বরে ফিরে গেলাম সেক্টরে। বা হাতে তখনও প্লাষ্টার। যুদ্ধ তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলাদেশে। মুক্তিফৌজ এবং গেরিলাদের হাতে প্রচন্ড মার খেয়ে হানাদার বাহিনী দিশেহারা। তাদের মনোবল সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। তীব্র গেরিলা অভিযানে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে খানসেনারা তখন বড়বড় শহরে **Defensive Position** -এ বাধ্য হয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। শহরগুলো ছাড়া সারা বাংলাদেশ তখন বিশাল এক মুক্তাঙ্গন। গেরিলারা প্রায় পুরো দেশই তাদের অবাধ বিচরণ ভূমিতে পরিণত করেছেন। তাদের সফল তৎপরতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতিমধ্যেই সময়সাপেক্ষে একটি বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। মুক্তিফৌজের সাহস, উদ্দম এবং সাংগঠনিক শক্তি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। প্রধান প্রধান শহরগুলো এমনকি ঢাকা শহরেও প্রকাশ্য দিবালোকে অসীম সাহসিকতার সাথে একটার পর একটা সফল অভিযান করে চলেছে বীর মুক্তিযোদ্ধারা। নাস্তনাবুদ বেসামাল খানসেনারা 'মুক্তি'-দের সর্বদা তটস্থ অবস্থায় থাকছে। বিশেষ করে রাতের আধাঁর ওদের জন্য হয়ে উঠেছে নাভিশ্বাসের কারণ। জানবাজ মুক্তিযোদ্ধাদের অভূতপূর্ব সাফল্যের খবরগুলো বিদেশী প্রচার মাধ্যগুলোতে শিরোনামে প্রকাশিত হচ্ছে প্রায় প্রতিদিন। আমাদের **Moral** ভীষণ **High.** ইতিমধ্যে বিএলএফ এর ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্যরা দেশের ভিতরে বিভিন্ন **Strategic Point** -এ অবস্থান নিয়েছে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিফৌজের তুলনায় অনেক উচুঁমানের। এ সত্বেও খান সেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংঘাতে তেমন একটা অংশগ্রহণ করছে না তারা। পক্ষান্তরে অনেক জায়গায় জনগণের উপর অন্যায়-জুলুম, চাঁদাবাজী এবং লুটপাট করছিল তারা। সে সমস্ত খবর পাচ্ছিলাম আমরা। তাদের ঐ ধরণের কার্যকলাপে বাধা দেবার কালে অনেক জায়গায় মুক্তিফৌজের যোদ্ধাদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হচ্ছিল।

এই সময় হঠাৎ করে ভারতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো কাদের সিদ্দিকী নামক এক বিএলএফ সদস্য সম্পর্কে ফলাও করে প্রচারণা শুরু করে এমনভাবে যেন শুধুমাত্র কাদের সিদ্দিকীই মুক্তিযুদ্ধ করছে। এ ধরণের প্রচারণায় আমরা কিছুটা বিস্মিত হলাম। পাকিস্তান আমলে ১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই সৈনিক নায়েক কাদের সিদ্দিকীকে **Disciplinary Charge** এ শাস্তিমূলকভাবে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে তার তেমন কোন বিশেষ ভূমিকার কথাও শোনা যায়নি। সেক্ষেত্রে তাকে নিয়ে এতটা হৈ চৈ কি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। একইভাবে মাঝে মেজর খালেদ মোশাররফকেও ফোকাস এ আনার চেষ্টা চলেছিল কিছুদিন। পক্ষান্তরে মেজর জিয়া তার প্রাপ্য মর্যাদা কখনোই পাননি প্রবাসী ও ভারত সরকারের কাছ থেকে। দুই সরকার তার প্রতি ছিল সন্দিহান এবং বিদ্বেষপ্রবণ। কালুরঘাট থেকে দেশবাসীর প্রতি স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্বাধীনতার যে উদাত্ত আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন তাকে মেনে নিতে পারেনি আওয়ামী সরকার।

মন্ত্রিসভা এবং সচিবালয় গঠন করা হলো

তরুণ আমলারা মুজিবনগর সচিবালয়ে যোগদানে অসম্মতি জানায়।

জুলাই আগষ্ট মাসে প্রবাসী সরকার সেই পুরোনো ঔপনিবেশিক ধাচেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সচিবালয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সমস্ত আমলারা সীমান্ত পেরিয়ে কোলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিল তাদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল এ সমস্ত আমলাতান্ত্রিক সংগঠন। সেক্টর এবং সাব সেক্টরগুলোর মতো এ সমস্ত সংগঠনেও ভারতীয় প্রতিপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছিল। কিছু তরুণ দেশপ্রেমিক আমলা এ ধরনের উদ্যোগের অসাড়তা উপলব্দি করে ঐ সমস্ত মন্ত্রণালয় এবং সচিবালয়ে যোগদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। পরিবর্তে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগদান করে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। জনাব তৌফিক এলাহি চৌধুরি এবং জনাব কামাল সিদ্দিকী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খন্দোকার মোশতাক আহ্মদ তার মন্ত্রণালয় স্থাপন করলেন সার্কাস এ্যাভেনিউতে। পুরো মিশনটাই তখন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান দপ্তর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিল। পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন জনাব মাহবুবুল আলম চাষী। খন্দোকার মোশতাক আহ্মদের একান্ত সচিব জনাব কামাল সিদ্দিকী। এ ছাড়া সার্কাস এ্যাভেনিউতে জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং জনাব মওদুদ আহ্মদ বর্হিবিশ্বের সাথে এবং বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য একটি তথ্য সেল খুলেছিলেন। সেটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগসাজসে পরিচালিত হত। আইনজীবি হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জনাব মওদুদ আহ্মদ আওয়ামী লীগের পক্ষে কৌসুলী হয়ে যথেষ্ট কাজ করেছিলেন তবুও প্রবাসী সরকারের কাছ থেকে তিনি তার উদ্যোগের কোন স্বীকৃতি পাননি। এ ব্যাপারে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করে জনাব মওদুদ আহ্মদ প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহ্মদকে একটি নিবেদন পত্রও লিখেছিলেন। তিনি চাইছিলেন স্বীয় উদ্যোগে স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে তিনি যা কিছুই করছিলেন প্রবাসী সরকার তার স্বীকৃতি দিয়ে তাকেও কোন একটা বড়সড় পদে বহাল করুক। কিন্তু তার সে আশা পূরণ করেনি মুজিবনগর সরকার অজানা কোন কারণবশতঃ।

তাজুদ্দিন আহমদ এবং খন্দোকার মোশতাক আহমদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

শুরু থেকেই নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে মতপার্থক্য হতে থাকে। ভারত সরকার যে কোন কারণেই হোক খন্দোকার মোশতাক আহমদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না।

ইতিমধ্যে থিয়েটার রোডের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিরোধিতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে। নীতিগত অনেক বিষয়েই জনাব তাজুদ্দিন ও তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাঝে ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকে। ভারতীয় সরকারও জনাব মোশতাকের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। বাজারে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে জনাব খন্দোকার মোশতাক আহ্মদ গোপনে সিআইএ এর মাধ্যমে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। অস্থায়ী সরকারের অলক্ষ্যে আমেরিকার মধ্যস্থতায় তিনি নাকি পাকিস্তান সরকার ও শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তান সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান খুজে পাবার চেষ্টায় আছেন। তার এই উদ্যোগের পেছনে আওয়ামী লীগের দক্ষিনপন্থী বেশ একটা বড় প্রভাবশালী অংশের সমর্থনও নাকি রয়েছে। এ ধরণের গুজব ছড়িয়ে পড়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তার এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে মুজিবনগর সরকারের রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হল। নেতাদের অনেকেই তখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ করে সহসা বা কোনদিনই দেশ স্বাধীন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ পোষণ করতেন।

তাদের মনোভাব ছিল এরূপ:- যা হবার তাতো হয়েই গেছে। আখের যতটুকু গোছাবার তাও বেশ গুছিয়ে ফেলা হয়েছে সেক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরতে না পারলে, গোছান সম্পদ ভোগ করা যাবে না। তাই ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমার সুযোগটা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

তারা কোলকাতায় বেশ আরাম-আয়েশেই সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের অসৎ উপায়ে লুটপাট করার কথা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল। এতে তাদের সম্মানেরই শুধু হানি হচ্ছিল তা নয় তাদের অনেকের প্রতিই বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। তারা যেখানে অনাহারে, অস্ত্রহীন-বস্ত্রহীন অবস্থায় দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবনবাজী রেখে রণাঙ্গনে লড়ছেন তখন এ সমস্ত অসৎ রাজনীতিবিদ ও লুটেরার দল লুটপাটের বেশুমার টাকায় বিলাসী জীবন যাপন করে বাঙ্গালীদের বদনাম করছিলেন অতি নির্লজ্জভাবে। এ অপমান মুক্তিযোদ্ধারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিতে চাচ্ছেন আওয়ামী লীগের অনেক সদস্যই। তারা বাংলাদেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে দোদুল্যমনতায় ভুগছেন। অনেকেই আবার ভারতীয় নীল নকশার কথা আচঁ করতে পেরে শংকিত হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তাদের ফিরে যাবার পথে মূল বাধা হয়ে দাড়িয়েছে ইন্দিরা সরকার। ভারত সরকার কিছুতেই চাচ্ছে না বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার ইয়াহিয়া সরকারের সাথে কোনরূপ রাজনৈতিক আপোষের চেষ্টা করুক। তাদের চাপের মুখে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে জনাব তাজুদ্দিন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে বাধ্য হন, "ইয়াহিয়া সরকারের সাধারণ ক্ষমা প্রবাসী সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।" মুক্তিযোদ্ধারাও সংগ্রামের এই পর্যায়ে কোনরকম আপোষের বিরোধিতা করছিলেন। তারা চাইছিলেন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে। এভাবেই সার্বিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছিল। হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক আহ্মদ আমেরিকা যাচ্ছেন লন্ডন হয়ে এক সফরে। বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে জাতিসংঘ প্রধান এবং অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধান বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোর রাষ্ট্রনায়কদের সাথে তিনি মত বিনিময় করে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি

তাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করবেন তিনি এ সফরকালে। অতএব তার এই সফর হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাবার সব প্রস্তুতিই প্রায় শেষ। কামাল সিদ্দিকীও যাচ্ছে সফরসঙ্গী হয়ে। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আকস্মিকভাবেই সফর স্থগিত করে দেয় প্রবাসী সরকার। শুধু তাই নয়, মোশতাক আহ্মদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয় এবং তার স্থলে আবদুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বানানো হয়। জনাব মাহ্বুব আলম চাষীকেও সরিয়ে দেয়া হয় পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব থেকে। এই ধরণের পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে সবকিছুই চেপে যায় তাজুদ্দিন সরকার। কিন্তু পরে সব গোপনীয়তাই ফাঁস হয়ে যায়।

জানা যায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা নাকি জানতে পারে যে, জনাব মোশতাক আহ্মদ গোপনে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। তার লন্ডন সফরের উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন সরকারের মধ্যস্থতায় শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়া সরকারের সাথে একটা চুড়ান্ত ফায়সলা করে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছা। এই চক্রান্তের খবর পেয়েই জনাব তাজুদ্দিন ভারত সরকারের নির্দেশেই ঐ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। আরো তথ্য জানা যায়- খন্দোকার মোশতাক আহ্মদ, ইয়াহিয়া সরকার এবং মার্কিন সরকারের ত্রি-পাক্ষিক ঐ সমঝোতা-আলোচনার প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের সমর্থন ছিল।

ভারতীয় নীলনকশা এবং মুজিবনগর সরকার

চরম দূর্নীতি

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের একটি বড় অংশ এবং তাদের তল্পিবাহকরা মুক্তিযুদ্ধের সুযোগে চরম দূর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

শুধুমাত্র বগুড়ার ষ্টেট ব্যাংক থেকে লুট করা হয়েছিল ৫৬ কোটি টাকার উপর। এ সমস্ত লুটপাটের সাথে জড়িত ছিলেন রাজনৈতিক নেতারা এবং আমলাদের একটা অংশ। কোটি কোটি টাকা নিয়ে বিদেশের মাটিতে বসে ছিনিমিনি খেলার ন্যাক্কারজনক ইতিহাসের কোন জবাব আওয়ামী লীগ সরকার প্রবাসে কিংবা স্বাধীনতার পর জনগণের কাছে দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি। মনগড়া হিসাবের ফিরিস্তি দিয়ে লুটপাটের কলঙ্ক মোছা যায় না। সংগ্রামকালের লুটপাটের সম্পদে রাতারাতি রাজনৈতিক নেতারা, তাদের পরিবার-পরিজনরা এবং চিহ্নিত কিছু আমলা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিলেন। বাড়ি, গাড়ী, সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিলেন ঐ সমস্ত অসৎ ব্যক্তিরা। সেই সমস্ত রহস্য সময়ের সাথে ক্রমান্বয়ে জনগণের সম্মুখে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। সংগ্রামকালের এক পর্যায়ে ক্ষুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বপ্রথম এ সমস্ত অসৎ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার। এ ব্যাপারে কর্নেল ওসমানীর সাথে কথাও হয়েছিল। তাকে বোঝানো হয়েছিল এ সমস্ত অসৎ নেতৃত্বের অধিনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হওয়ায় বিশ্ব পরিসরে সংগ্রামের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। শুধু তাই নয় তাদের পার্থিব লোভ-লালসা এবং চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনে সম্পূর্ণ জাতিকেই ব্ল্যাকমেইল করা সম্ভব হবে অতি সহজেই। সব শুনে তিনি বলেছিলেন, "অভিযোগ যুক্তি সম্পন্ন কিন্তু তবুও বিদেশের মাটিতে নিজেদের মাঝে কাটাকাটি শুরু করলে মূল উদ্দ্যেশ্য থেকে আমরা দূরে সরে যাব। অবশ্যই এ সমস্ত অসৎ ব্যক্তিদের শাস্তি পেতে হবে, কিন্তু সেটা দেয়া হবে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশ্যে গণআদালতে।" তার কথা মেনে নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে গণআদালত তো দূরের কথা কোন কোর্ট-আদালতেও ঐ সমস্ত অপরাধিদের বিচার হয়নি। কারণ এ সমস্ত অসৎ কার্যক্রমের সাথে প্রশাসনের প্রায় সব রুই-কাতলাই জড়িত ছিলেন। রক্ষক যখন ভক্ষক হয়ে উঠে তখন অবস্থা বেসামাল হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অবস্থাও হয়েছিল ঠিক তাই। লুটপাট, চুরি-চামারির বিচারের পরিবর্তে এ সমস্ত জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের মাত্রা গিয়েছিল অনেক বেড়ে। কর্নেল ওসমানীর কথা শুধু কথা হয়েই থেকে যায়। স্বাধীনতার লগ্ন থেকেই কোন ব্যাপারেই ন্যায়সঙ্গত কোন বিচার পায়নি জাতি স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠির কাছ থেকে, শুধু পেয়েছে অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, প্রতারণা ও বঞ্চনা।

লুটপাট সমিতির কার্যকলাপে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের তথা সমস্ত বাঙ্গালী জাতির ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছিল তার কয়েকটি বিবরণ নিচে দেয়া হল:-

লুটপাট সমিতির সদস্যরা তখন কোলকাতার অভিজাত পাড়াগুলোতে এবং বিশেষ করে পার্ক ষ্ট্রিটের হোটেল, বার এবং রেস্তোরাগুলোতে তাদের বেহিসাবী খরচার জন্য 'জয় বাংলার শেঠ' বলে পরিচিত। যেখানেই তারা যান মুক্তহস্তে বেশুমার খরচ করেন। থাকেন বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিংবা

হোটেলে। সন্ধ্যার পর হোটেল গ্র্যান্ড, প্রিন্সেস, ম্যাগস, ট্রিংকাস, ব্লু ফক্স, মলিন রুজ, হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি বার রেষ্টুরেন্টগুলো জয়বাংলার শেঠদের ভীড়ে জমে উঠে। দামি পানীয় ও খাবারের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আমেজে রঙ্গীন হয়ে উঠে তাদের আয়েশী জীবন। বয়-বাবুর্চিরাও তাদের আগমনে ভীষণ খুশি হন। এমনই একজন নেতা তার দলবল নিয়ে প্রত্যেক দিন হোটেল গ্র্যান্ডের বারে মদ্যপান করতেন। তিনি বগুড়া ব্যাংক লুটের টাকার একটা বিরাট অংশ কব্জা করেছেন কোনভাবে। তার কাছে রয়েছে প্রায় চার কোটি টাকা। একদিন মধ্যরাতে তিনি হোটেল বারে গিয়ে মদ পরিবেশন করার জন্য বারম্যানদের হুকুম দেন। বারম্যানরা কাচুমাচু হয়ে তাকে জবাব দেয় সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জবাব শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন বাঙ্গালী শেঠ। টলমল অবস্থায় চিৎকার করে বলতে থাকেন, তিনি হোটেলটাই পুরো কিনে নিতে চান। বেসামাল কিন্তু শাসালো খদ্দের, তাই বারম্যানরা চুপ করে সবকিছু হজম করে যাচ্ছিল। শেঠ আবোল-তাবোল বকে পরে একজন বারম্যানকে হুকুম দেন, কাল বার খোলার সময় থেকে বন্ধ করার আগ পর্যন্ত তিনি ও তার সঙ্গীগণ ছাড়া অন্য কাউকে মদ পরিবেশন করা যাবে না। তারাই শুধু থাকবেন বারে। তার হুকুম শুনে বারম্যান ম্যানেজারকে ডেকে পাঠায়। ম্যানেজার এলে শেঠ তাকে প্রশ্ন করেন,
-রোজ আপনাদের বারের সেল কত টাকা?
ম্যানেজার একটা অংক তাকে জানায়। শেঠ তখন তাকে তার সিদ্ধান্তেরর কথা জানিয়ে বলেন পুরোদিনের সেলের টাকাই তিনি পরিশোধ করবেন। পুরো টাকার মদ ওরা খেয়ে শেষ করতে না পারলে বাকি মদ যেন তার বাথরুমের টাবে ভরে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি তাতে গোসল করবেন। ম্যানেজার তার কথা শুনে 'থ হয়ে গিয়ে মাতালের প্রলাপ মনে করে কোন রকমে সেখান থেকে কেটে পড়েন।

আর একদিন আর একজন জয়বাংলার শেঠ তার পুত্রের প্রথমবারের মত জুতো পরার দিনটি উৎযাপন করার জন্য ব্লু ফক্স রেষ্টুরেন্টে প্রায় ১০০ জনের একটি শানদার পার্টি দেন। এছাড়া অনেক শেঠরা দিল্লী এবং বোম্বেতে গিয়ে বাড়িঘর কিনতে থাকেন। অনেকে আবার ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিতেও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাদের এ সমস্ত কির্তিকলাপের ওপর শহীদ জহির রায়হান একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার এ অভিপ্রায়ে অনেকেই ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন তার উপর। অনেকে তার এ ঔদ্ধত্বে ক্ষেপেও গিয়েছিলেন। তার রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে। কোন এক নায়িকার জন্মদিনে তখনকার দিনে তার এক গুণমুগ্ধ ভক্ত তাকে ৯ লক্ষ টাকা দামের হীরের নেকলেস্ উপহার দিয়েছিলেন।

দরগা রোডের বিশু বাবুর বাড়িতে থাকতেন মন্ত্রী পরিষদের পরিবারবর্গ। প্রবাসী সরকারের টাকার প্রায় সবটাই কালো কালো ট্রাঙ্কে ভরে রাখা হয়েছিল বিশু বাবুর বাড়িতে এবং ৩নং সোহরাওর্য়াদী এ্যাভেনিউ এর তিন তলার ছাদের দু'টো কামরায়। সেখানে থাকতেন অর্থসচিব জনাব সামসুজ্জামান এবং তার পরিবার ও রাফি আক্তার ডলি। এ টাকার কোন হিসাব ছিল না। কোলকাতার বড় বাজারের মারোয়াড়ীদের সাহায্যে এগুলোর এক্সচেঞ্জ করা হত। এ কাজের দালালী করেও অনেকে কোটিপতি হয়ে উঠেন রাতারাতি। মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগ নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হলেও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা লোভ সংবরণ করতে না পেরে অসৎ হয়ে উঠেন।

কোন এক সেক্টর কমান্ডার এক পাকিস্তানী সিএসপি অফিসারের অন্তসত্ত্বা স্ত্রীকে বেয়োনেটের আঘাতে মেরে তার গা থেকে সোনার অলংকার খুলে নিয়েছিলেন; এমন ঘটনাও ঘটেছে। এ ধরণের কিছু ব্যক্তি নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করেছেন আজ অব্দি। কিন্তু তারা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের কলংক। তাদের অপকর্মের জন্য সাধারণভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কলংকের ভাগী হতে হয়েছে।

যুব শিবির, শরনার্থী শিবিরগুলোতে বরাদ্দকৃত রিলিফ সামগ্রী নিয়েও কেলেংকারী হয়েছে অনেক। ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল প্রায় ১ কোটি শরনার্থী। তাদের জন্য সারাবিশ্ব থেকে রিলিফ সামগ্রী, যানবাহন ভারতীয় সরকারের প্রযত্নে প্রচুর এসেছিল। কিন্তু তার কতটুকুইবা দেয়া হয়েছিল শরনার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে! এ সমস্ত রিলিফ সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব ছিল যৌথভাবে ভারত ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের। বগুড়ার ষ্টেট ব্যাংক ছাড়াও মোটা অংকের টাকা নিয়ে আসা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পাবনার ট্রেজারি থেকে। সে টাকারও কোন সুষ্ঠ হিসাব পাওয়া যায়নি।

কোলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রাণকেন্দ্রগুলো

মুক্তিযুদ্ধ কিংবা বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন খবর কিংবা তথ্য জানার জন্য ঐ সমস্ত প্রাণ কেন্দ্রগুলোই ছিল মূল উৎস।

ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ জনাব আর আই চৌধুরির সরকারি বাসভবন হলেও তখন ঐ বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন প্রায় সমাজের ভিআইপি এবং ভিভিআইপি-দের প্রায় ১৭টি পরিবার। তাই সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ সেই সময় হয়ে উঠেছিল দেশের এলিট শ্রেণীর আশ্রয়স্থল। এদের মধ্যে ছিলেন রাজনৈতিক নেতা, নামিদামী শীর্ষস্থানীয় আমলা, ব্যবসায়ী, পুলিশ, আর্মি এবং প্রচার মাধ্যমের লোকজন। উল্লেখযোগ্য হলেন বেগম সাজেদা চৌধুরি এবং তার স্বামী জনাব গোলাম আকবর চৌধুরি এবং পরিবার, জনাব মুস্তাকিম চৌধুরি এবং তার স্ত্রী এ্যানাখালা এবং পরিবার, রাফি আকতার ডলি, জনাব আসাদুজ্জামান এবং পরিবার, জনাব আলি আকবর খান, জনাব কামাল সিদ্দীকি, জনাব খসরুজ্জামান এবং তার স্ত্রী লুসি খালা, জনাব মামুনুর রশিদ এবং তার স্ত্রী রাকা, জনাব আব্দুল খালেক এবং তার পরিবার, জনাব ওয়ালীউর রহমান এবং ব্রজেন দাস। এদের অবস্থানের ফলেই এই বাড়িটি হয়ে উঠেছিল খবরা-খবরের বিশেষ প্রধান কেন্দ্র। অন্যান্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ছিল থিয়েটার রোড ছাড়াও ১৯নং সার্কাস এ্যাভেনিউ এর বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দূতাবাস, প্রিন্সেপ ষ্ট্রিটের বামপন্থীদের আড্ডা, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, সিইইনসির হেডকোয়াটার্স, বাংলাদেশ থেকে আগত তরুণদের আড্ডা শিয়ালদাহ এবং বাংলাদেশ বেতার।

এ সমস্ত জায়গাগুলো রাতদিন চব্বিশ ঘন্টাই লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকতো এবং সব ধরনের খবরা-খবর এবং গুজব নিয়ে সবাই মেতে থাকতো। বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামকালে কোথায় কি ঘটেছে, গুজব কি রটেছে তার সবকিছুই জানা সম্ভব হতো ঐ সমস্ত জায়গাগুলো থেকে।

অন্যরা কি করছিল?

অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের কর্মকান্ড ছিল খুবই সীমিত। অস্থায়ী সরকার এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তারা ছিল অবাঞ্ছিত।

মাওলানা ভাসানী বাংলাদেশ থেকে আসামে পালিয়ে আসার পর থেকেই ভারতীয় সরকারের প্রটেকটিভ কাষ্টডিতে আটক হয়ে থাকেন। মজলুম নেতাকে নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিল ভারত সরকার। প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে তিনি যাতে কোন প্রকার নেতৃত্ব দিতে না পারেন তার জন্য অতি সতর্কতার সাথে এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারত সরকার এবং আওয়ামী লীগ কখনো মাওলানাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। তার সাথে তার দলীয় নেতা ও কর্মীদেরকেও কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করতে দেয়া হয়নি পুরো নয়টি মাস। ভাসানী, ন্যাপের কর্মী ও যুবনেতারা অল্পদিনেই বুঝতে পেরেছিলেন আওয়ামী লীগ প্রবাসী সরকার এবং ভারতীয় সরকারের কাছে তারা খুব একটা গ্রহণযোগ্য নন। মাওলানা ভাসানী এবং প্রগতিশীল যুব নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ নেতাদের দলীয় সরকারের পরিবর্তে সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের আবেদন জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাদের সে আবেদনে আওয়ামী লীগ কিংবা ভারতীয় সরকার কেউই সাড়া দেয়নি বরং আওয়ামী লীগ প্রবাসী সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রয়োজনমত মাওলানাকে ব্যবহার করার চেষ্টাই করেছে। কিন্তু মাওলানা ভাসানী সে ফাদে পা দেননি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জনাব মশিউর রহমান যাদুমিয়া একবার কোলকাতায় এসেছিলেন। কোলকাতায় তিনি তার দলীয় প্রধান মাওলানা ভাসানীর সাথে সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হন। তবে তিনি তার দলীয় যুব ও ছাত্রনেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে মত বিনিময়কালে তিনি বুঝতে পারেন ভারতের মাটিতে বসে তিনি কিংবা তার দলীয় কর্মীরা স্বাধীনতার যুদ্ধে তেমন বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারবেন না। তারা ভারত সরকারের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্যও পাবেন না, তাই তিনি দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে গেরিলাযুদ্ধ সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেরূপ নির্দেশ কর্মীদের দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যান। কোলকাতায় অবস্থানকালে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ সর্বক্ষণ তাকে নজরে রাখে। আওয়ামী সরকারও তার আগমনকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। তার চলে যাবার পর মেনন, জাফর, রনোরা সম্মিলিতভাবে স্বীয় উদ্যোগে তাদের কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। বামপন্থী দলগুলোর বেশিরভাগ নেতারা বিশেষ করে চীনপন্থী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হন। তারা এ সংগ্রামকে ‘কুকুরে কুকুরে লড়াই’ বলে ভুলভাবে আক্ষায়িত করে জাতীয় সংগ্রামকে উপেক্ষা করে শ্রেণী সংগ্রামের লাইন চলিয়ে যাবার প্রচেষ্টা করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক নেতা তাদের ভুল বুঝতে পেরে পরবর্তিকালে স্বাধীনতার জন্য পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের ভেতরে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যার ভুল মূল্যায়নের জন্য প্রগতিশীল এবং বামপন্থীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হন। তাদের এই দুর্বলতা এবং ভূল পরবর্তিকালে অনেকেই স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আজো অনেক পিছিয়ে আছে। তার জন্য আমাদের প্রগতিশীল ও বামপন্থী রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা অনেকাংশে দায়ী। ভারতের মস্কোপন্থীরা যেভাবে ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করে আসছিল ঠিক সেভাবেই বাংলাদেশের তথাকথিত মস্কোপন্থীরা সংগ্রামের সময় পুরোপুরিভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের লেজুড়বৃত্তি করেছিল। প্রভুদের ইঙ্গিতে তাদের নিয়ে বিশ্ববাসীকে দেখাবার জন্য তথাকথিত পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ৮ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করেছিল প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার।

অস্থায়ী সরকার জোনাল এডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়

এমএনএ, এমপিএ এবং আমলারা সুরক্ষিত স্বর্গ কোলকাতা ছাড়তে নারাজ হলেন। তাই পরিকল্পনাও গেল ভেস্তে।

প্রবাসী সরকার মুক্তিযুদ্ধের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের জন্য মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু মিটিং এবং আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এবং মুজিবনগরে অবস্থিত আমলাদের নিতে হবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা মুক্ত এলাকায় এমএনএ, এমপিএ এবং কোলকাতাবাসী আমলাদের অধিকাংশই যেতে রাজি হননি। ফলে তাদের সব দায়িত্বই বহন করতে হয়েছিল সেক্টর এবং সাব-সেক্টর কমান্ডারদের। মাঝেমধ্যে কোলকাতার মুজিবনগর থেকে নামি-দামী নেতারা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে আসতেন মুক্তিযোদ্ধাদের মটিভেশন লেকচার দেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ ধরণের মিশনে এসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ভীষণ বেকায়দায় পড়তে হত। মুক্তিযোদ্ধাদের ফেস করতে পারতেন না তারা। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বলতেন, "গালভরা কথার ফুলঝুড়ি শোনানোর দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা যুদ্ধ করছি জানবাজী রেখে। আমাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদপত্রের কি ব্যবস্থা করে এসেছেন সেটাই আমরা জানতে চাই। আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। সমস্যার সমাধান যদি করতে না পারেন তবে অন্ততঃপক্ষে আমাদের সাথে থেকে সে সমস্ত সমস্যার ভাগীদার তো হতে পারেন। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে শুধু ছবি তোলার জন্য আর বক্তৃতা দেয়ার জন্য এসে আমাদের সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারাও এ বৃথা কষ্ট না করে মুজিবনগরে বসে থাকুন। দেশ স্বাধীন হলে দেখা হবে।"
মুক্তিযোদ্ধাদের এ ধরণের বক্তব্য শুনে মুজিবনগরের আওয়ামী সরকার এবং ভারত সরকার একইভাবে শংকিত হয়ে উঠে। মুক্তিযোদ্ধা ও কমান্ডারদের আনুগত্য সর্ম্পকে সন্দিহান হয়ে উঠে তারা।

ভবিতব্য সত্যি হলো

বিবিসির একটি সাংবাদিকের দল মাসিমপুর সামরিক হাসপাতালে আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

জুলাই মাসের শেষার্ধে লাঠিটিলার যুদ্ধে আমি দ্বিতীয়বারের মত আহত হই মর্টারের গোলা ও মেশিনগানের গুলিতে। চিকিৎসার জন্য আমাকে শীলচরের মাসিমপুর সিএমএইচ এ নিয়ে যাওয়া হয়। আহত অবস্থাতেও আমাকে হাসপাতাল কক্ষ থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। আমার ঘরটাতেই স্থাপন করি ছোট খাট একটি **op's room** । এ ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন ব্রিগেডিয়ার ভট্‌কে, কর্নেল বাগচী, মেজর দাসগুপ্ত ও ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী। আমি যখন আহত অবস্থায় হাসপাতালে তখন বিবিসি লন্ডন থেকে সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধি দল এলেন আমাদের সিলেট সেক্টরে। তারা আমার সাথে আলাপ করতে চান। আমার আপত্তি নেই জেনে তারা এলেন আমার হাসপাতালের রুমে। ঘরে আমি তখন শয্যাশায়ী। পরিচয়পর্ব শেষে তাদের একজন চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে বললেন,

— এতো দেখছি একটা ছোটখাটো **op's room.** অসুস্থ অবস্থায় এ সমস্ত ম্যাপ, ওয়্যারলেস সেট প্রভৃতি নিয়ে আপনি কি করেন?

— আমি আহত হয়ে কিছুদিনের জন্য এখানে শয্যাশায়ী হয়ে আছি বলে যুদ্ধতো বন্ধ হয়ে যায়নি। যুদ্ধ চলছে এবং চলবে। সেক্ষেত্রে সাধ্যমত যতটুকু সম্ভব দায়িত্ব বিছানায় শুয়েও আমি পালন করে যাবার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন করলেন আর একজন,

— শুনেছি আপনি আরো দু'জন অফিসারের সাথে পাকিস্তান থেকে সর্বপ্রথম পালিয়ে এসে যুদ্ধে যোগদান করেছেন। আপনার আপন-পরিজনদের সবাইতো বাংলাদেশে রয়েছেন। তাদের উপর পাক বাহিনীর তরফ থেকে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা হতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

— আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রাম। এ সংগ্রামে অবদান রাখার পবিত্র দায়িত্ব পালন করার জন্যই আমরা পালিয়ে এসেছি। আজ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকেই সদস্যরা এসে যোগদান করেছেন মুক্তিযুদ্ধে। দেশকে শত্রুর কবল থেকে স্বাধীন করার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন তারা। তাদের এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরিবার-পরিজনদের ভাগ্যে যা ঘটবে আমার আত্মীয়-স্বজনদের ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটবে। অতএব, এ নিয়ে আমার চিন্তা করার কিছু নেই। আপনজনদের শত্রুর পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে দেশকে স্বাধীন করতে হবে তাইতো আমরা মরণপন যুদ্ধ করে যাচ্ছি দেশকে শত্রুমুক্ত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আজাদী লাভ করার লক্ষ্যে। স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ নেই। দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বোই ইনশাল্লাহ্।

আমার জবাব শুনে তাদের একজন মন্তব্য করেছিলেন,

— আপনাদের মত সন্তান যে দেশ জন্ম দিয়েছে তার স্বাধীনতা পৃথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারবে না।

ভদ্রলোকের কথাগুলো আজও মনে আশার আলো যোগায়, ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠি। ১২ কোটি জাগ্রত বাংলাদেশী দাসত্বের সব শৃঙ্খল ভেঙ্গে চুর্নবিচুর্ন করে দেবে নিশ্চয়ই। স্বাধীন মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে সব চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে মাথা উঁচু করে দাড়াবেই একদিন। আমার সাথে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারটি পরে বিবিসি থেকে প্রচারিত হয়েছিল। এ প্রচারণা থেকেই আমার আত্মীয়-স্বজনরা সর্বপ্রথম জানতে পারেন, আমি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।

অবিস্মরণীয় বিবাহ

বিবাহ পূর্ব নির্ধারিত বিষয় হলেও আমাদের বিয়েটা ছিল অস্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিক।

বেশ কিছুদিন যাবত কোলকাতার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। আমার আহত হওয়ার খবরটা নিম্মীকে জানাইনি ইচ্ছে করেই। বেচারী অযথা চিন্তিত হয়ে পড়বে খবরটা শুনে। কিন্তু আমি না জানালেও থিয়েটার রোড থেকে খবরটা অতি সহজেই ওর কানে পৌঁছাতে পারে। শুয়ে শুয়ে এ সমস্তই ভাবছিলাম। কিছুক্ষণ আগে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বাবু ও আতিক এসেছিল। ওদের সাথে অপারেশনাল এবং অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ কিছু বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর তারা ইনসট্রাকশনস্ নিয়ে ফিরে গেছে। একান্ত অবসর খুব কমই পাওয়া যায়। কেউ না কেউ আসছেই। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সমস্যা। বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই আমার সময় কেটে যায়। ডাক্তার-নার্সরা অনেক সময় লোকজনদের আসা-যাওয়ার ভীড় দেখে আমাকে এসে উপদেশ দেন বিশ্রাম নেবার জন্য। হাসিমুখে তাদের আন্তরিকতার প্রতিদান দেয়া ছাড়া আমার পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব হয় না। মিসেস ভট্‌কে প্রতিদিন খাবার পাঠাচ্ছেন হাসপাতালে। তার স্নেহের ঋনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে সারাজীবন। হঠাৎ একাকীত্ব যেন আমায় পেয়ে বসল। মনটাও কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। নিম্মীকেই বিশেষ করে মনে পড়ছিল। স্মৃতিমধুর অতীত মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল। কিছুক্ষণের জন্য তলিয়ে গিয়েছিলাম অতীত স্মৃতিমন্থনে। হঠাৎ দেখলাম দরজায় তিনজন এসে দাড়িয়েছে। মাহবুব ও ফারুক দু'জনেই আমার প্রিয় গেরিলা কমান্ডার। কিন্তু তাদের সাথে তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখে চমকে উঠলাম! নিজের চোখকেই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না! কাছে আসতেই পরিষ্কার হয়ে গেল সব। বাপ্পিই বটে!

— একি! তুই এখানে? আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম।

— থাক থাক উঠতে হবে না।

বলে বাপ্পি এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। উষ্ণ আবেগে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম দু'জনেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরে। ইতিমধ্যে মাহবুব বাপ্পিকে শয্যার পাশে একটা চেয়ার টেনে দিয়ে বসতে বলল।

— কিরে বাপ্পি! তুই এখানে এলি কি করে? পথ চিনলি কি করে? জানলিই বা কি করে আমি এখানে আছি?

— আগে বল আহত হবার কথা তুই আমাদের কেন জানাসনি? পাল্টা প্রশ্ন বাপ্পির।

— কেন জানাইনি সেটা সত্যিই কি বুঝতে পারছিস না?

— আমরা উদ্বিগ্ন হতাম ঠিকই বিশেষ করে নিম্মী। কিন্তু তবুও খবরটা তোর জানানো উচিত ছিল। তার যুক্তি মেনে নিলাম। ঝগড়া করে লাভ নেই, আমার ভুল হয়েছে মেনে নিলাম।

— কিন্তু তুই হঠাৎ করে এখানে কেন?

— তোর আহত হবার খবর নূর ভাই এবং সালাহ্উদ্দিন ভাই নিজেরা বাসায় এসে আমাদের জানান। খবরটা জানিয়ে ওরা অবশ্য নিম্মীকে বোঝাতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি যে তুই ভালোই আছিস। ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু তাদের সে সান্ত্বনা বাণী নিম্মী পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিল না কোন মতেই। তার একই সন্দেহ ওঁরা তার কাছে আসল অবস্থা লুকোচ্ছেন। নিম্মীর সে কি কান্না! সাথে সাথে খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিল। ওর অবস্থা দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। ওকে বললাম, 'ঠিক আছে আমি নিজেই যাচ্ছি শীলচরে ডালিমের অবস্থা দেখে আসতে।' কিন্তু বাধ সাধলেন বাবা-মা। তারা বললেন, 'ক্যানাডা যাবার সবকিছুই ঠিক হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শীলচর যাবার প্রশ্নই উঠে না।'

— ওহ! তুই আর নিম্মী ক্যানাডা যাচ্ছিস বুঝি? কিছুটা অবাক হলাম আমি।

— হ্যাঁ। আমাদের দু'জনের মতের বিরুদ্ধেই বাবা আমাদের গামু কাক্কুর কাছে পাঠাবার সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। মা দিব্যি দিয়েছেন আমরা না গেলে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

এ অবস্থায় আমাদের কি আর করার আছে বল? কিন্তু নিম্মী কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছে না। এর জন্য ওর উপর বাবা-মা ভীষণ খ্যাপা। মারধরও তাকে খেতে হচ্ছে বেধুম। ওর এক কথা, তোকে এ অবস্থায় রেখে সে কোলকাতার বাইরে এক পাও নড়বে না। প্রয়োজনে সেও আত্মহত্যাই করবে তবুও ক্যানাডা যাবে না কিছুতেই। এ বিষয় নিয়ে বাড়িতে এখন অশান্তির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সবদিক সামলাতে পারছি না কিছুতেই। বিশেষ করে নিম্মীর যে অবস্থা, কোন একটা অঘটন ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। অবস্থা দেখে আমিও বাবাকে মুখের উপর বলে ফেললাম, 'ডালিমকে না দেখে ক্যানাডায় আমিও যাব না।' আমার দৃঢ়তায় অবশেষে বাবা-মা রাজি হলেন আমাকে আসতে দিতে। আমার আসার অনুমতি পাওয়াতে নিম্মী বেচারীও কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। ওকে কথা দিয়ে এসেছি তোর যথাযথ ব্যবস্থা করেই আমি ফিরব। প্রয়োজন হলে কোলকাতায়ও নিয়ে যাব তোকে। তারপর ট্রেনে করে শীলচর। শীলচর ষ্টেশনে নেমে মুক্তিযোদ্ধাদের সদর দফতর খুজে পেতে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি আমার। ওখান থেকে মাহবুব ও ফারুককে সঙ্গে দিয়ে দেয়া হল। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল এখানে। মজার কথা কি জানিস! শীলচর পৌঁছে সবচেয়ে অবাক হয়ে গেয়েছিলাম এটা দেখে যে বাপ্পি নামটার মাধ্যমে আমি এখানে বহুলভাবে পরিচিত।

— হ্যাঁ। মাহবুব, ফারুক দু'জনেই আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন। ওরা ছাড়াও আরও অনেকেই তোদের ব্যাপারে সবকিছুই জানে। কথার ফাঁকে নার্স চা-নাস্তা রেখে গিয়েছিল।

বাপ্পিকে বললাম,

— আমার বা দিকের এত বড় ব্যান্ডেজ দেখে ঘাবড়াসনে। ব্যান্ডেজের তুলনায় ক্ষত অনেক ছোট। কাধে মাত্র তিনটি এলএমজি বুলেট আর তালুতে মর্টার শেলের সিপ্রন্টার লেগেছে এই যা। ডাক্তাররা বলেছেন, নন ষ্টপ ব্লিডিং এর মধ্যেও ৯০ মাইল গাড়িতে করে হাসপাতালে জীবিত অবস্থায় যখন পৌঁছতে পেরিছি তখন এ যাত্রায় মরার ফাঁরা কেটে গেছে। এখনতো বহাল তবিয়তেই রয়েছি। দেখতে পাচ্ছিস না কেমন **op's room** সাজিয়ে বসেছি? কোন অসুবিধে নেই।

বাপ্পির ছলছল চোখ দেখে অনেকটা বাধ্য হয়েই ওকে আশ্বস্ত করার জন্য কথাগুলো বলতে হল আমার। আমার কথায় বাপ্পির উদ্বিগ্নতা কতটুকু এল ঠিক বুঝতে পারলাম না। অল্পক্ষণ সে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল,

— এখানে হাসপাতালে তোর পড়ে থাকা চলবে না। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তোকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

— ঠিক বলেছেন বাপ্পি ভাই। ডাক্তাররাও তাই বলছেন। কোলকাতায় গিয়ে স্পেশালিষ্ট এর আন্ডারে চিকিৎসা করানো উচিত বলে তারাও মনে করছেন। কিন্তু হক ভাই কিছুতেই সেক্টর ছেড়ে যেতে রাজি নন। তিনি চলে গেলে আমাদের এখানে অনেক অসুবিধা হবে এটা ঠিক। কিন্তু কোলকাতায় গিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করিয়ে সম্পুর্ন সুস্থ হয়ে তিনি আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন সেটাই আমরা সবাই চাই। তিনি সম্পুর্ন সুস্থ হয়ে ফিরে এলে তার সাময়িক অনুপস্থিতির ঘাটতি অনায়াসে পুষিয়ে নিতে পারব সুদে-আসলে। মাহবুব বাপ্পির কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল।

— হক ভাইকে যে করেই হোক আপনাকে কোলকাতায় নিয়ে যেতেই হবে। এখানে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তার অবস্থার চরম অবনতিও ঘটতে পারে। এর জন্য কিছু সময়ের জন্য তাকে কোলকাতায় অবশ্যই যেতে হবে। ফারুকও তার যুক্তিকে সমর্থন জানিয়ে বলল।

বাপ্পির জেদ ও সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের যুক্তির কাছে আমার কোন কথাই টিকল না। সবার কাছে বিদায় নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই বাপ্পি আমাকে নিয়ে কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হল। বাই রোড আমরা গৌহাটি এলাম। সঙ্গে এল আমার প্রিয় গেরিলা কমান্ডাররা। গৌহাটি থেকে প্লেনে কোলকাতায়। সবাইকে ছেড়ে আসতে ভীষণ খারাপ লাগছিল। ওরা সবাই অশ্রুসিক্ত আবেগে

বিদায় দিয়েছিল আমাদের। কথা দিয়েছিলাম, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা সেরে ফিরে আসব।"

কোলকাতায় ফিরে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন তখন হেডকোয়াটার্সে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছে। ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম শিশু স্বাস্থ্যগত কারণে সেক্টর থেকে হেডকোয়াটার্সে ষ্টাফ অফিসার হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি নাকি সেক্টরে অসম্ভবভাবে স্নায়ু দুর্বলতা এবং মানসিক রোগে ভুগছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতা কিছুতেই নাকি তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। মেজর মঈনুল ইসলামকে যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতা ও ভুল নেতৃত্বের জন্য কমান্ড থেকে অব্যাহতি দিয়ে হেডকোয়াটার্সে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তিনি কিছুদিন যাবত হেডকোয়াটার্সেই অবস্থান করছেন।

যুদ্ধকালীন সময়ে কোলকাতায় বেশকিছু পরিবারের সাথে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে মিত্রী মাসী, ডঃ গনী এবং তার পরিবার, অরূপ দা ও পারুমিতা বৌদি, জনাব আইয়ূব ও তার স্ত্রী গৌরিদী, প্রিতিশ নন্দী ও তার স্ত্রী রীনা, ইন্দু প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অসীম ভালোবাসা ও সহানুভূতি পেয়েছিলাম। তারা সবাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিভিন্নভাবে প্রচুর অবদান রেখেছিলেন। যুদ্ধের বিবরণ ও অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে শুনতে তারা সর্বদাই বিশেষভাবে উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনা তাদের সবার মধ্যেই ধরা পড়ত প্রকটভাবে। কিন্তু যখনই তাদের বলেছি, "স্বায়ত্ব শাসনের দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে স্বাধীনতার জন্য আমরাতো সংগ্রাম করে যাচ্ছি, কিন্তু পশ্চিম বাংলার আপনারা নিশ্চুপ হয়ে কেন্দ্রিয় শোষণ এবং জাতীয় নির্যাতন সহ্য করছেন কেন? পুরো বাঙ্গালী জাতির মুক্তির জন্য আপনাদের কি কিছুই করার নেই?" এ ধরণের আলোচনায় সর্বদাই তারা পাশ কাটিয়ে যেতেন অথবা থাকতেন চুপ করে। কখনও যুক্তি দেবার চেষ্টা করতেন বাংলাদেশের সাথে তাদের অবস্থাকে তুলনা করা ঠিক নয়। বেশ অস্বস্থিকর অবস্থায় পড়ে যেতেন তারা এ ধরণের বিতর্কে। তাই আমরাও এ সমস্ত ব্যাপারে তেমন বিশেষ উচ্চবাচ্য করতাম না। সময় সময় আমরা এ ধরণের কথাও তাদের বলেছি, "বাংলাদেশের সংগ্রামের ছত্রছায়ায় কংগ্রেস সরকার সিআরপি এবং বিএসএফ বাহিনীর মাধ্যমে অসংখ্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, যুবক মেরে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার অঞ্চলে।" এ ধরণের বক্তব্যকে অস্বীকার করতে পারতেন না তারা। কিন্তু সব সত্যকেই কেমন জানি নেতিবাচকভাবে মেনে নিয়ে চুপ করে থাকতেন। তাদের এই চুপ করে থাকার রহস্য আজও মাঝেমধ্যে আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

থিয়েটার রোডেই আমার থাকার ব্যবস্থা হল। তখনকার দিনে প্রখ্যাত বোন স্পেশালিষ্ট ডঃ মুরালী মুখার্জীর সাথে আমার চিকিৎসার ব্যাপারে পারুমিতা বৌদি ইতিমধ্যেই আলাপ করেছেন। আমার ক্ষত পরীক্ষা করে তিনি বললেন, "গান পাউডার এবং বুলেট ইনজ্যুরির ফলে খারাপ ধরণের ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। ইনফেকশনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে গ্যাংরিনে টার্ন নিতে পারে। প্রথমে চেষ্টা করতে হবে ইনফেকশন বন্ধ করার।" ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু কিছুই করার নেই। বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হবে। তিনি ঔষধ, ইনজেকশন লিখে দিলেন এক সপ্তাহের জন্য। বৌদি আমাকে মনোবল জোগানোর জন্য বললেন, "কোন চিন্তা করবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।" বেশিরভাগ সময় আমাকে শুয়েই থাকতে হয়। বাপ্পির সাথে নিম্মী এসে আমাকে দেখে গেছে। রোজ তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। সুযোগমত ও টেলিফোন করে আমাকে। বাপ্পির মাধ্যমে ভালোমন্দ খাবার পাঠায় প্রায়ই।
একদিন বাপ্পি এল। ভীষণ গম্ভীর ভাব। বুঝলাম বাসায় কিছু একটা ঘটেছে। ঠিক তাই। ক্যানাডা যাওয়া নিয়ে ঝড় বয়ে গেছে বাসায়। কথা কাটাকাটি তারপর বেধম প্রহার। বাপ্পি বলল, "বাসার অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠেছে। এর একটা আশু সমাধান প্রয়োজন। তা না হলে যে কোন অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে নিম্মী। তার মত কোমল প্রকৃতির মেয়েও ভীষণ কঠিন হয়ে পড়েছে। ওকে কিছুতেই ক্যানাডায় পাঠাতে পারবে না বাবা-মা। মানসিক চাপে ক্রমান্বয়ে তার

শারীরিক অবনতিও ঘটছে। রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়ছে সে। এ অবস্থায় সব চাপ সহ্য করা কতদিন সম্ভব হবে তার পক্ষে?" সব শুনে ভীষণ চিন্তায় পড়লাম। কি করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব? কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। নূর এবং সালাহ্উদ্দিনের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম ওদের সাথে। তারা বলল, "সব দিক রক্ষা করার জন্য আমাদের বিয়ে হয়ে যাওয়া দরকার। একমাত্র বিয়ে হলেই নিম্মীর ক্যানাডা যাওয়া বন্ধ হতে পারে। একমাত্র তখনই ওর পক্ষে আমাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দেয়া সম্ভব।" কিন্তু এ অবস্থায় বিয়ের জন্য তার বাবা-মা রাজি হবেন কি? নূর ও সালাহ্উদ্দিন একদিন আমার তরফ থেকে প্রস্তাব নিয়ে গেল নিম্মীদের বাসায়। প্রস্তাবে ওর বাবা-মা রাজি হলেন না। ওদের যুক্তি যেখানে সবকিছুই আজ অনিশ্চিত সেখানে কি করে তারা মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে রাজি হন? হতাশ হয়ে ফিরে এল নূর এবং সালাহ্উদ্দিন। ওদের কোন যুক্তিই তাঁরা গ্রহণ করলেন না। অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে থাকে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পর। নিম্মী আমাকে পরিস্কার লিখে জানাল, "যেভাবেই হোক না কেন তাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তা না হলে সে আত্মহত্যা করবে কিন্তু তবুও ক্যানাডায় আমাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে সে কিছুতেই যাবে না।" কি অসম্ভব দৃঢ়তা! দুঃশ্চিন্তায় অধীর হয়ে অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলাম বিয়েই করব। নূর, সালাহউদ্দিন ওরাও আমার সিদ্ধান্তে একমত হল। এ ব্যাপারে গৌরিদী, গনী নানা, মিসেস জামানের সাথে আলাপ করে তাদের পরামর্শ চাইলাম। তারাও অভিমত প্রকাশ করলেন, "বিয়েই একমাত্র পথ।" নিম্মীকে পত্র মারফত জানিয়ে দিলাম, "আমরা কিছু একটা করছি। কিন্তু তাকে সুস্থ এবং স্থির থাকতে হবে।"

বিয়ে তো হবে। কিন্তু নিম্মীকে কি করে ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ থেকে বের করে আনা যায়। বাড়িটা তখন একটি বিশেষ নিরাপত্তাধীন দুর্গই বটে। সমস্ত VIP-V.VIP'রা বাস করছেন সেখানে। তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রায় ৩০-৪০ জন পুলিশ সার্বক্ষণিকভাবে পাহারায় মোতায়েন রয়েছে। তার উপর নিম্মীর উপর রয়েছে কড়া নজর। বাড়ির বাইরে যাওয়া ওর জন্য নিষিদ্ধ। সর্বোপরি সে শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সবাই মিলে তাকে বের করে আনার একটা পরিকল্পনা আঁটা হল।

মিসেস জামান, নায়লা, লুবনা ও গৌরিদী যাবেন নিম্মীদের বাসায়। নায়লা, লুবনা নিম্মীর বন্ধু বিধায় মিসেস জামানের সাথেও নিম্মীদের পূর্ব পরিচিতি আছে। নায়লা, লুবনা এবং মিসেস জামান বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল গঠনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে কাজ করছিলেন সেটা তখন প্রায় সর্ব মহলেই জানা। নিম্মী খ্যাতিমান ক্ল্যাসিকাল নৃত্য শিল্পী তাই সেও যাতে দলে যোগদান করে সেই অনুরোধ জানাবার উছিলায় যাবেন তারা। ঠিক হল কথার ফাকে নায়লা ও লুবনা নিম্মীকে যে করেই হোক কোনমতে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসবে। বাইরে নূরেরা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে। এরপর গাড়ি করে সোজা মৈত্রী মাসীর বাড়ি। বিয়ে সেখানেই হবে। গনী নানা বিয়ের কাজী, রেজিষ্ট্রার এসব কিছুর দায়িত্ব নিবেন। সালাহ্উদ্দিনকে আনুসাঙ্গিক অন্যসব ব্যবস্থার ভার দেয়া হল। পরিকল্পনার ব্যাপারে অবগত থাকলেন থিয়েটার রোড হেডকোয়াটার্সের গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার, ক্যাপ্টেন চৌধুরী। এছাড়া অন্য কাউকে কিছু বলা হল না। বিয়ের দিন ধার্য্য হল ১৬ই আগষ্ট সকাল দশটার দিকে। নায়লারা গিয়ে উপস্থিত হল ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউতে। প্ল্যানমত আলাপের এক ফাকে নায়লা এবং লুবনা বসার ঘর থেকে গিয়ে হাজির হল নিম্মীর ঘরে। সেখানে পৌঁছে নিম্মীকে লায়লা বলল, "এক্ষুণি চলো আমাদের সাথে। আজ তোমার বিয়ে।" প্রথমটায় হতচকিত হয়ে গিয়েছিল নিম্মী। কিন্তু মুহূর্তেই বুঝে নিল সবকিছু। অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে এক কাপড়ে বাসা থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাড়াল নিম্মী। যে কোন কুমারী মেয়ের পক্ষে এ ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একটি অসম্ভব দুরহ্ কাজ। নিম্মীর ভালোবাসার একনিষ্ঠতা এবং গভীরতাই সেদিন শক্তি যুগিয়েছিল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে। শারীরিক অসুস্থতা এবং স্নায়ু দুর্বলতার জন্যে বেচারী হাটতেও পারছিল না ঠিকমত। নায়লা ও লুবনা ওকে দু'দিক থেকে ধরে প্রায় বহন করে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে

কোনমতে অতি কষ্টে নামিয়ে নিয়ে এল গেটের বাইরে। সেখান থেকে সোজা মৈত্রী মাসীর বাসায় নূর নিয়ে এল সবাইকে। ওখানে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। সব বন্দোবস্ত প্ল্যানমত ইতিমধ্যে করা হয়েছে। সালাহউদ্দিন নিম্মীর জন্য বিশ-পচিঁশ টাকা দামের দু'টো শাড়ি এবং আমার জন্য দশ টাকা দামের একটা পাঞ্জাবী কিনে নিয়ে এসেছে। সেগুলো পড়েই আমাদের বিয়ে হল। সালাহউদ্দিন হল নিম্মীর উকিল বাপ। সাক্ষী হয়ে রইলেন গনী নানা, গৌরিদী, নূর এবং মিসেস জামান। বিয়ের পর উপস্থিত মুরুব্বীরা এবং মৈত্রী মাসী আমাদের আর্শীবাদ করলেন। বিয়ের দলিল রেজিষ্ট্রি করতে দু-তিন দিন সময় লাগবে। এ সময়টা লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের। কারণ নিম্মীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে বিয়ে করার পরিপ্রেক্ষিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তার মোকাবেলা করার জন্য বিয়ের দলিলটা অপরিহার্য। গৌরিদীই ঠিক করে ফেললেন তার পরিচিত এক ধনী ব্যবসায়ীর পার্ক ষ্টিট্রের একটা গেষ্ট হাউস। ছোট্ট কিন্তু সাজানো গেষ্ট হাউস। সেখানেই হবে আমাদের বাসর এবং মধুচন্দ্রিমা। আমাদের গোপন আস্তানার খবর বিয়েতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কাউকে জানানো হবে না। সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের চলে যেতে হল গেষ্ট হাউসে। নায়লা, গৌরিদী, নূর এবং সালাহউদ্দিন আমাদের পৌঁছে দিল। রজনীগন্ধা ও বেলী ফুল দিয়ে নায়লা, লুবনারা সুন্দর করে রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে দিয়েছিল আমাদের বাসর ঘর। ওরা চলে যাবার পর হঠাৎ করে আমরা দু'জন ভীষণ একলা হয়ে গেলাম। সারাদিনের ঘটনাবলী এত দ্রুত ঘটেছে যার ফলে চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশই আমরা পাইনি এতক্ষণ। একটা ঘোরের মাঝেই কেটে গেছে পুরো দিনটা। ফ্ল্যাটের নির্জন পরিবেশে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেদে উঠল নিম্মী। অতি স্বাভাবিক কারণেই ভেঙ্গে পড়ল সে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ধৈর্য্য ধরতে হবে। সময় সব সমস্যার সমাধান করে দেবে ইনশাল্লাহ্।" বেচারী ভীষণভাবে কাদঁতে কাদঁতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অতীত ও ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এক সময়। পরদিন সকালেই নূর এসে জানাল, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। নিম্মীর বাবা অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করেছেন, "আমি তার মেয়েকে জোর করে অপহরণ করে নিয়ে গেছি বাসা থেকে।" প্রধানমন্ত্রী গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সালাহউদ্দিনকে ডেকে হুকুম দিয়েছেন যে করেই হোক আমার এবং নিম্মীর খোঁজ করে তাকে বের করতেই হবে কোথায় আছি আমরা। প্রয়োজনে অপহরণকারী আর্মি অফিসারের কাছ থেকে নিম্মীকে উদ্ধার করার জন্য ভারতীয় পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তাও গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বিয়ের দলিল রেজিষ্ট্রি হয়ে হাতে না আসা পর্যন্ত কিছুই কাউকে বলার উপায় নেই। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন কর্নেল ওসমানীও। ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করে অন্যায়ভাবে জোর করে ভদ্রলোকের মেয়েকে যে অপহরণ করতে পারে তার কঠোর সাজা হওয়া উচিত। একই সাথে তিনি ভীষণভাবে দুঃখিতও হয়েছেন। নূরকে বলেছেন, "ডালিমের মত যোগ্য অফিসার কি করে এ ধরণের কাজ করতে পারে সেটা তিনি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না।" নূর আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলল, "স্যার আপনারা ঘরের বাহিরে যাবেন না দলিল হাতে না পাওয়া পর্যন্ত। গনী নানা চেষ্টা করছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দলিল রেজিষ্ট্রি করার। দলিলটা হয়ে গেলেই সবাইকে বুঝিয়ে ব্যাপারটার আপোষ মীমাংসা করার উদ্যোগ নেয়া হবে।" একবার স্থির করেছিলাম বাপ্পিকে একটা ফোন করে সব কিছু জানিয়ে ওকে বলি আমরা ভালোই আছি। কিন্ত নূরের কথায় সেটা করা সম্ভব হল না। ১৯ তারিখে আমাদের হাতে দলিল পৌঁছে গেল। সেদিনই সমস্ত ব্যাপারটা সালাহউদ্দিন, নূর এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার, কর্নেল ওসমানী এবং তাজুদ্দিনকে বুঝিয়ে বললেন। সমস্ত কিছু বিস্তারিত জানবার পর জনাব তাজুদ্দিনকে সবাই অনুরোধ জানালেন ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে দেবার জন্য। জনাব তাজুদ্দিন সেদিনই নিম্মীর বাবাকে এবং আমাদের ডেকে পাঠালেন থিয়েটার রোডে। নিম্মীর বাবার পৌঁছার আগেই আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। জনাব ওসমানী এবং জনাব তাজুদ্দিনকে সালাম করলাম দু'জনে, তারা আর্শীবাদ করলেন। জনাব তাজুদ্দিন বললেন যা হবার তা হয়ে গেছে। জনাব চৌধুরীকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি এলে তার কাছে মাফ চাইতে হবে আমাদের দু'জনকেই। এতেই কাজ হবে। কারণ জনাব চৌধুরী শক্ত অফিসার হলেও মনটা তার শিশুর মতই সরল এবং কোমল।

অল্পক্ষণ পর জনাব চৌধুরী ও বাপ্পি এসে পৌঁছালো। নূর তাদের অর্ভ্যথনা করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে এল। সেখানে কর্নেল ওসমানীও উপস্থিত ছিলেন। আমাদেরকেও হাজির করানো হল আসামীর মত। ঘরে ঢুকতেই জনাব তাজুদ্দিন গর্জে উঠলেন, "কি করেছ তোমরা? এত বড় দুঃসাহস হল কি করে? আমি মর্মাহত হয়েছি তোমাদের ছেলেমানুষী কার্যকলাপে। বিয়ে-শাদী বাচ্চাদের পুতুল খেলা নয়। মুরুব্বীদের আর্শীবাদ ছাড়া কেউ কোনদিন সুখী হতে পারে না। জলদি তোমরা বাবার কাছে মাফ চাও।" এরপর নিম্মীর বাবাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "চৌধুরী সাহেব ওরা আপনারই সন্তান। ভুল করে ফেলেছে না বুঝে। ওদের আপনি ক্ষমা করে আর্শীবাদ করুন।" প্রধানমন্ত্রীর কথা শেষ হতেই আমরা বাবার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। নিম্মী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ওতেই মোক্ষম কাজ হল। মোমের মত গলে গেলেন চাচা মানে নিম্মীর বাবা। নিম্মীকে জড়িয়ে ধরে তিনিও কাঁদতে লাগলেন। আমাকেও টেনে তুলে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। নূর, সালাহ্উদ্দিন ওরা সব তৈরিই ছিল। মিষ্টির প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল ব্যায়ারা। এক আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হল থিয়েটার রোডে। চাচার কাছ থেকে জানতে পারলাম খালাম্মা মানে নিম্মীর মা ভীষণভাবে আঘাত পেয়েছেন নিম্মীর বাড়ি ছেড়ে চলে এসে বিয়ে করায়। তিনি ভীষণ জেদি এবং তীব্র অভিমানী। তার রাগ না কমলে বাড়িতে আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না। এতে হিতে বিপরীত হবারই সম্ভাবনা। ঠিক হল আরো কিছুদিন আমাদের গেষ্ট হাউজেই থাকতে হবে। বাপ্পিকে সমস্ত ঘটনা থেকে বাদ রাখা হয়েছিল বলে সে ভীষণভাবে অভিমান করেছিল আমাদের উপর। অতি কষ্টে তার মান ভাঙ্গাতে হয়েছিল আমাদের দু'জনকে। বাবা চলে যাবার পর জনাব তাজুদ্দিন বলেছিলেন, "দু'জনে দু'জনকে পছন্দ করে দুঃসাহসিকভাবে বিয়ে করেছ; এখন থেকে তোমরা দু'জনেই হবে দু'জনের অবলম্বন। দুঃখ কর না সময়মতো সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বিয়েও হয়েছিল ঠিক তোমাদের মত করেই সবার অমতে। আমি আর্শীবাদ করছি তোমরা চিরসুখী হও।"

তাকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে আসতেই নূর, সালাহউদ্দিনরা সব আমাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় পুরো থিয়েটার রোড মাতিয়ে তুলল। কর্নেল ওসমানীও এসে যোগ দিলেন আমাদের সাথে। সবাই সেদিন একসাথে রাতের খাওয়া খেলাম। বিশেষ খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেদিন। বিদেশের মাটিতে জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপর্ণ সন্ধিক্ষণে সেদিন জনাব তাজুদ্দিন, কর্নেল ওসমানী, গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার, ক্যাপ্টেন চৌধুরী, ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন, লেফটেন্যান্ট নূর, মৈত্রী মাসী, গৌরিদী, গনী নানা, মিসেস জামান, নায়লা, লুবনা, জনাব আইয়ূব, প্রীতিশ নন্দী, রীণা, ইন্দু, ডঃ মুখার্জী, অরুপদা এবং ওদের মত অন্য সবার কাছ থেকে যে উষ্ণ আন্তরিকতা এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং সহযোগিতা পেয়েছিলাম সেটা জীবনে কখনোই ভোলা যাবে না। আমরা দু'জনেই তাদের কাছে চিরঋনী হয়ে থাকব সারাজীবন।

এ ক'দিনের টেনশনে ঠিকমত ঔষধপত্র খাওয়া হয়নি ফলে চিকিৎসা বিঘ্নিত হয়েছে। তার পরিণামে হাতের ব্যাথা হঠাৎ করে বেড়ে গেল। ব্যান্ডেজের নিচ থেকে পচাঁ দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল। তাড়াতাড়ি ডঃ মুখার্জীর ওখানে আমাকে আবার নিয়ে যাওয়া হল। ব্যান্ডেজ খুলে হাতের ক্ষতের অবস্থা দেখে তার মুখ কালো হয়ে গেল। তিনি বললেন, "ঠিকমত চিকিৎসা না হওয়ায় এবং ঔষধপত্র না খাওয়ায় হাতে গ্যাংরিন শুরু হয়েছে। এ পচঁনকে রোধ করতে হলে অবিলম্বে অপারেশন করতে হবে। তা না হলে পুরো হাতটাকেই কেটে ফেলতে হতে পারে।" ডাক্তারের কথা শুনে সবাই ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলেন।

আমিও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত। আমি হাসপাতালে ভর্তি হলে নিম্মী একা একা ফ্ল্যাটে কি করে থাকবে! আবার সাহায্যের মুক্ত হাত বাড়িয়ে দিলেন ডঃ গনী, "নিম্মী আমার মেয়ে। ও আমার বাসায় থাকবে। তুমি এ নিয়ে চিন্তা কর না। আজই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাও।" গনী নানার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। পারুমিতা বৌদি আমার ভর্তির সব ব্যবস্থা করে দিলেন পিজি হাসপাতালে। আমার অপারেশন করলেন ডঃ মুখার্জী। গ্যাংরিন রোধ

করার জন্য বা হাতের বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু অংশ কেটে ফেলে দিতে হয়েছে তবু আল্লাহ্‌র রহমতে বা হাতটা বাচাঁনো সম্ভব হয়েছে। ডঃ মুখার্জী অপারেশন শেষে মন্তব্য করেছিলেন আর কয়েকটা দিন দেরি হলে পুরো বা হাতটাই কেটে ফেলতে হত। পরিবারের সবচেয়ে আদরের নিম্মীকে দেখে কষ্ট হয়। আমি বুঝতে পারি ভেতরে ভেতরে তার অন্তরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বাড়িঘর, একান্ত আপনজন সবাই থাকতেও আজ ও ভীষণ একা। একটু আশ্রয়ের জন্য আজ তাকে এখানে-ওখানে থাকতে হচ্ছে রিফিউজির মত। তার উপর আমার শারীরিক অবস্থা নিয়ে ও বিশেষভাবে চিন্তিত। বাপ্পির কাছ থেকে জানতে পারলাম আমাদের চিন্তায় চাচা ভেঙ্গে পড়েছেন; তিনি আমাদের এই মুহূর্তেই বাসায় নিয়ে যেতে চান কিন্তু খালাম্মার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে তার কাছে কথাটা কিছুতেই উঠাতে পারছেন না জনাব চৌধুরী। অত্যন্ত স্নেহবৎসল খালাম্মা। তিনি নিম্মীর উপর যে অভিমান করেছেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ নিম্মী তার খুব আদরের আর সেই নিম্মীই এ ধরণের একটা কাজ করে বসবে সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না খালাম্মা। তার বিশ্বাসের অবমাননা করেছে নিম্মী এটাই তার ক্ষোভের প্রধান কারণ। সবকিছু মিলিয়ে বাসায় একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর সবটুকু চাপ পড়ছে নিম্মীর মনের উপর। বেচারী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত; কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই পাছে আমি মনে কষ্ট পাই এ কারণে। শুধু আমার জন্যই বেচারী জান আমার মুখ বুজে সবকিছুই মেনে নিয়ে স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওর ত্যাগ, সহনশীলতা এবং ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম, ওর এই অসহায় অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। অত্যন্ত স্বার্থপর মনে হচ্ছিল নিজেকে। মনেমনে ঠিক করলাম যেভাবেই হোক না কেন তাকে এই করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধার আমাকেই করতে হবে। সপ্তাহখানেক হাসপাতালে থাকতে হল। হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর একদিন নিম্মীকে সঙ্গে নিয়ে সোজা গিয়ে উপস্থিত হলাম নিম্মীদের বাসায়। চাচা, বাপ্পি, মানু আমাদের আনন্দে জড়িয়ে ধরল। আমি বাপ্পিকে জিজ্ঞেস করলাম, "খালাম্মা কোথায়?" বাপ্পি জানাল আজকাল তিনি বেশিরভাগ সময় তার নিজের ঘরেই কাটান, বের হন না খুব একটা। কারো সাথেই তেমন কোন কথাবার্তা বলেন না প্রয়োজন ছাড়া। সবশুনে আমি সোজা চলে গেলাম তার ঘরে। তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতই চমকে বিছানা ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে একহাতেই জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ধরে বললাম,

— খালাম্মা আমাদের মাফ করেন। মাফ আপনাকে করতেই হবে। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি কিংর্কতব্যবিমুঢ় হয়ে গিয়েছিলেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন,

— আরে পাগল ছেলে কি করছ! হাতে ব্যথা পাবে যে!

— আমি আপনাকে নামাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের ক্ষমা না করছেন। দৃঢ়তার সাথেই বললাম আমি।

উষ্ণতায় জমা বরফ গলে গেল নিমিষে। মাতৃস্নেহের আকুলতায় তিনি আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তার চোখ বেয়ে ঝরছে অশ্রুধারা।

ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

— নিম্মী কোথায়? বললাম,

কোথায়? বললাম,

— বসার ঘরে।

— আমাকে নিয়ে চলো।

বললেন আমার অতিপ্রিয় খালাম্মা। তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এলাম ড্রইং রুমে। আমাদের দেখে সবাই অবাক। কি করে অসম্ভবকে সম্ভব করলাম সেটাই সবার চোখে প্রশ্ন হয়ে ফুটে উঠেছিল। নিম্মী প্রায় পাগলের মত দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। আদরের নিম্মীকে বুকে ধরে আবেগের আতিশয্যে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না খালাম্মা। সব বাধ ভেঙ্গে গেল। মান অভিমান রাগ সব ভেসে গেল অশ্রুর বন্যায়। দু'জনেরই সেকি কান্না! আমরা সব

নিশ্চুপ দাড়িয়ে থেকে মা ও মেয়ের অভুতপূর্ব মিলন দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। সেদিনই গনী নানার বাড়ি থেকে চলে আসতে হল আমাদের।

ছোট ভাই স্বপন এবং বাল্যবন্ধু কাজি কামালুদ্দিনের সাক্ষাত পেলাম

একদিন সকালে ধর্মনগর থেকে ক্যাপ্টেন খায়রুল আনাম আমায় জানালো,"স্বপন ও বদি অফিসার্স কোর্সে যোগদানের জন্য তারা মুর্তী যাবার পথে ধর্মনগর পৌছেছে। ওরা আমার খোঁজ করছে।" আমি ওদের পাঠিয়ে দিতে বললাম।

হঠাৎ একদিন ধর্মনগর থেকে বন্ধু ক্যাপ্টেন আনাম আমাকে জানাল আমার ছোটভাই স্বপন এবং একান্ত বন্ধু কাজি কামালুদ্দিন মুর্তীর পথে এসে পৌঁছে আমার খোঁজ করছে। তাকে অনুরোধ জানালাম ওদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছল। স্বপনকে এভাবে কাছে পাবো সেটা ভাবতেও পারিনি। ওদের কাছে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিলাম। আত্মীয়-পরিজনদের সব খবরা-খবরই পেলাম তাদের কাছ থেকে। শুনলাম ঢাকা শহরে ওদের দুঃসাহসিক গেরিলা অভিযানের লোমহর্ষক কাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই স্বপন, বদি, কাজি, জুয়েল, রুমী, আলম, আজাদ, সাচো বর্ডার পেরিয়ে ২নং সেক্টরের মেলাঘর ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়ে ঢাকায় ফিরে গিয়ে গেরিলা তৎপরতায় কাঁপিয়ে তোলে ঢাকা শহর। পর্যায়ক্রমে তাদের সাথে যোগ দেয় চুল্লু, ফাজলে, মোক্তার, হ্যারিস, তৈয়ব আলী, উলফাৎ, সামাদ, ফতেহ আলী, মেওয়া, জিয়া, ভুলু, সাইদ এবং আরো অনেকেই। ওদের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ঢাকায় অবস্থান করে বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করার যাতে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, তাদের ঐ ধরণের গেরিলা তৎপরতায় এটাও প্রমাণিত হবে যে, পুরো বাংলাদেশ খানসেনাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে যে সরকারি প্রচারণা চালানো হচ্ছে সেটাও সত্যি নয়। জুরাইন, গুলবাগ পাওয়ার-ষ্টেশন, সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার-ষ্টেশন, ধোলাইখাল, যাত্রাবাড়ি, গ্রীন রোড, ইন্টারকন, র্ফামগেট, ধানমন্ডির ২নং সড়ক প্রভৃতি জায়গায় একটার পর একটা দুঃসাহসিক সফল অভিযান চালিয়ে খানসেনাদের নাস্তুনাবুদ করে তুলেছিল ওরা। ওদের প্রতিটি মাথার জন্য ২০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল পাকিস্তানের সামরিক সরকার। এতে কোন ফল হয়নি। খানসেনাদের সব সতর্কতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তাদের নাকের ডগার উপর দিয়ে জানবাজ মুক্তি পাগল দামাল ছেলেগুলো অসীম সাহসিকতার সাথে করে যাচ্ছিল একেকটা দুঃসাহসিক অভিযান। খানসেনাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল বিচ্ছুরা (খান সেনারা গেরিলাদের 'বিচ্ছু' কিংবা 'মুক্তি' বলে সম্বোধন করত)। ওদের তৎপরতায় আশার আলো দেখতে পেয়েছিল ঢাকাবাসী। ওদের জন্য দোয়া করতো সবাই। অনেকে নানাভাবে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় বিপদের ঝুঁকি নিয়েও।

কিন্তু জাতীয় ইতিহাসে 'মীরজাফর' থেকেছে সর্ব যুগেই। তাদের বেঈমানীর ফলে অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন মোড়ে। তেমনই এক মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় স্বপন-বদি-কাজিদের ভাগ্যে নেমে আসে এক চরম বিপর্যয়। পলাশীর বিশ্বাসঘাতকতার তুলনায় এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম কোন অংশেই কম নয়। ২৯শে আগষ্ট ১৯৭১ সাল। ঐ দিন সকালে ধানমন্ডির ২৮নং রোডের একটি বাসায় ওদের এক ঘনিষ্ট বন্ধু ও সহযোগী ফরিদের সাথে দেখা করতে যায় বদি পূর্ব কথামত। ফরিদ বর্তমান আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা জনাব জিল্লুর রহমানের শ্যালক তথা আইভি রহমানের ভাই। তারই বিশ্বাসঘাতকতায় দুপুর ১২টার দিকে ফরিদদের বাসা থেকে হঠাৎ রেইড করে বদিকে ধরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় খান সেনারা। ফরিদদের বাসায় পৌঁছানোর অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে বদি। এ থেকে বোঝা যায় আগাম খবর পেয়েই খানসেনারা বদিকে ধরার জন্য ওৎ পেতে বসেছিল। তারপর শুরু হয় **Chain Reaction.** সামাদ ধরা পরে বিকেল চারটার দিকে। আজাদের বাড়ি রেইড করা হয় রাত ১২টায়। ঐ বাসায় সে রাতে ছিল জুয়েল, বাশার, কাজি, আজাদ, আজাদের খালাতো ভাই, দুলাভাই এবং আরো কয়েকজন আত্মীয়। সবাইকেই ধরে নিয়ে যায় পাক-আর্মি। রেইড চলাকালে আচম্কা

তদারককারী এক ক্যাপ্টেনের উপর ঝাঁপিয়ে পরে তার হাতের ষ্টেনগান ছিনিয়ে নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে পেরেছিল একমাত্র কাজি। আলমদের বাসাতেও রেইড করা হয় রাত ১২টার পর। সেখানে ধরা পরে আলমের ফুপা আব্দুর রাজ্জাক এবং তার ছেলে মিজানুর রহমান। আলম বাসায় না থাকায় ধরা পরার হাত থেকে সে যাত্রায় বেঁচে যায়। আজাদদের বাসা আলমদের বাসার কাছাকাছি। রাত প্রায় দেড়টার সময় সম্পূর্ণ দিগম্বর অবস্থায় কাজি গিয়ে পৌঁছে আলমদের বাসায়। ভাগ্যক্রমে খানসেনারা ততক্ষণে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। কাজিকে সম্পুর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল আলমদের বাসার সবাই। আলমের ছোটবোন তাড়াতাড়ি একটা লুঙ্গি কাজির হাতে দিয়ে তক্ষুণি দূরে পালিয়ে যেতে অনুরোধ জানায়। খান সেনারা এখানেও এসেছিল জানতে পেরে কাজি কাপড়টা পরে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। হাটখোলায় শাহাদাত চৌধুরী মানে সাচোদের বাড়ি থেকে ধরা পড়েন সেজো দুলাভাই বেলায়েত চৌধুরী রাত দু'টো পর। চুল্লুর বড়ভাই জনাব এম সাদেক সিএসপি একজন পদস্থ সরকারি অফিসার। রাত ১২:৩০-১টার দিকে তার সরকারি বাসভবন এ্যালিফেন্ট রোডের ১নং টেনামেন্ট হাউজ থেকে চুল্লুকে ধরে নিয়ে যায় পাক-আর্মি। মধ্যরাতে রেইড করা হয় রুমীদের বাড়ি। বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় রুমী, রুমীর বাবা জনাব শরিফ, ছোট ভাই জামী, মাসুম এবং হাফিজকে। আমাদের বাসায় ক্যাপ্টেন কাইয়ূমের নেতৃত্বে রেইড করা হয় ১:৩০-২টার দিকে। চুল্লুদের বাসায় যে রেইডিং পার্টি গিয়েছিল তারাই চুল্লুকে চোখ বাধা অবস্থায় সাথে করে আমাদের বাসায় নিয়ে আসে। চোখ বাধা অবস্থায় চুল্লু প্রথমে বুঝতে পারেনি তাকে কোথায় আনা হয়েছে। আচমকা একজন খানসেনা বলে উঠল, "স্বপন ভাগ গিয়া।" আব্বার গলাও শুনতে পায় চুল্লু। মেয়েদের কান্না থেকে বুঝতে পারে আমার বোনেরা (মহুয়া, কেয়া, সঙ্গীতা) কান্নাকাটি করছে। দৈবক্রমে স্বপন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় আব্বা জনাব শামছুল হক, মোস্তাফিজ মামা, বাড়ির কাজের ছেলে সামু এবং হাশেমকে। আলতাফ মাহমুদের বাসায় আর্মি যায় ভোর ৪-৫টার দিকে। সামাদকে সঙ্গে নিয়ে আর্মি গিয়েছিল ঐ বাড়িতে। আলভী ঐ রাত্রে সেই বাড়িতেই ছিল। নাম লুকিয়ে উর্দূতে নিজের নাম আব্দুল বারাক বলায় আলভী ধরা খাওয়া থেকে বেঁচে যায়। খান সেনারা ধরে নিয়ে যায় আলতাফ মাহমুদ, তার চার শ্যালক, রসুল এবং নাসেরকে।

এভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঢাকায় গেরিলাদের সবচেয়ে কার্যকরী এবং সফল দলটি বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পালাবার পর কাজি ও স্বপনের দেখা হয় তাদের বেইস ক্যাম্প ধোলাইখালে। সেখান থেকে মেলাঘর। সেখানে তাদের দু'জনকেই সিলেক্ট করা হয় **Officer's Training Course** এর জন্য। কিন্তু দু'জনেরই কোন ইচ্ছে ছিল না **Officer's Course** এ যোগ দেবার। তারা অনেক অনুরোধ জানিয়েছিল মেজর খালেদ মোশাররফ এবং ক্যাপ্টেন হায়দারকে তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আবার ঢাকায় পাঠাবার জন্য। তারা চাইছিল ফিরে গিয়ে বন্দী সাথীদের মুক্ত করতে। জীবন গেলেও ক্ষতি নেই তবু একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায় তারা। নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ছিল তাদের। যদি মেজর খালেদ এবং ক্যাপ্টেন শিশুর পরিবারদেরকে পাক বাহিনীর সুরক্ষিত দুর্গ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এ বন্দী অবস্থা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পেরে থাকে তারা তবে তাদের পক্ষে বদি-জুয়েল-রুমীদেরকে ছাড়িয়ে আনাটা অসম্ভব হবে কেন? তাদের আবেগ, অনুভূতি, সহমর্মিতা মেজর খালেদের মনকে স্পর্শ করলেও ঠিক সেইক্ষণে তাদের ফেরত পাঠানো কোনক্রমেই ফলপ্রসু হবে না ভেবেই তাদেরকে **Officer's Course** এ পাঠাবার সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন মেজর খালেদ একজন অভিজ্ঞ কমান্ডার হিসেবে। আমার কাছে পৌঁছেও তারা একই প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আমিও মেজর খালেদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে তাদের **Officer's Course** -এ যোগদান করাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মতপ্রকাশ করি। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুর্তীতে চলে যায় **Course**-এ জয়েন করার জন্য।

ভারতীয় নীল নকশা এবং মুজিব নগর সরকার

আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীন ক্ষমতার লড়াই এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ভারতীয় সরকার এবং গোয়েন্দা সংস্থা "র" - "ডিভাইড এন্ড রুল" নীতি প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রী এবং সর্বাধিনায়ক দু'জনকেই হেয় করে তোলা হয়।

তাজুদ্দিনের হঠাৎ করে প্রবাসী সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা আওয়ামী লীগের অনেকেই পছন্দ করেনি। তাদের মধ্যে ছিলেন যুব ও ছাত্রনেতাদের অনেকেই। অনেক সাংসদ এবং আওয়ামী লীগের নেতারাও এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন। শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, শাহ্জাহান সিরাজ, নুরে আলম সিদ্দিকী এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ যুব ও ছাত্রনেতারা সবাই প্রকাশ্যে তাজুদ্দিনের এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন। তাদের পরোক্ষভাবে মদদ যোগাচ্ছিলেন জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ আবদুল আজিজ, মনসুর আলী, জনাব নজরুল ইসলাম প্রমুখ। জনাব তাজুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রীত্বের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জেনারেল অরোরার মন্তব্য, "আওয়ামী লীগের যুবনেতারা তাকে পছন্দ করত না।" (বাংলাদেশের যুদ্ধের স্মৃতিচারন শিরোনামে নিখিল চক্রবর্ত্তীকে দেয়া জেনারেল অরোরার সাক্ষাৎকার।)

সাধারণভাবে যুবনেতাদের অনেকেই সেদিন ভেবেছিলেন শেখ মুজিব আর জীবিত নেই। মুজিবর রহমানের অবর্তমানে তাজুদ্দিন তাদের প্রভাবকে তেমন একটা মেনে চলবেন না। শেখ মুজিব কাছে থাকলে এ সমস্ত যুব এবং ছাত্রনেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের কর্তৃত্ব অতি সহজেই স্থাপন করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তাজুদ্দিন তাদের সাথে অন্য সুরে কথা বলছেন। তাদের হাতে ক্রিয়াণক হয়ে সংগ্রামের সব নেতৃত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দিতে তিনি অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। তাদের সংগ্রামী ভূমিকাকেও ছোট করে দেখছেন জনাব তাজুদ্দিন। সরকার পরিচালনায় যুব ও ছাত্রনেতাদের মতামত তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছেন। তাজুদ্দিনের ধৃষ্টতার শেষ নেই। তিনি সরকার প্রধান থাকার কারণে তাদের সুযোগ-সুবিধাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আত্মীয়-স্বজনকেও যথাযথ মর্যাদা দান না করে তাদের উপেক্ষা করেছেন। তাদের উপেক্ষা করা, পরোক্ষভাবে শেখ মুজিবকেই উপেক্ষা করার সমতুল্য। অতএব, যে কোন মূল্যে তাজুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অপসারন করতে হবে। মেতে উঠলেন তারা এক ক্ষমতা লাভের চক্রান্তে। পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখ মনি ও সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে কয়েকজন যুব ও ছাত্রনেতা দিল্লী গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাকে জানান যে তারা শেখ মুজিবর রহমানের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। পাক বাহিনীর হাতে শেখ মুজিবের গ্রেফতারের পেছনে জনাব তাজুদ্দিনের হাত রয়েছে। গ্রেফতারের আগে শেখ মুজিব তাদের সে কথা জানিয়ে তাদেরকে ভারত সরকারের সহায়তায় স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়ে যান। জনাব তাজুদ্দিনের উপর বাংলাদেশ থেকে আগত বেশিরভাগ আওয়ামী লীগ জাতীয় এবং প্রাদেশিক সাংসদদের সমর্থনও নেই। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীত্ব করার কোন অধিকার নেই তাজুদ্দিন সাহেবের। তাদের বক্তব্যের সমর্থনে তারা মুজিবর রহমানের ভগ্নিপতি জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের একটি চিঠি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে প্রদান করেন এবং শেখ মুজিবের জেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালকে তার সম্মুখে উপস্থিত করেন। তারা শ্রীমতি গান্ধীকে এ কথা বলেও হুঁশিয়ার করে দেন যে তাজুদ্দিন যদি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকেন তবে ভারতের স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ জনাব তাজুদ্দিন শেখ মুজিবের নীতি আদর্শ কিছুতেই বাস্তবায়িত করবেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে দু'পক্ষের স্বার্থে তাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে আগত মুজিব ভক্ত এবং তাদের অনুগত তরুণদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার জন্য তারা শ্রীমতি গান্ধীর কাছে আবেদন জানান। তারা বলেন, শুধুমাত্র এ ধরণের শক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমেই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ এবং বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের মধ্যে অর্থবহ সম্পর্ক বজিয়ে রাখা সম্ভব। তা না হলে অচিরেই ভারত বিদ্বেষীদের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হবে আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের এ অনুরোধ সাগ্রহে

গ্রহণ করেন শ্রীমতি গান্ধী। সুদূর প্রসারী নীল নকশার কথা চিন্তা করেই **Devide and Rule** নীতির প্রয়োগের জন্য বিএলএফ পরবর্তিতে নাম বদলিয়ে মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি করে সেকেন্ড ফ্রন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল বিএলএফ ওরফে মুজিব বাহিনী।

এ তথ্যগুলোও জনাব ওসমানীকে জানাই আমরা। তিনি সেগুলো জনাব তাজুদ্দিনকে জানান। প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন নাকি এ সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে দিল্লীতে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং এর প্রতিবিধানের দাবি জানান। কিন্তু জনাব হাকসার, ডিপিধর, 'র' এর রমানাথ রাও এবং জেনারেল ওবান সিং এ ব্যাপারে তাজুদ্দিনকে এড়িয়ে গিয়ে নিরব থাকেন। ফিরে এসে কর্নেল ওসমানীকে সে কথাই বলেছিলেন জনাব তাজুদ্দিন। আমরা পরে কর্নেল ওসমানীর কাছ থেকে তার ব্যাখ্যা জানতে পারি। পরবর্তী পর্যায়ে মুজিব বাহিনীকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ফোর্সেস হেডকোয়টার্স এর নিয়ন্ত্রণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কর্নেল ওসমানী। কিন্তু তার কোন চেষ্টাই ফলপ্রসু হয়নি। নিতান্ত অপারগ হয়েই কর্নেল ওসমানীকে বিএলএফ তথা মুজিব বাহিনী সৃষ্টি করার ভারতীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়।

ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সহায়তায় ক্যাপ্টেন জলিলের ফোর্ট উইলিয়ামের পূর্বাঞ্চলীয় হেডকোয়াটার্সের কর্মকর্তাদের সাথে গোপন যোগাযোগ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠল। ভারতীয় সরকার শুধুমাত্র প্রবাসী সরকার এবং মুক্তি বাহিনীর সদর দপ্তরের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল তা নয়, তারা ক্ষমতাধর কমান্ডারদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। অত্যন্ত চতুরতার সাথে তারা তাজুদ্দিনের প্রবাসী সরকারের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাকেও দুর্বল করে চাপের মুখে রাখছিল যাতে তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে বাধ্য হন। অপরদিকে মুজিবনগর সরকার ও মুক্তিযোদ্ধের সর্বাধিনায়ক জনাব ওসমানীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কর্নেল ওসমানীর ক্ষমতা সীমিত করে রাখা হচিছল একইভাবে। কর্নেল ওসমানীকে সাইড ট্র্যাক করে প্রবাসী সরকার ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের এ ধরণের কার্যকলাপে কর্নেল ওসমানী অতি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভীষণভাবে অপমানিত বোধ করছিলেন। তার বক্তব্য ছিল পরিষ্কার।

ভারত বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী মানবিক কারণে সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে সেটার জন্য বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামটা পূর্ব বাংলার ৮ কোটি বাঙ্গালীর নিজস্ব সংগ্রাম। এ সংগ্রাম তাদেরই সংগঠিত করতে হবে। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে তাদেরকেই অর্জন করতে হবে জাতীয় স্বাধীনতা, সংগ্রামের নেতৃত্ব ও সব দায়িত্বও থাকতে হবে মুক্তিফৌজ কমান্ড ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অধিনে। জনাব ওসমানী নীতির এ প্রশ্নে কখনোই আপোষ করেননি। এ বিষয় নিয়ে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বের সাথে অনেক বির্তক হয়েছে তার। কিন্তু তার এ নীতির প্রতি সমর্থন দেননি আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ নেতৃত্ব ও গণপরিষদ সদস্যরা। তারা তখন নিজ নিজ ক্ষমতার বলয় তৈরি করতে ব্যস্ত। তাদের প্রায় সবার মাঝেই এক ধরণের উদ্ভট চিন্তা কাজ করছিল। শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই নয় অনেক আমলা এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের মাঝেও সেই একই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। তাদের ধারণা ছিল মুক্তিযুদ্ধ যে কারণেই হোক শুরু হয়ে গেছে। প্রতিরোধ সংগ্রামকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব অঞ্চল থেকে কোটি কোটি টাকা ও সম্পদ লুন্ঠন করে নিয়ে হিজরত করে চলে আসা হয়েছে নিরাপদ আশ্রয় ভারতে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বলতে লজ্জা লাগলেও বলতে হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা অনেক বুদ্ধিজীবি ও হোমরা-চোমরা পদস্থ ব্যক্তিরাও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ মুক্তি সংগ্রামকে দেখতেন অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিতে। তারা মনে করতেন বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধারা কখনই পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে দেশ স্বাধীন করতে সক্ষম হবে না। পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করতে সরাসরি ভারতীয় সেনা বাহিনীর হস-ক্ষেপ অবশ্যই অতি প্রয়োজনীয়। রক্তক্ষয়ী দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা অথবা যোগ্যতা তাদের অনেকেরই ছিল না। যুদ্ধের ঝুঁকি এবং কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতেও তারা ছিলেন নারাজ। এতে করেই তাড়াতাড়ি 'হজ্ব' শেষ করে প্রবাসী

জীবনের কষ্ট থেকে রেহাই পেয়ে দেশে ফিরে লুটপাটের কালো টাকার আয়েশী জীবন খুব তাড়াতাড়ি আবার শুরু করতে পারা যাবে একমাত্র ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই। ভারতে হজ্জ করার স্ট্যাম্প যখন একবার নিতে সক্ষম হয়েছেন তারা তখন দেশে ফেরার পর তাদের রাজ কায়েম করার পথে বাধা কোথায়? তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশটাকে স্বাধীন করে দেবার জন্য তাদের একাংশ গোড়া থেকেই ভারত সরকারের বিভিন্ন মহলে জোর লবিং শুরু করে দিয়েছিলেন।

সমস্ত প্রবাসী সরকারের মধ্যে শুধুমাত্র দু'জন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ ধরণের উদ্যোগের বিরোধিতা দৃঢ়তার সাথে করে গিয়েছিলেন। তাদের একজন হলেন কর্নেল ওসমানী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ। এই দুইজন ছাড়া সিনিয়র রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রায় সবাই এবং আমলাদের উচ্চপদস্থ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেকেই ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতিত্ব করছিলেন। পরবর্তিকালে সিজরিয়ন অপারেশন এর মাধ্যমে বাংলাদেশের **Premature birth** এর জন্য মূলতঃ এরাও দায়ী ছিলেন অনেকাংশে। কিন্তু বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধা, আমলাতন্ত্রের তরুণ সদস্যরা এভাবে অপরের কৃপায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার উদ্যোগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ নিয়ে প্রবীণদের সাথে তরুণদের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃই বেড়ে উঠছিল প্রতিদিন।

ভারত সরকারের স্বীকৃতি এবং সামরিক হস্তক্ষেপ

সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির পরই ভারত বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়টিও ছিল সুচিন্তিত।

এ ঘটনার পর আওয়ামী লীগের অর্ন্তদ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয়। ভারত সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং বাংলাদেশ সমস্যার একটা আশু সমাধানের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। মুক্তি সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলে অবস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে সেটাই ছিল তাদের মূল আশংকা। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনাব তাজুদ্দিন প্রবাসী সরকারের তরফ থেকে ভারত সরকারকে বোঝালেন- দু'পক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অনতিবিলম্বে ভারতীয় সামরিক অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ফেলতে হবে। ভারত সরকার তাজুদ্দিন সরকারের আবেদনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও হঠাৎ করে তখনি এককভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হল না। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঠিক করলেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে পরাশক্তিধর দেশগুলোর মনোভাব জানার পরই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে এক ঝটিকা সফরে বেরিয়ে পড়লেন। সবখানেই তিনি নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ সমস্যা এবং ভারতের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করলেন। বর্বর শ্বেতসন্ত্রাসের ফলে আগত শরণার্থীদের মানবিক কারণে ভারতের মাটিতে আশ্রয় দেয়ার জন্য নেতারা ভারত সরকারের প্রশংসা করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর নেতারা বাংলাদেশ সমস্যাকে পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীন সমস্যা হিসাবেই আখ্যায়িত করেন এবং পরিষ্কারভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে জানিয়ে দেন- এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরিভাবে ভারতীয় যেকোন সামরিক পদক্ষেপ তাদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠবে। শরণার্থীদের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং ভারতের উপর যে অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে সেটা কমানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্থিক এবং সামগ্রিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সব নেতারাই।

রিলিফের সামগ্রী নিয়েও পরে ঘটেছে অনেক কেলেংকারী। বিপুল পরিমাণের রিলিফ-সামগ্রীর কতটুকু পেয়েছিল শরণার্থীরা তার জবাব একমাত্র দিতে পারে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের কর্ণধাররাই। আমার জানামতে প্রাপ্ত রিলিফ-সামগ্রীর একটা ক্ষুদ্র অংশই ভারত এবং প্রবাসী সরকারের উদ্যোগে বিতরণ করা হয়েছিল শরণার্থীদের মাঝে। রিলিফ-সামগ্রীর সিংহভাগই বেমালুম হজম করে নিয়েছিল ভারত সরকার।

বিদেশ সফর থেকে শ্রীমতি গান্ধী বুঝতে পারেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক অভিযান চালালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো তাকে সমর্থন করবে না। পক্ষান্তরে এশীয় পরাশক্তি গণচীন হয়তো বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে যেতে পারে পাকিস্তানের পক্ষে এ ধরণের সংঘাতে। সে ক্ষেত্রে ভারতের একক আগ্রাসন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব প্রস্তাবিত 'নিরাপত্তা এবং বন্ধুত্ব' চুক্তি সই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শ্রীমতি গান্ধী ও তার সরকার। ঐ চুক্তি সাক্ষরের ফলে ভারতীয় জনগণ কতটুকু উপকৃত হয়েছে জানি না তবে পাকিস্তানকে দুর্বল ও দ্বিখন্ডিত করতে এবং সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে বাংলাদেশ কায়েম করে সেখানে একটা পুতুল সরকার স্থাপন করার ভারতীয় স্বপ্নের বাস্তাবায়নে ঐ চুক্তি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল নিঃসন্দেহে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেয় ভারত সরকার। প্রতিদানে ভারতের সাথে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ২৫বছর মেয়াদের এক চুক্তি সই করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার। রহস্যজনক কোন কারণবশতঃ আজ পর্যন্ত সেই চুক্তির বিষয়বস্তু গোপন রাখা হয়েছে দেশের জনগণের কাছ থেকে। মুজিবনগর সরকার এবং আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ সাংসদ ঐ চুক্তিকে

সমর্থন করে। বিরোধিতা করেছিলেন মাত্র দু'জন। কর্নেল ওসমানী এবং খন্দোকার মোশতাক আহমদ।

মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগই এ ধরণের চুক্তির ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সব বিরোধিতা উপেক্ষা করে তাজুদ্দিন সরকার এক অসম চুক্তির নাগপাশে আবদ্ধ করলেন বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে। ভারতের সাথে দীর্ঘ ২৫ বৎসরের এ অসমচুক্তি জাতীয় ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। এ চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পর বাংলাদেশে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ তথা পাক-ভারত যুদ্ধ প্রায় অবধারিত হয়ে ওঠে। মুক্তি বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ বরাবরই মুক্তি সংগ্রামে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে আসছিলেন। তাদের প্রত্যাশা ছিল দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীন হবে বাংলাদেশ। এতে দু'টো বিশেষ উপকার হত। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে গড়ে উঠতো নিবেদিত প্রাণ-ত্যাগী-পরিক্ষীত নেতৃত্ব এবং একইভাবে সুযোগ পাওয়া যেত নিখাদ সোনার মত বলিষ্ঠ জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলার। কিন্তু নীল নকশার প্রণয়নকারীরা বাঙ্গালী জাতিকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে অতি চতুরতার সাথে। খাল কেটে কুমির আনার সব ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করে ফেললো মুজিবনগর সরকার। দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তাদের ভবিষ্যত সংগ্রাম হবে দুমুখী। একদিকে তাদের যুদ্ধ করতে হবে হানাদার পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্যদিকে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে 'মিত্র বাহিনীর' আধিপত্যবাদী চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে জাতীয় স্বাধীনতা হেফাজত রাখার জন্য।

চুক্তি ও স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কোলকাতাভিত্তিক আওয়ামী সরকার ও তাদের দোসররা সবাই দিন গুনতে লাগল কবে ভারতীয় বাহিনী আগ্রাসন চালিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে দেবে আর তারা ফিরে গিয়ে রাজত্ব করবে, উপভোগ করবে অসৎ উপায়ে লুটপাট করে অর্জিত ধনসম্পদ। ভারতীয় সরকারের স্বীকৃতি পাবার জন্য শুধু দাসখতই লিখে দেয়া হয়েছিল তাই নয়, স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রও প্রণীত হবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মূল চার নীতি (জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ) এর উপর ভিত্তি করে; সেই অঙ্গীকারও করেছিল মুজিবনগর সরকার।

আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও কর্নেল ওসমানী এবং মুক্তিযোদ্ধারা প্রবাসী সরকারকে রাজি করাতে পারেনি যে, আমাদের নিজেদের ত্যাগের মাধ্যমেই দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আমাদের সংগ্রাম নিজেদেরকেই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে বিজয় অব্দি। এর ফলেই অস্বাভাবিকভাবে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে একটি অপরিপক্ক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করলো প্রবাসী সরকার। মৈত্রি চুক্তি সই হবার পর এবং প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেবার পর আওয়ামী লীগ প্রবাসী সরকার ও নেতারা দিন গুনতে লাগলেন ভারতীয় আগ্রাসী আক্রমনের।

তথাকথিত মিত্রবাহিনীর কালো ছায়ার আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে যায় মুক্তিফৌজ এবং জনগণের বীরগাঁথা, আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতা

যৌথ কমান্ড স্থাপিত হলো কিন্তু মুক্তি ফৌজের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীকে সব ব্যাপারেই পাশ কাটিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করা হয়।

নভেম্বর মাসে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ব্যাপকভাবে। বর্ডারে সম্মুখ সংঘর্ষের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভারত সরকার ইতিমধ্যে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে পাক বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনে বাংলাদেশের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করেছে। গঠন করা হয়েছে মুক্তিফৌজ ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড। যৌথ কমান্ড গঠিত হবার পর ভারতীয় কমান্ডারদের প্রচন্ড প্রভাবে কর্নেল ওসমানী এবং তার হেডকোয়াটার্স প্রকৃত অর্থে অকেজো হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা এককভাবে ভারতীয় বাহিনীর ইষ্টার্ন কমান্ডই প্রণয়ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে কর্নেল ওসমানীকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যুদ্ধের আভাস পেয়ে জনাব ভুট্টোকে তার বিশেষ দূত হিসেবে চীনে পাঠালেন ভারতীয় যেকোন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য। কিন্তু পিকিংএ গণচীনের নেতৃবৃন্দ জনাব ভুট্টোকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, "পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপকে গণচীন পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার হীন চক্রান্ত হিসাবেই দেখবে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সাথে যেকোন সামরিক সংঘাতে নীতিগতভাবে তারা পাকিস্তানের পক্ষেই থাকবে।" একইসাথে জনাব ভুট্টোর মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী বর্তমান সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য। তাদের **Considered Opinion** ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র একটি যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমেই পাকিস্তানের অখন্ডতা বজায়ে রাখা সম্ভব। বল প্রয়োগ করে এই সমস্যার সমাধান কখনও সম্ভব হবে না। চীনা নেতৃবৃন্দের উক্তি থেকে দু'টো বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠে।

প্রথমত: গণচীন একদিকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার নিরসনের জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠিকে বাঙ্গালীদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান পেশ করার যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ দেন।

দ্বিতীয়ত: পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার কোন সমাধান করতে ব্যর্থ হলে সেই সুযোগে উপমহাদেশে ভারতীয় সমপ্রসারনবাদের নগ্ন থাবা বিস্তার করার চক্রান্তের ব্যাপারেও তারা বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করে দেন। কিন্তু দেশে ফিরে জনাব ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও সামরিক জান্তার কাছে চীনা নেতৃবৃন্দের বন্ধুসুলভ এবং যুক্তিসম্পন্ন অভিমতের অপব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, "ভারতের সাথে সামরিক সংঘর্ষে চীন পাকিস্তানকে সার্বিকভাবে সাহায্য করবে। প্রয়োজনে গণচীন প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতে দ্বিধাবোধ করবে না এ ধরণের আভাসই নাকি তিনি পেয়েছিলেন চীনা নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে একান্ত বৈঠকে।

পক্ষান্তরে ভারতীয় সরকার বুঝতে পেরেছিল গণচীন বাংলাদেশের ব্যাপারে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে। তাছাড়া সদ্য সমাপ্ত রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পাক-ভারত যুদ্ধে গণচীনের প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পরার সম্ভাবনা খুবই কম বলেও ধারণা পোষণ করছিল ভারত সরকার। এ ধরণের চিন্তা-ভাবনার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। এ অবস্থায় ঝটিকা অভিযান চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করে সেখানে তাদের পছন্দের সরকার কায়েম করতে পারা যাবে সহজেই। এ ধরণের বিশ্লেষনের পরই যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভারত সরকার।

যুদ্ধের জন্য অতি প্রয়োজনীয় আনুসাঙ্গিক সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেই সামরিক আগ্রাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত সরকার।

এবারের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট অতীতের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমান অবস্থায় বিশ্ব জনমত সামরিক জান্তার শ্বেতসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশীদের স্বাধীনতার পক্ষে। মানবাধিকার এবং শরনার্থীর প্রশ্নে সারা বিশ্বের সহানুভূতিও ভারতের পক্ষে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা গণচীন যদি **Geo-Strategic** কারণে কোন পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা করে তবে তাদের পরম শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিক্রিয়ায় 'মৈত্রী চুক্তির' আচ্ছাদনে নিশ্চুপ বসে না থেকে ভারতের পক্ষ নেবে নিশ্চিতভাবে ফলে বেধে যাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বর্তমানে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটা বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার দায়-দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিতে চাইবে কিনা যুক্তরাষ্ট্র অথবা গণচীন সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা পূর্ব পাকিস্তানের ৮কোটি জনগণ আজ পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে। মুক্তি বাহিনীর দেশব্যাপী প্রচন্ড তৎপরতায় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাক বাহিনীর অবস্থান সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত এবং যেকোন যুদ্ধের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাক্টর সৈনিকদের মনোবলও সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। খান সেনারা সার্বিকভাবে শুধু দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাই নয়; তাদের **Strategic Locations, Line Of Communication, Defensive Positions, Supply Points, Re-Enforcement Capabilities, Battle Tactics, Logistic Support Line** এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয়ে সব খবরা-খবরই এখন রয়েছে ভারতীয় বাহিনীর নখদর্পনে। এসব খবর সংগ্রহ করা হয়েছে মুক্তি বাহিনীর ইনটেলিজেন্স ইউনিট এবং সেক্টরগুলোর নিজস্ব গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারনের বিরোধিতার মুখে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমাদের জবরদখল আজ অযৌক্তিক হয়ে পড়েছে। শত্রুপক্ষের অবস্থা বর্তমানে **Totally Untenable.** প্রয়োজন শুধু সুযোগমত আক্রমণের ধাক্কা তাহলেই কেল্লা ফতে হবে। সুযোগ এসে গেল। ৩রা ডিসেম্বর বিকেল ৫:৪৫ মিনিটে আকস্মিকভাবে **Pakistan Air Force Pre-Emptive Stick** করে বসলো ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্ট্রাটেজিক টার্গেটগুলোর উপর। একইসাথে আঘাত হানা হল শীণগর, অভিন্তিপুর, পাঠানকোট, উত্তরলাই, যোধপুর, আম্বালা এবং আগ্রা বিমান ঘাটির উপর।

ঠিক সেই সময়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতায় এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিমান হামলার খবর তাকে দেয়ামাত্র তিনি মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐ জনসভাতেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক পাল্টা আক্রমণের ঘোষণা দিলেন। কোলকাতা থেকে সেদিন সন্ধ্যায় দিল্লী ফেরার আগেই ইষ্টার্ন কমান্ডের এওঈ **GOC (General Officer Commanding) Genarel Arora** -কে দিল্লীর সেনাসদর থেকে হুকুম দেয়া হল পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হামলা চালাবার জন্য। জেনারেল অরোরার অধিনে দেয়া হল ৩টি স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্মি কোর। ২য়, ৩৩শ এবং ৪র্থ কোর। এছাড়াও দেয়া হল 'কম্যুনিকেশন জোন হেডকোয়ার্টার্স' আরো একটি ভ্রাম্যমান আর্মি ইউনিট। এছাড়া ২য় কোরের অধিনে দেয়া হয়েছিল অতিরিক্ত একটি মিডিয়াম আর্মাড রেজিমেন্ট এবং একটি লাইট আর্মাড রেজিমেন্ট। এই কোরের কমান্ডার ছিলেন **Lt. Gen T.N.Raina** হেডকোয়ার্টার্স কৃষ্ণনগর। এই কোরের অধিনে দেয়া হয়েছিল অতিরিক্ত আরো একটি মিডিয়াম আর্টিলারী রেজিমেন্ট ও একটি ইঞ্জিনিয়ারস এর ব্রিজিং ইউনিট।

৩৩ কোরের কমান্ডার ছিলেন **Lt. Gen M.L.Thapa.** হেডকোয়ার্টার্স শিলিগুরী। এই কোরের অধিনে দেয়া হয়েছিল অতিরিক্ত একটি লাইট আর্মাড রেজিমেন্ট, একটি মিডিয়াম আর্টিলারী রেজিমেন্ট এবং একটি ইঞ্জিনিয়ারস এর ব্রিজিং ইউনিট।
১০১ কম্যুনিকেশন জোনের কমান্ডার ছিলেন প্রথমদিকে **Lt.Gen.Gill** পরে **Lt.Gen.Nagra** -কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। হেডকোয়ার্টার্স গৌহাটি। এই ফর্মেশনের ৪র্থ কোরের হেডকোয়ার্টার্স ছিল আগরতলায়। কোর কমান্ডার ছিলেন **Lt.Gen. Sagat Singh.** এই কোরের অধিনে অতিরিক্তভাবে দেয়া হয় একটি মিডিয়াম আর্টিলারী রেজিমেন্ট এবং দু'টো লাইট আর্মাড

রেজিমেন্ট। সব মিলিয়ে পূর্ব রনাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষেরও বেশি। তার সাথে ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণের রণসম্ভার। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত প্রায় ১ লক্ষ থানসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এ ধরণের বিশাল বাহিনী মোতায়ন করার প্রয়োজন ছিল না। এই বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল গণচীনের তরফ থেকে যদি কোন সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয় তার মোকাবেলা করার লক্ষ্যেই।

যাই হোক, প্রয়োজনীয় **Air** ও **Naval Cover** এবং প্রায় দুই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিশাল ভারতীয় বাহিনী একই সময়ে সব সেক্টর থেকে আক্রমণ চালালো। সব সেক্টরেই ভারতীয় বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার জন্য রাস্তা করে ব্রিজহেড তৈরী করে দিচ্ছিল মুক্তিবাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারাই। ঐ সমস্ত ব্রিজহেড তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল বলেই অতি সহজেই শত্রুপক্ষের ডিফেন্স ভেদ করে ঢাকা অভিমুখে তরিৎ গতিতে এগিয়ে যেতে পেরেছিল ভারতীয় মিত্র বাহিনী। যুদ্ধের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে কর্নেল ওসমানীকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে চলেছিল ভারতীয় সেনাকমান্ড। ভারতীয় সেনা বাহিনীর স্ট্রাটেজি ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শত্রুপক্ষের ডিফেন্স লাইন ভেদ করে তাদের **Withdrawal** এর পথ **Cut Off** করে তাদেরকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে পরাজিত করে ঢাকা অবরোধ করা এবং পাক বাহিনীকে সারেন্ডার করতে বাধ্য করা। বাংলাদেশে অবস্থিত পাক বাহিনী তাদের চেয়ে সংখ্যায় ৬-৭গুন বড় ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিফৌজের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে মাত্র ১২ দিনের যুদ্ধে অতি করুণ অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের জনগণের অসহযোগিতা এবং মুক্তি বাহিনীর দুঃসাহসিক গেরিলা তৎপরতা পাক বাহিনীর যুদ্ধস্পৃহা এবং মনোবল একদম নষ্ট করে দিয়েছিল। অন্য সব কারণের মধ্যে এটাই ছিল প্রধান কারণ যার জন্য পাকবাহিনীকে অতি অল্পসময়ের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। এভাবেই ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের ফলে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ।

১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে মুক্তিফৌজের কমান্ডার-ইন-চীফ এবং যৌথ কমান্ডের প্রধান কর্নেল ওসমানীর আমন্ত্রণে মিত্র বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল অরোরা স্বাধীন বাংলাদেশে আসবেন এবং যৌথ কমান্ডের তরফ থেকে **Instrument Of Surrender** এ যৌথ কমান্ডের শীর্ষ ব্যক্তি কর্নেল ওসমানীই সাক্ষর করবেন সেটাই ছিল সমগ্র জাতির প্রত্যাশা। কিন্তু ঘটনা ঘটে ঠিক তার বিপরীত। **Instrument Of Surrender** এ যৌথ কমান্ডের তরফ থেকে সাক্ষর দান করার সৌভাগ্য লাভ করলেন জেনারেল অরোরা। শুধু তাই নয় অদৃশ্য অঙ্গুলী হেলনে মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীকে ১৬ই ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক **Surrender Ceremony** -তে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত করা হল। কেন তাকে তার ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত করে সেদিন জেনারেল অরোরাকে সমগ্র জাতি এবং বিশ্ব পরিসরে বিজয়ী শক্তির একচ্ছত্র অধিকর্তা হিসেবে জাহির করা হল সে রহস্যের উদ্ঘাটন আজঅব্দি হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিশদ বিশ্লেষণের দাবিদার। এ থেকে জানা যাবে ভারতীয় নীল নকশা এবং প্রবাসী সরকারের নতজানু নীতির অনেক কিছুই।

কর্নেল ওসমানী চেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনিই অভিনন্দন জানাবেন মিত্র বাহিনীর জুনিয়র পার্টনার জেনারেল অরোরাকে। এতে করে বিশ্ব পরিসরে এটাই প্রমাণিত হবে মূলতঃ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচেষ্টাতেই স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ, ভারতীয় বাহিনী সহায়ক শক্তি হিসেবে সাহায্য করেছে মাত্র। কিন্তু ভারতীয় সরকার তার সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। উল্টো ভারত সরকার দাবি জানায় **Instrument Of Surrender**-এ সাক্ষর করবে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক। উদ্দেশ্য পরিষ্কার- বিশ্ববাসী জানুক পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতের বিজয়ের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতের দান। দুর্বল চিত্তের নতজানু প্রবাসী সরকার ভারতের সেই অযৌক্তিক দাবি মেনে নেয়। কিন্তু প্রচন্ড আত্মসম্মানবোধের অধিকারী আপোষহীন বঙ্গবীর কর্নেল ওসমানী নীতির প্রশ্নে অটল থেকে এ অন্যায়ের প্রতিবাদে নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা শহরে দেশবাসী দেখেছে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে বিজয়ীর বেশে। তাদের ঘিরে ছিল বিএলএফ, মুজিব বাহিনী এবং রাতারাতি গজিয়ে উঠা "**Sixteen Division**" এর সদস্যরা। কারণ সত্যিকারের মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের ঢাকা কিংবা দেশের বড়বড় শহরগুলোতে ঢুকতে দেয়া হয়নি নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ভারতীয় বাহিনীর প্রাধান্য জাহির করার জন্যই এ আদেশ জারি করা হয়েছিল। প্রকৃত মুক্তিফৌজের যোদ্ধারা ঢাকা এবং অন্যান্য শহরগুলোতে আসার অনুমতি পান ১৬ই ডিসেম্বরের অনেক পরে। এ ধরণের চক্রান্তের ফলে বিশাল ভারতীয় সেনা বাহিনীর আগমনে বাধাগ্রস্থ হয়ে শুকিয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের নিজস্ব ধারা। কালো ছায়ার আধাঁরে ঢাকা পরে গেল মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ। হারিয়ে গেল অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত তাদের জয়গাথাঁ। আচম্‌কা হোচট খেয়ে মুখথুবড়ে পড়ল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন হয়ে উঠল সুদূরপরাহত। ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে জাতি স্বাধীনতার সঠিক মূল্য অনুধাবন করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হল। এজন্যই আজঅব্দি ক্ষমতাবলয়ে যারা অবস্থান করছেন সে সমস্ত বুদ্ধিজীবি, সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে অতি কম দামে স্বাধীনতা এবং জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেবার ন্যাক্কারজনক প্রতিযোগিতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে যদি তার নিজস্ব ধারায় বয়ে যেতে দেয়া হত তবে দখলদার বাহিনীর পাশবিক নৃশংসতার শিকার হতে হত আরো অনেককেই, রক্তাহুতি দিতে হত প্রতিটি পরিবারকে। এভাবে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের প্রত্যেকের কাছেই হয়ে উঠতো এক অমূল্যধন। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে কষ্টার্জিত সেই পবিত্র স্বাধীনতাকে যেকোন ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই নস্যাৎ করে দিত পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা এবং ত্যাগী-সচেতন জনতা। দুর্ভাগ্য তৎকালীন দুর্বল রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরম বিশ্বাসঘাতকতায় খাঁদহীন বলিষ্ঠ জাতীয় চরিত্র গঠন করার নূন্যতম সময় ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সংবিধানের অধিনে জেনারেল ইয়াহিয়ার সরকারের **LFO (Legal Frame Work)** এর আওতায় পাকিস্তানের অখন্ডতা বজিয়ে রাখার ওয়াদা করে নির্বাচন করেন শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার প্রধান হবার জন্যই জনগণ তাকে সে নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর যোগসাজশে ২৫-২৬শে মার্চ রাতে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বাঙ্গালী জাতির উপর শ্বেত সন্ত্রাস চালিয়ে অস্ত্রের জোরে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচন হয়ে পড়ে অর্থহীন। বাংলাদেশের আপামর জনগণ পাকিস্তানী আচমকা হামলা ও শ্বেত সন্ত্রাসের বিরোধিতায় এবং দেশকে স্বাধীন করার জন্য স্বতঃস্ফুর্তভাবে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবেই ১৯৭০ সালের নির্বাচন তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা যখন মরণপন করে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন শেখ মুজিবর রহমান বন্দী হয়ে চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে। আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। সশস্ত্র সংগ্রামের কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না বলেই তাদের দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যেতে হয়। এরপর ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিজয়ের পিছনে রয়েছে সমগ্র জাতির অবদান। সেক্ষেত্রে এই জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বের একমাত্র দাবিদার হয়ে কোন যৌক্তিকতায় আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দলীয়ভাবে কব্জা করে নিল তার জবাব অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য।

১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডনে জনাব এ কে খন্দোকার ও মাঈদুল হাসানের মধ্যে প্রায় চার ঘন্টা দীর্ঘ এক আলাপ হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত সম্পর্কের মূল্যায়নের জন্য সেই আলোচনার সারাংশ এখানে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। যুদ্ধকালে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিফৌজের ডেপুটি চীফ অফ ষ্টাফ এবং জনাব মাঈদুল হাসান ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে একজন পরামর্শদাতা। তাদের

কথোপকথন থেকে বোঝা যায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্নেল ওসমানীকে বাইপাস করে মূলতঃ যোগাযোগ রক্ষা করতেন জনাব তাজুদ্দিন এবং খন্দোকার সাহেবের সাথে। যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে বেশিরভাগ আলোচনাও হত গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার সাহেবের সাথেই। জেনারেল অরোরা, ব্রিগেডিয়ার জ্যাকব, ব্রিগেডিয়ার গুপ্তই ছিলেন মূলতঃ তাদের **counter part.**

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে বীর বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধারা যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেন তার যথার্থ মূল্য ভারত কখনোই দিতে চায়নি। এ নিয়ে মুক্তি ফৌজের কমান্ডারদের সাথে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব শুরু হয় প্রথম থেকেই। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনার জন্য মুজিবনগরে (৮নং থিয়েটার রোড) কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে একটি হেডকোয়টার্স স্থাপন করা হলেও জনাব ওসমানীর কর্মক্ষমতা ছিল সীমিত। জুলাই মাস অব্দি মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডাররা হেডকোয়াটার্স এর কাছ থেকে তেমন কোন সাহায্যই পাননি সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য। বিভিন্ন সেক্টরে কমান্ডাররা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের উদ্যোগেই মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে এভিএম খন্দোকার বলেন, "আমি যখন কোলকাতায় গিয়ে পৌছলাম তখন দেখলাম যে, হেডকোয়াটার্সের সাথে সেক্টর কিংবা সাব-সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই এবং এ পর্যায়ে ভারত আমাদের সংগ্রামে তেমন কোন সাহায্যই দেয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে কোন সঠিক নীতিও গড়ে তুলতে পারেনি তারা। তবে তারা তখন চাচ্ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের ইস্যুটা জিইয়ে থাক। ভারতীয় নীতি নির্ধারকরা চাচ্ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের ধারাবাহিকতা এবং গতি-প্রকৃতি থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের বুঝে নিয়ে তারা তাদের নীতি চুড়ান্ত করবেন। চুড়ান্ত নীতি নির্ধারন করার সময় পর্যন্ত সমস্ত বিষয়টাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন তারা। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং সেনা বাহিনীর এ ধরণের মানসিকতার ফলে ভারতীয় সেনা বাহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর মধ্যে বৈরীভাব এবং রেষারেষি পরবর্তিকালে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গড়ে উঠা বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর মধ্যে যে ভারত বিরোধী মনোভাব দেখা যায় সেটা মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই **crystallize** করে।" এ প্রসঙ্গে জনাব খন্দোকার আরও বলেন, "মুক্তিফৌজ এবং ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে বিরোধ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লগ্ন থেকেই দাঁনা বেধে উঠেছিল বিভিন্ন কারণে। ঐ সেন্টিমেন্ট, আবেগ-অনুভূতি বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন **Disappointment** এর মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ আরো বেড়েছে।" মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার বলেছেন, "মে, জুন, জুলাই, আগষ্ট পর্যন্ত ভারতের **Involvement** ছিল অতি সামান্য। যা ছিল তা মোটামুটিভাবে মুক্তি বাহিনীর জন্য কিছু যৎসামান্য হালকা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ, কিছু লজিস্টিক সাপোর্ট এর বেশি কিছুই নয়। মুক্তিফৌজ কমান্ডারদের মূলতঃ শত্রুপক্ষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সম্ভারের উপর নির্ভর করেই চালিয়ে যেতে হচ্ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম।"

মুক্তিফৌজ সেক্টর কমান্ডারদের জুলাই মাসের কনফারেন্সের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, দুই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দিয়ে গেরিলা হিসেবে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানো হবে। এ প্রসঙ্গে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকারের বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "সেক্টর কমান্ডারদের মিটিং এর পর একদিন জেনারেল অরোরা এলেন। মিটিং হল। কর্নেল ওসমানীর সাথে সেই মিটিং এ আমিও উপস্থিত ছিলাম। মিটিং এ আলোচনার মূল বিষয় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে। কতজনকে ট্রেনিং দেওয়া হবে, কোথায় কোথায় ট্রেনিং দেওয়া হবে, কিভাবে ট্রেনিং দেওয়া হবে, কি করে রিক্রুটমেন্ট করা হবে, কতদিন ট্রেনিং দেওয়া হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। জেনারেল অরোরা প্রস্তাব দিলেন পাঁচ হাজার গেরিলা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করলেই হবে। শুনে কর্নেল ওসমানী এবং আমি দু'জনেই অবাক হয়ে গেলাম। আমি বলেই ফেললাম এত অল্প সংখ্যক গেরিলা দিয়ে কি হবে? জবাবে জেনারেল অরোরা বললেন, "**These are the people who will go inside, bleed the enemy and all those things.**" কর্নেল ওসমানী জেনারেল অরোরাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন তার দুই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা দরকার। সেক্টর

কমান্ডারদের সদ্য সমাপ্ত কনফারেন্সে সেটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। যাই হোক ট্রেনিং শুরু হল। ট্রেনিং শেষ করে গেরিলারা ফিরে আসল। কিন্তু তারপর একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিল। এ সমস্যাটার জন্য পুরোপুরি দায়ী ভারত সরকার।

ট্রেনিং এর পর ভারতীয় আর্মি সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের অধিনে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এতে ভীষণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল। ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের বিভিন্ন সেক্টর থেকে রিক্রুট করা হয়েছিল। ট্রেনিং-এর পর তারা নিজ নিজ সেক্টরে ফিরে গিয়ে তাদের প্রিয় সেক্টর কমান্ডারদের অধিনে যুদ্ধ করবে এটাই ছিল তাদের আশা। ভারতীয় সেনা কমান্ডারদের অধিনে যুদ্ধ করতে তারা রাজি হল না। ভারতীয় বাহিনী ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দেশের ভেতরে তাদের কমান্ডের আওতায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেটা আমাদের হেডকোয়াটার্সকেও জানতে দেয়া হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু কিছু জায়গায় জোর করে ইন্ডিয়ান কমান্ডাররা গেরিলাদের পাঠায় মূলতঃ লুটপাট করে নিয়ে আসার জন্য। যুক্তি হিসেবে তাদের বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধ চালাতে হাতিয়ার এর সাথে টাকা-পয়সারও প্রয়োজন রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা এ ধরণের অমানবিক অপারেশন এবং ইন্ডিয়ান আর্মির অধিনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে তাদের নিজ নিজ সেক্টরে পালিয়ে যায়। এর ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া **even at a later date was very bad** মুক্তিযোদ্ধারা **did not like the way Indian Army wanted them to be used.** অল্প সময়ের মধ্যেই সব সেক্টরে এ সম্পর্কে তিক্ততা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর মাঝে অবিশ্বাসের জন্ম হয়। এ খবর জানাজানি হয়ে যাবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের সেক্টর কমান্ডারদের দাবি অনুযায়ী আমাদের হেডকোয়াটার্স থেকে চাপ দেয়া হল, "আমাদের এই ট্রেইন্ড গেরিলাদের বাংলাদেশী কমান্ডারদের হাতে না দিলে **This will be a disaster and catastrophe.** বাংলাদেশের প্রশিক্ষিত গেরিলা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশী সেক্টর কমান্ডারদের হাতে দিতেই হবে।" এ সর্ম্পকে ভারতীয় মিলিটারী হাইকমান্ডের প্রথম থেকেই প্রচুর **reluctance** থাকা সত্বেও ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনিচ্ছাসত্বে নেহায়েত নিরুপায় হয়েই আমাদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য মুক্তিফৌজদের কাউন্টার ফোর্স হিসেবে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী ('র') এবং সেনা বাহিনীর মিলিত চেষ্টায় গঠিত হয়েছিল বিএলএফ। সে এক অন্য অধ্যায়।

ভারতীয় নেতৃত্বের এ ধরণের মনোভাবের দু'টো কারণ হতে পারে। প্রথমত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফিল্ড কমান্ডারস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভারত সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেনি। তাই তারা সবসময় মনে করত এদের উপর নির্ভর করা যায় না। দ্বিতীয়ত: তাদের মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত তাদের সরাসরি যুদ্ধের বিজয় ফল হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করবে বাংলাদেশ। তাই পাক বাহিনীকে দুর্বল করার জন্য গেরিলা বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে তাদের শুধু ব্যবহার করতে হবে সীমিত লক্ষ্যে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের বৃহৎ অংশ এবং সদস্যরা চেয়েছিলেন দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম পরিচালনা করে নিজেদের প্রচেষ্টায় তারা স্বাধীন করবেন তাদের মাতৃভূমি। কিন্তু তেমনটি হয়নি। আমার মনে হয় এখানেই মুক্তি বাহিনী এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও সেনা বাহিনীর মধ্যে একটা **Credibility Gap** হয়ে গেছে। আমাদের সামরিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ছিল পরিষ্কার, 'আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করব। বন্ধুরাষ্ট্র ভারত মুক্তিকামী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করলে আমরা অবশ্যই সে সাহায্যকে অভিনন্দন জানাব। কিন্তু **necessarily this is our struggle and we have to fight it ourselves.** তাছাড়া শুধু ভারত কেন? পৃথিবীর যে কোন দেশ আমাদের সংগ্রামে সাহায্য করতে চাইলে আমরা তা সানন্দে গ্রহণ করব। মোটকথা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে ভারত ও আমাদের মধ্যে **approach of mutual confidence** ছিল না বা কখনো গড়ে উঠেনি **because of their overall policy.** একথাও সত্য যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক সেক্টরে ইন্ডিয়ান কমান্ডারদের কার্যকলাপে মুক্তিযোদ্ধাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টিও হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সত্যিকথা বলতে গেলে

৯ই আগষ্ট রুশ-ভারত চুক্তি সই হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদের চেষ্টায়। ৯ই আগষ্টের পরই ভারত সরাসরিভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করে এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে ইন্ডিয়ান আর্মি **really really started taking closer interest.''**

মাঈদুল হাসান এ পর্যায়ে জিজ্ঞেস করেন, ''ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া বাংলাদেশ বোধ হয় স্বাধীনতা পেত না, কি বলেন?'' খন্দোকার সাহেব মাঈদুল হাসান সাহেবের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, ''যদিও মুজিবনগরের অনেকে এমনকি আমাদের মন্ত্রীসভার অনেকেই হতাশা বোধ করতেন, সংসদ সদস্যদের অনেকেই ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ নিয়ে ফিরে যাবার চিন্তা-ভাবনাও করছিলেন। মুক্তি বাহিনীর তৎপরতায় আস্থাহীন হয়ে হতাশা বোধ করতেন। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের কথা শুনলেই আতঁকে উঠতেন। ভাবতেন কি হচ্ছে! দেশে বোধ হয় আর ফিরে যাওয়া যাবে না। এ ধরণের পরিস্থিতিতেও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম, মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতা বেড়ে গেলে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে বলে যুক্তির অবতারণা করে যারা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের গতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন তাদের সে যুক্তি ছিল সম্পূর্ণ ভুল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পক্ষান্তরে আমরা যদি আমাদের সংগ্রামের তীব্রতা প্রথম থেকেই বাড়াতে সক্ষম হতাম তবে আমাদের প্রচন্ড গেরিলা তৎপরতার মুখে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মসর্মপন করতে হত মুক্তি ফৌজের কাছে। কারণ **They had no chance to fight. Their moral was completely shattered and the losses would have been unacceptable to them.** (সংবাদ ২৬শে মার্চ ১৯৯০)।

জনাব মাঈদুল হাসান জবাবে বলেছিলেন, ''আপনার চিন্তা-ভাবনায় যুক্তি থাকলেও ভারতীয়রা ভেবেছিলেন অন্যরকম। তারা চেয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে ছোট করে দেখাতে এবং বিশ্ব পরিসরে পাক-ভারত যুদ্ধের ফল হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে। এতে ভারত এক ঢিলে দুই পাখি বধ করতে সক্ষম হয়।
প্রথমত: ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়ে নিজেকে উপমহাদেশের প্রধান সামরিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় ভারত।

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রাখার যৌক্তিকতা অর্জন করে।

আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানো হল; আদর্শিক দেউলিয়াপনা, কোন্দল এবং ভাংগন

ক্ষমতায় বসানো হলো আওয়ামী লীগকে

যদিও দেশ স্বাধীনতা লাভ করে ১৬ই ডিসেম্বরর ১৯৭১ কিন্তু সৈয়দ নজরুল ইসলামের প্রবাসী সরকার এবং মন্ত্রিসভার আগমন ঘটে ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭১-এ।

ঢাকায় এসেই তাজুদ্দিন সরকার ঘোষণা করে, "তাদের সরকার বিপ্লবী সরকার। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই তাদের লক্ষ্য।" যদিও ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সমাজতন্ত্রের কোন অঙ্গীকার ছিল না। সমাজতন্ত্রের শৃঙ্খলে বাংলাদেশের জনগণ কখনোই নিজেদের বন্দী করতে আগ্রহী ছিল না। তাদের সর্বকালের দাবি ছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার। জনাব প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল তৎকালীন প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলো। ১৯৭২ সালের ১৭ই জানুয়ারী বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দল অন্যান্যদের সাথে প্রশ্ন তোলে। তারা বলে, "আওয়ামী লীগ সরকার বিপ্লবী সরকার হতে পারে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি বিপ্লবই হয়ে থাকে তবে সে বিপ্লব শুধু আওয়ামী লীগই করেনি, করেছে এ দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ। আর তাই সকল দলের প্রতিনিধি নিয়েই গঠন করতে হবে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সরকার।" তাদের এ দাবি যুক্তিসঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ভারতীয় সাহায্যে প্রবাসকালের একলা চলো নীতিই ধরে রাখে। মস্কোপন্থী মোজাফফর ও মনিসিং গং ক্ষমতার অংশ না পেয়েও যুদ্ধকালীন সময় থেকেই তাদের বিদেশী মুরুব্বীদের ইচ্ছানুসারে আওয়ামী লীগ সরকারের লেজুড়বৃত্তি করতে থাকে নির্লজ্জভাবে। ভারতীয় রাজনীতিতে সিপিআই যেভাবে কংগ্রেসের লেজুড়ে পরিণত হয় ঠিক সে অবস্থাই হয়েছিল মোজাফফর ন্যাপ এবং মনিসিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টির বাংলাদেশের রাজনীতিতে।

কিন্তু সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির ফলে প্রফেসর মোজাফফর আহমদ (মোজাফফর ন্যাপের প্রেসিডেন্ট) আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করেও অবস্থার চাপে ১০ই মে চট্টগ্রামে জাতীয় সরকার কায়েমের দাবি তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের তাত্ত্বিক দেউলিয়াপনা

জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এবং মুজিববাদীদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই।

শ্রেণীগতভাবে আওয়ামী লীগ ছিল বুর্জুয়া এবং পাতি বুর্জুয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারি দল। কিন্তু এই দলে জাতীয়তাবাদী, প্রগতিশীল এবং সমাজতন্ত্রীরাও ছিল।এ কারণে বিপরীতমুখী চিন্তা-ভাবনা দলে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অসন্তুষ্টি এবং সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ প্রচার করেছেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা খাঁটি সমাজতন্ত্রই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে অন্য কিছু নয়। তার এসব বক্তব্য ও প্রচারণাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরের ক্ষমতার অর্ন্ত-দ্বন্দ্বগুলো ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান সমস্যার মোকাবেলার জন্য ১৯৭২ সালের ১০ইমে চট্টগ্রামে এক জনসভায় আওয়ামী লীগের লেজুড় দল ন্যাপের সভাপতি জনাব মোজাফফর আহমদ সর্বদলীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানাতে বাধ্য হন।

আগেই বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অনাস্থা ও যুদ্ধত্তোর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি যে কোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ উপদেষ্টা ভারতের অন্যতম কূটনীতিবিদ জনাব ডিপি ধরের পরামর্শে এবং বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতায় মুক্তি বাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্বাবধানে গড়ে তোলা হয়েছিল বিএলএফ পরবর্তিকালে মুজিব বাহিনী।

বাংলাদেশের চারজন ছাত্রনেতা ভারতীয় সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই চতুরঙ্গ তোফায়েল, রাজ্জাক, শেখ মনি ও আব্দুর রাজ্জাক পরবর্তিকালে বাংলাদেশের 'চার খলিফা' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তাদেরই একজন জনাব তোফায়েলকে দিয়ে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ এ ঘোষণা করা হল, "মুজিববাদ কায়েম করব। মুজিববাদের চার স্তম্ভঃ **গণতন্ত্র**, **সমাজতন্ত্র**, **জাতীয়তাবাদ** এবং **ধর্মনিরপেক্ষতা**।" তিনি মুজিববাদের একটি ব্যাখ্যাও দিলেন। তিনি বললেন, "মহান মার্কিন নেতা আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার জনগণকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কিন্তু সমাজতন্ত্র দিতে পারেননি। কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রের স্থপতি কিন্তু তার দর্শনে ছিল না গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা। মুজিববাদে রয়েছে দু'টোই গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। সুতরাং মুজিববাদ বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ কিংবা রাজনৈতিক দর্শন।" তিনি আরো বলেন, "পুজিঁবাদ ও কম্যুনিজমের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে মুজিববাদ কায়েম করে সোনার বাংলা গড়ে তোলা হবে।" তিনি বাংলাদেশের জনগণকে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে 'জাতীয় বিপ্লব' আখ্যা দিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। জনাব তাজুদ্দিনকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যই জনাব তোফায়েলের মাধ্যমে মুজিববাদ নামক এক উদ্ভট এবং অদ্ভূত রাজনৈতিক দর্শনের উপস্থাপনা করা হয়। ৩রা জানুয়ারী ১৯৭২ সালে পাকিস্তান সরকার এক ঘোষণার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে বলে খবর প্রচার করে।

যুব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে ফিরেই মুজিব পরিবারের অনুকম্পা ও সহানুভূতি লাভের আশায় জনাব তাজুদ্দিন আহমদ সম্পর্কে কদর্য্য প্রচারণা নতুন করে শুরু করেন। তারা বলেন, "শেখ মুজিবের প্রতি তাজুদ্দিনের কোন আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের কৃতিত্বের দাবিদার তিনি একাই হতে চান।" তারা আরো বলেন, "শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষক সেটাও জনাব তাজুদ্দিন স্বীকার করেন না। তাছাড়া শেখ মুজিবকে উপেক্ষা করার আর একটি নজির এই যে, তিনি তাকে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী না করে ক্ষমতার অভিলাষে নিজেকেই প্রধানমন্ত্রী বানান এবং শেখ

মুজিবকে শুধুমাত্র সাংবিধানিক ক্ষমতাহীন রাষ্ট্রপতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার উদ্দেশ্য সৎ হলে তিনি শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে নিজে উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রবাসী সরকার পরিচালনা করতে পারতেন।"

এমনিভাবে তাজুদ্দিনের প্রতি শেখ মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের মন বিষিয়ে তুলেছিলেন তারা। শেখ মনির এতে মুখ্য ভূমিকা ছিল। শেখ মুজিব বাংলাদেশে ফেরার পর উল্লেখিত নেতৃবৃন্দ শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে আরো সক্রিয় হয়ে উঠেন। শেখ মুজিব যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রাম কালের নয় মাস নির্বাসিত ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে সেই অনুপস্থিতির পুর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন তারা। তার সামনে কেঁদে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ার নাটক করে এদের অনেকেই বলেছিলেন, "আপনার ভাবমুর্তি ও নেতৃত্ব রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাজুদ্দিনের বিরাগভাজন হয়েছি আমরা। তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। শেখ কামালকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি। শুধু আমাদের বিরোধিতায়ই সেটা সম্ভব হয়নি। আমরা জোর করে তাকে মুজিবনগর হেডকোয়াটার্স এ কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসাবে রেখেছিলাম।" আরো অনেক কিছু বলে তার কান ভারী করতে সক্ষম হয়েছিলেন কুচক্রী ক্ষমতালিপ্সু যুব নেতৃবৃন্দ। শেখ মুজিব তাদের কথার সত্যতা যাচাই করার সুযোগ পেলেন না। কেননা, তার পরিবারের সদস্যগণ আরো রূঢ় ভাষায় তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে তাদের মনের খেদ প্রকাশ করেন শেখ মুজিবের কাছে। এর ফলেই দেশে ফেরার মাত্র একদিন পরই ১১ই জানুয়ারী ১৯৭২ শেখ মুজিব তার দীর্ঘ দিনের পরীক্ষিত সহকর্মী জনাব তাজুদ্দিনকে অপসারন করে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসলেন। জনাব তাজুদ্দিনকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে বাদ না দিলেও তাকে সব ব্যাপারে সম্পুর্ণ উপেক্ষা করে চলতে লাগলেন শেখ মুজিব। প্রশাসনিক ব্যাপারে আবার তিনি যুব নেতৃবৃন্দের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। ফলে যুব নেতৃবৃন্দ জাতীয় পরিসরে সর্বময় ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হল। কিন্তু শেখ মুজিবের এ ধরণের আচরণে মনোক্ষুন্ন হলেন দলের বর্ষিয়ান নেতারা।

ছাত্রলীগের বিভক্তি আওয়ামী লীগেও টানাপোড়নের সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জাতি হয় বিভক্ত।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি দেশের জন্য এ ধরনের বিরোধ ছিল মারাত্মক ক্ষতিকর।

১৯৭২ সালের প্রায় গোড়া থেকেই মুজিববাদ নিয়ে ছাত্রলীগের মাঝে দেখা দেয় সংকট। সৃষ্টি করে অনৈক্য। '৭২ সালের ১২ই মে ছাত্রলীগের চার নেতা খোলাখুলিভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পরেন। জনাব রব ও শাহজাহান সিরাজ বললেন, "মুজিববাদে তারা বিশ্বাসী নন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই আসিবে জনমুক্তি।" অপরদিকে আব্দুল কুদ্দুস মাখন ও নূরে আলম সিদ্দিকী ঘোষণা দিলেন, "যে কোন মূল্যে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।" অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সংকট দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে মুজিববাদী ও মুজিববাদ বিরোধী ছাত্রদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে যখন দুই গ্রুপই আলাদাভাবে মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। শেখ মুজিব অবশ্য মাখনদের সম্মেলনই নিজে উদ্বোধন করেন।

ছাত্রলীগের ভাঙ্গনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক লীগেও কোন্দল ঘনীভূত হয়। ফলে শ্রমিক লীগও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। মুজিববাদ বিরোধী ছাত্রলীগ এবং তাদের সমর্থক শ্রমিক লীগ তৎকালীন গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠনের আহ্বান জানান। তখন থেকেই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। একদিকে মুজিববাদ অপরদিকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। আসম রব ১৯৭২ সালের ৩রা মার্চ এক ভাষণে বলেন, "জীবনে সকল ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের জন্য জাতি যখন আর একটি বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঠিক সে মুহূর্তে বেশ কিছু সংখ্যক সরকারি আমলা, শিল্পপতি, আওয়ামী লীগসহ কিছু রাজনৈতিক লোকজন জাতীয় বিপ্লবের নামে আমাদের এই প্রস্তুতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছে এবং গণবিরোধী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে চলেছে। ৮ই মার্চ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তিনি আরো বলেন, "পতাকা বদল হলেই জনগণের মুক্তি আসে না, তার জন্য দরকার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী।" এর জবাবে '৭২ সালের ৫ই মে ছাত্রলীগ (মুজিববাদী) নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, "মুজিববাদের প্রতি হুমকি বিপ্লবীদের সমাজতন্ত্রের প্রতিই হুমকি স্বরূপ।" ২৩শে মে '৭২ তৎকালীন আওয়ামী সেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান এবং পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুর রাজ্জাক দিন তারিখ দিয়ে ঘোষণা করেন, "৭ই জুন থেকে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দেশব্যাপী আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে।" ১৩ই জুন গৃহিত এক প্রস্তাবে মাখন সিদ্দিকী গ্রুপ দাবি করে, "**মুজিববাদের চার নীতির উপর ভিত্তি করে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে।**" ৬ই জুলাই তোফায়েল আহমদ কুমিল্লার এক জনসভায় ঘোষণা করলেন, "যারা বিদেশী মতবাদ প্রচার করছেন তারা দেশের জনগণের বন্ধু নয়, তারা জাতীয় শত্রু। মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সব সমস্যার সমাধান এবং মুজিববাদ দেশে সমৃদ্ধির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।" একই জনসভায় জনাব আবদুর রাজ্জাক বলেন, "আমরা বিশ্বকে দেখিয়ে দেবো কিভাবে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে।" ১৬ই জুলাই নেতা জিল্লুর রহমান বললেন, "মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব। মুজিববাদ বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকঙ্খার প্রতীক। এর বাস্তবায়নের মধ্যেই মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি নিহিত।" একই দিনে ঢাকায় মাখন সিদ্দিকী গ্রুপ ছাত্রলীগের এক সভায় গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয়, "মাওবাদী বিভ্রান্ত নেতৃত্ব, সিআইএ-র এজেন্ট দল ও ছাত্রলীগ নামধারী বহিস্কৃত নেতৃত্ব, পলাতক আলবদর, আলশামস, রাজাকার, শান্তি কমিটির মেম্বার, মুসলিম লীগারস, জামায়াত, নেজাম, জমিয়তে ওলামা, পিডিপি সহ প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বানচাল করতে চায়।"

২৪শে জুলাই '৭২ ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দী উভয় গ্রুপের মধ্যে বায়তুল মোকাররমে গোলাগুলি হল। ২১শে জুলাই ছাত্রলীগ মুজিববাদী অংশের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সম্মেলনে শেখ মুজিবের

উপস্থিতিতেই মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করা হয়। একই দিন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্রলীগ রব গ্রুপের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পল্টন ময়দানে। সেই সম্মেলনে জনাব আসম রব ঘোষণা করেন, "কার্ল মার্কসের পর সমাজতন্ত্রের কোন নতুন সংজ্ঞা কেউ দিতে পারে না। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার রূপরেখাই চূড়ান্ত এবং আমাদের এই বাংলাদেশে সেই সমাজতন্ত্রই কায়েম করা হবে।" জনাব রব দৃঢ়ভাবে বললেন, "মুজিববাদের ককটেল কোন সমাজতান্ত্রিক রূপরেখা নয়।" ২৪শে জুলাই ৭২ মুজিববাদী ছাত্রলীগের একটি মিছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পল্টন ময়দানে রব গ্রুপ ছাত্রলীগের একটি সভার উপর চড়াও হয়। তাদের হামলায় জনাব রবসহ শতাধিক ছাত্র আহত হন। পরে আহতদের একজন ছাত্র হাসপাতালে মারা যায়।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার পড়াশুনার জন্য একশতটি বৃত্তি দেয়। মেধা অনুসারে একশত জন ছাত্র নির্বাচিত হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। ৮ই জুলাই নির্বাচিত তালিকা থেকে হঠাৎ করে অন্যায়ভাবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৪১ জনকে বাদ দিয়ে নতুন করে তাদের জায়গায় অন্য ৪১ জনকে নির্বাচিত করা হয়। মুজিববাদে বিশ্বাসী ছিল না বলেই প্রথম নির্বাচিত ৪১ জনকে বাদ দেয়া হয়। ইতিমধ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়েও মুজিববাদকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। নেতাদের বিবৃতি বক্তব্যে এ বিরোধ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৭২ সালের ১৮ই জুলাই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী চট্টগ্রামে ঘোষণা করলেন, "গণতন্ত্রের নীতি ও আদর্শেই দেশ পরিচালিত হবে।" তার একদিন আগে ঠাকুরগাঁয়ে এক জনসভায় লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী বললেন, "মুজিববাদের চার নীতি দ্বারাই দেশ চালিত হবে।" তার কয়েকদিন পর ৩১শে জুলাই আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটিতে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে মুজিববাদ কায়েমের শপথ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়। ১২ই আগষ্ট অর্থমন্ত্রী ও প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ভাওয়ালের এক জনসভায় বললেন, "সমাজতন্ত্রের প্রতি বাধা আসলে গণতন্ত্র ত্যাগ করব।" ২০শে আগষ্ট আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুর রাজ্জাক বললেন, "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ধার করা আদর্শ এবং মাওবাদী চক্রান্ত।" রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, "গণতন্ত্র কায়েম হবে!" মন্ত্রী বলেন, "সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনে গণতন্ত্র ত্যাগ করব!!" শীর্ষ নেতা শেখ মুজিব বলেন, "দু'টাকে মিলিয়ে মুজিববাদ কায়েম করা হবে!!!" এভাবেই দেশে সৃষ্টি করা হল আদর্শগত বিভ্রান্তিকর এক চরম অবস্থা। আর এ বিভ্রান্তির ফলে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগই নয় সমস্ত জাতি হল দ্বিধা-বিভক্ত।

জনগণ পরিণত হয় শত্রুতে

পাকিস্তান এখন নেই। কিন্তু শত্রুর প্রয়োজন। শত্রু হল জনগণ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় অস্থানীয়দের স্থলে বাংলাদেশী বুর্জুয়াদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ দেখা শুরু করলেন। ঠিক যেভাবে পাকিস্তানীরা দেখতো তাদের আপন স্বার্থ। পাকিস্তান শেষ হয়ে গেছে। তা যাক, কিন্তু শত্রুতো থাকতে হবে। শত্রু এখন কে? শত্রু এখন জনগণ। জনসাধারনের পক্ষের শক্তিকে উৎখাত করার তৎপরতা চালানো হল সরাসরিভাবে। তেমনি চললো তাদেরকে নিজেদের লেজুড়ে পরিণত করার চক্রান্ত। জনগণ যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। তারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার এবং নিজেদের বাচাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে। তাই তাদেরকে শুধু ধোকা দেবার জন্যই সমাজতন্ত্রকে আওয়ামী লীগ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল নিজেদের স্বার্থেই।

বাংলাদেশ নামে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু শাসক বুর্জুয়াদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটল না। তাদের চরিত্রে রয়ে গেল মুৎসুদ্দী ধামাধরার প্রবণতা। আমেরিকা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। কোন অবস্থাতেই ভবিষ্যতে মার্কিন সাহায্য বাংলাদেশ গ্রহণ করবে না এই সাহসী সরকারি ঘোষণা মুজিবনগরে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে তার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেই বলতে বাধ্য হলেন যে তিনি মার্কিন সাহয্য গ্রহণ করবেন। যুদ্ধের সময় ভারত বিরোধী ছিলেন যেসব বিত্তবানেরা তাদের বেশিরভাগই ভারতপ্রেমিক হয়ে দাড়ালেন রাতারাতি। প্রতিযোগিতার দৌড় শুরু হল ভারতীয় মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী গোষ্ঠির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে অল্প সময়ে চোরাকারবারের মাধ্যমে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবার। যে আওয়ামী লীগ চিরকাল ছিল মার্কিন ঘেষা, আমেরিকার প্রশ্নে যেখানে সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানীর থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে, সেই আওয়ামী লীগ এর এতটুকু কষ্ট হল না সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুরাগী হয়ে পড়ে ভারতের সাথে চুক্তির দাসখত লিখে দিতে। মুলকথা মুরুব্বী চাই। ‘স্বাধীন হয়েও স্বাধীন নয়, স্থানীয় বটে তবে জাতীয় নয়’ প্রকৃতির আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের নীতি গ্রহণ করেছিল জাতীয় অর্থনীতিকে তাদের দলীয় নিয়ন্ত্রণে নেবার জন্যই। রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে পাকিস্তানী বণিক সম্প্রদায় এবং শিল্পপতিদের পরিত্যক্ত ব্যবসা কেন্দ্র এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের পার্টির সদস্য ও সহযোগীদের পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। ব্যবসা-বানিজ্যের লাইসেন্স পারমিটও দেয়া হয় অব্যবসায়ী অনভিজ্ঞ পার্টি টাউটদের। অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দলীয় সদস্যদের নব্য পুঁজিপতি হবার সুযোগ করে দেয়া হল সেই আদিম পদ্ধতিতে। এভাবেই একাত্তরের আগের অধ্যায়ে পাকিস্তানীরা লুট করেছে বাংলাদেশকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমাজতন্ত্রের ধুর্মজাল সৃষ্টি করে শুরু হল বাঙ্গালী নব্য পুজিঁপতিদের লুন্ঠন। গরীব দেশবাসী আরো গরীব হল। জাতীয় অথনৈতিক মেরুদন্ড গেল ভেঙ্গে। রুশ-ভারতের চাপে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হিসেবে গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রের অসাড়তাই প্রমাণ করেছিল আওয়ামী লীগ।

সোভিয়েত নৌ বাহিনীর বহর চট্টগ্রাম বন্দর দখল করে নেয়

যুদ্ধের সময় তাজুদ্দিন পুরোপুরিভাবে রুশ-ভারতের প্রভাবাধীন ছিল, পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিব ও সেই বলয়েরই প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই দেশে ফিরে এসে শেখ মুজিব বাংলাদেশকে পূর্বের সুইজ্যারল্যান্ড বানাবার ঘোষণা দিয়ে মূলতঃ ভারতের একটি করদ রাজ্যেই পরিণত করলেন সদ্যমুক্ত বাংলাদেশকে। তিনি চালনা এবং চট্টগ্রামের বন্দর পরিষ্কারের অজুহাতে সোভিয়েত ও ভারতীয় নৌ বাহিনীকেও আমন্ত্রন জানান। সোভিয়েত ও ভারতীয় নৌ বাহিনী বন্দর ও সমুদ্র সীমার বিশাল অংশ তাদের দখলে নিয়ে নেয় এবং ঐ অঞ্চল অন্যদের এমনকি বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের জন্যও "নিষিদ্ধ এলাকা" বলে ঘোষণা দেয়। সোভিয়েত এবং ভারতীয় নৌ বহর দীর্ঘ দুই বৎসরকাল চট্টগ্রামে অবস্থান করে। ক্রমান্বয়ে খবর বের হতে থাকে এই দুই নৌ বাহিনীর সদস্যরা বন্দরের খাড়ি পরিষ্কারের নামে সন্দেহজনক বিভিন্ন তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশকে ইন্দো-সোভিয়েত বলয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন শেখ মুজিব।

বিরোধী পক্ষের উপর নির্যাতন শুরু হল

বিরোধী পক্ষের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে গর্বের সাথে শেখ মুজিব বললেন, "রাষ্ট্র বিরোধী দুঃস্কৃতিকারীদের হুশিঁয়ার করে দিচ্ছি, প্রয়োজনে আমি লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া দিব।" সরকার ও সরকারি দলের প্রভাবশালী নেতাদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন বাহিনীগুলোর প্রতিই ছিল তার এই ইঙ্গিত।

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের উপর বর্বর নির্যাতন শুরু হয়। এ নির্যাতনে শুধু রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের বিভিন্ন বাহিনীই অংশগ্রহণ করেনি, তাতে অংশ নেয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিভিন্ন লাঠিয়াল ও বেআইনী সশস্ত্র পেটোয়া বাহিনী। রাজনৈতিক নির্যাতন ও হয়রানির অভিযোগ তোলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, কাজী জাফর আহমদ, ছাত্রলীগের রব-সিরাজ গ্রুপ। তারা আওয়ামী সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাড়াবার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানান। তারা বিবৃতি সমাবেশের মাধ্যমে বলেন, "বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ও সংগ্রামী ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ শক্তিকে শেষ করে দেবার জন্য মাত্র ৯মাস আগে নির্যাতন এবং পুলিশ ও সেনা বাহিনীর বেপরোয়া গুলি চালানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠতেন যারা; ক্ষমতায় আসীন হয়ে গত মাসেই প্রায় ডজনখানেক জায়গায় ছাত্র-জনতার সমাবেশে ও মিছিলে গুলি চালিয়েছেন তারা। শুধু তাই নয়, ক্ষমতাসীন দল দখলদার বাহিনীর দালালদের সহায়তায় প্রশাসন যন্ত্রকে প্রভাবিত করে ছাত্র, বিরোধী দলীয় কর্মী ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করে তাদের গ্রেফতার করছেন। রাজনৈতিক নেতারা রাজধানী থেকে সরকারি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কর্মী, ছাত্র, যুবকদের শায়েস্তা করার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে তাদের অযথা হয়রানি করছেন।"

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়ির দোর গোড়ায় মুজিববাদের বাণী পৌছে দেয়ার জন্য আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। আঞ্চলিক, জেলা এবং মহকুমা পর্যায়ের নেতাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়নে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যদের বাশের লাঠির মাধ্যমে জঙ্গি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।" এরপর ট্রেনিং শুরু হয়। ইতিমধ্যে আওয়ামী-লীগের নেতা জনাব আব্দুল মান্নান এক লক্ষ লোকের এক সমাবেশের আয়োজন করেন ১লা মে ১৯৭২-এ এবং ঐ সমাবেশে তিনি ঘোষণা দেন, "আগামী ৯ই জুন থেকে তার অনুসারীরা জাতীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে।" তিনি সরকারের কাছে দাবি জানান যাতে করে তার বাহিনীর সদস্যদের এ্যারেষ্ট, সার্চ, ইন্টারোগেশন এবং শাস্তি দেবার ক্ষমতা দেয়া হয়। এভাবে মুজিব ভক্তরা সবাই আইনকে নিজেদের হাতে নেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। এক সভায় স্বয়ং শেখ মুজিবর রহমান অতি দম্ভের সাথে তার সমালোচকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি আমার লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া দেব।" ইঙ্গিতটি ছিল আওয়ামী লীগের বেসরকারি বাহিনীগুলোর প্রতি। শ্রমিকলীগের নেতার ঐ অভিযান শুরু হওয়ার ৭দিনের মাথায় খুলনায় পুলিশ ও লালবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ঐ ধরণের সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিসি'তির আরো অবনতি ঘটে। ঐ সমস্ত ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের বাহিনীর হাতে নাজেহাল হতে থাকে সাধারণ নিরীহ মানুষ।

অবস্থার এতই অবনতি ঘটে যে, আওয়ামী লীগের 'বি' টিম হিসেবে পরিচিত মোজাফফর ন্যাপও ঐ ধরণের ঔদ্বত বন্ধ করার জন্য সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়। জনাব মোজাফফর আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন, "স্বেচ্ছাসেবক এবং একটি রাজনৈতিক দলের অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরা অন্যায়ভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনের দায়রার বাইরে গিয়ে

ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র এবং শ্রমিক সংগঠনগুলো ঐ ধরণের বর্বরতা করে চলেছে অবিরাম। তারা ইচ্ছানুযায়ী কারফিউ জারি করে স্থানীয় প্রশাসনকে অবজ্ঞা করে লোকজনকে ধরে তথাকথিত আদালতে তাদের বিচারের নামে অমানুষিক জুলুম করছে। প্রশাসন এবং পুলিশ রহস্যজনকভাবে ঐ ধরণের কার্যকলাপের ব্যাপারে নিরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে।" তিনি জনগণের প্রতি আবেদন জানান যাতে করে ঐক্যবদ্ধভাবে তারা ঐ সমস্ত অন্যায় ও অসহনীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলেন।

মেজর জলিল (বীর উত্তম) বন্দী হলেন

মেজর জলিল ছিলেন একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা, ভারতীয় বাহিনীর লুটপাটে তিনি বাধা দিয়েছিলেন।

পাকিস্তান আর্মির সারেন্ডারের পর ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে হাতিয়ার, গোলাবারুদ, যুদ্ধ সরঞ্জাম, কলকারখানার মেশিনপত্র সবকিছুই লুট করে ভারতে পাচাঁর করতে থাকে। মেজর জলিল এ সমস্ত লুটপাটের বিরোধিতা করেন। তার সাহসিকতা অন্যান্য সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদেরও "মিত্র বাহিনীর" লুটপাটে বাধা প্রদানে উৎসাহিত করে তোলে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তার ঐ ধরণের কর্মকান্ডের জন্য সরকার তাকে বন্দী করে। ষড়যন্ত্রের জাল ফেলে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সমগ্র জাতি সরকারের ঐ ধরণের আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১১ই মার্চ বরিশালে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের এক বিশাল সমাবেশে তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেবার জোর দাবি উত্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোরালো দাবি উত্থাপিত হয়েছিল সেনা বাহিনীর তরফ থেকেও। এর প্রতিক্রিয়ায় সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করে, "তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে এবং আর্মি রুলস এর অধিনেই তার বিচার করা হবে।" সরকারের ঐ ঘোষণার পর বিক্ষোভ আরো বৃদ্ধি পায়। আর্মি, মুক্তিযোদ্ধা এবং জনগণ ক্ষেপে উঠে। প্রচন্ড গণচাপের মুখে সরকার বাধ্য হয় মেজর জলিলকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে।

১লা জানুয়ারী ১৯৭৩, ঢাকার রাজপথ আবার রক্তে রঞ্জিত হলো

প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের গুলিতে দু'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে প্রাণ দিতে হয়।

১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐ দিন ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে মস্কোপন্থী বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন "ভিয়েতনাম দিবস" পালনের ডাক দেয়। এ উপলক্ষে ঐ দিন ছাত্র ইউনিয়ন এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি প্রেসক্লাবের বিপরীত দিকে অবস্থিত তৎকালীন মার্কিন তথ্য সার্ভিস ইউএসআইএস (ইউসিস) দফতরের সামনে এসে ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে কাদুঁনে গ্যাস বা লাঠিচার্জ ছাড়াই নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী বিনা উস্কানিতে ছাত্র মিছিলের উপর বর্বরোচিতভাবে গুলি চালায়। গুলিতে নিহত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ দর্শনের (অনার্স) ছাত্র মতিউল ইসলাম ও মীর্জা কাদেরুল ইসলাম নামক অপর আর একজন ছাত্র। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশ্যে রাজপথে পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়ে আসে পরের দিনের সংবাদপত্রগুলিতে। নূরুল আমিন, আইয়ুব খান, মোনেম খান, ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান আমলে তাদের নির্যাতনমূলক গণবিরোধী স্বৈরশাসনের জন্য ধিকৃত হয়েছিল জনগণের কাছে। একই ন্যাক্কারজনক বর্বরতার জন্য এদেশের মানুষ ধিক্কার দিল আওয়ামী লীগ সরকারকে।

স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের পরই আওয়ামী লীগ সরকারের এহেন প্রকাশ্যে ছাত্র হত্যা হতবাক করে দিয়েছিল দেশবাসীকে। উৎকন্ঠায় আতংকিত হয়ে পড়ে তারা। প্রেসক্লাবের বারান্দায় দাড়িয়ে থাকা সাংবাদিকরা স্তব্ধ হয়ে অবলোকন করেন পুলিশের বর্বরোচিত প্রাণহানিকর আচরণ। সেদিন পুলিশী নির্যাতনের হাত থেকে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফাররাও রেহাই পাননি। মুজিব সরকারের পুলিশ বাহিনী উপস্থিত প্রেস ফটোগ্রাফারদের হাত থেকে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলে নির্মমভাবে। সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টাঙ্গাইলের আব্দুল মান্নান এই পুলিশী সন্ত্রাসের ব্যাপারে কোন বিবৃতি দেবারই প্রয়োজন বোধ করেননি সেদিন। গুলি চালনার খবর মুহুর্তে ছড়িয়ে পড়ে পুরো শহরে। ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট, যানবাহন সব কিছুই বন্ধ হয়ে যায় সারা শহরে। স্বতঃস্ফুর্তভাবে হাজার হাজার লোক ছুটে আসে ইট দিয়ে ঘেরা রক্তে রঞ্জিত রাজপথের অংশ দেখার জন্য। শহরের অলিতে-গলিতে মানুষ পুলিশের পাশবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মৌন মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পরদিন ২রা জানুয়ারী এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সারাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঐদিন প্রফেসর মোজফফর আহমদ ঘোষণা করলেন, "আওয়ামী লীগের ছাত্র হত্যা ইয়াহিয়া-মোনেম স্বৈরাচারী সরকারের কার্যকলাপেরই নামান্তর। আমরা দেশবাসীর দাবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আশু পদত্যাগ দাবি করছি।" তিনি আরো বলেন, "নূরুল আমিন সরকারের ভাগ্যে যে পরিণতি ঘটেছিল, শেখ মুজিবের ভাগ্যেও সেই একই পরিণতি অনিবার্য।"

শেখ মুজিবকে দেয়া “বঙ্গবন্ধু” খেতাব উঠিয়ে নেয়া হয় এবং একই সাথে তার “ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ” ও বাতিল করা হয়।

৩রা জানুয়ারী পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত এক সভায় ইউনিয়নের নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ঘোষণা করেন, “দরকার হলে আরো রক্ত দেব। তবুও সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় সরকারকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবই।” ঐ সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি সেলিম ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ থেকে শেখ মুজিবর রহমানকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। এবং সদস্যপদ বই থেকে সংশ্লিষ্ট পাতাটি জনসভায় ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেন।

রাজনীতির পরিহাস, ১৯৭২ সালের ৬ই মে এই ছাত্রনেতাই শেখ মুজিবর রহমানকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। জনাব সেলিম ডাকসুর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে প্রদত্ত **“বঙ্গবন্ধু”** উপাধিও প্রত্যাহার করে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন, “সংবাদপত্র, টিভি ও বেতারে শেখ মুজিবের ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি ব্যবহার করা চলবে না।” তিনি বাড়িতে, অফিস-আদালতে ও দোকানে টানানো শেখ মুজিবর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলারও আহ্বান জানান।

১৯৭৩ সালের নির্বাচন

৭ই মার্চ ১৯৭৩, প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এক পাতানো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন সর্ম্পকে দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক গণকন্ঠের প্রতিবেদনে সন্ত্রাস, গুন্ডামি, নির্যাতন, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পোলিং এজেন্ট প্রহৃত, খুন প্রভৃতির খবর ছাপা হয়। ৮ই মার্চের দৈনিক সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কয়েকটি খবরের শিরোনাম ছিল :

"সিলেট-১ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই",
"পটুয়াখালীতে ব্যালট পেপার ছিনতাই",
"চট্টগ্রামে ৩১টি ব্যালট পেপারসহ ২ব্যক্তি গ্রেফতার",
"ধামরাইতে রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাস",
"ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে",
"নির্বাচন দারুন অবাধ হয়েছে",
"একজন একাধিকবার অবাধে ভোট দিতে পেরেছে",
"জাসদের দু'জন কর্মী হাইজ্যাক",
"ঢাকার একটি কেন্দ্রে সন্ত্রাস ও গুলি",
"পটিয়ায় ভোট সন্ত্রাসী-মাস্তানরাই দিয়েছে",
"কুমিল্লা শহরে ব্যাপক সন্ত্রাস",
"নির্বাচন প্রহসনে পরিণত",
"কালিগঞ্জে সন্ত্রাস",
"রাজশাহী ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস",
"ভোট নাট্যের দু' দৃশ্য" প্রভৃতি।

৯ই মার্চ ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য্য এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, "কমপক্ষে ৭০টি আসনে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সুনিশ্চিত বিজয়কে শাসকদল ক্ষমতার চরম অপব্যবহার, ভুয়া ভোট, পোলিং বুথ দখল, পোলিং এজেন্ট অপহরণ, বিদেশী সাহায্য সংস্থা, জাতিসংঘ, সরকারি গাড়ি ও রেডক্রসের গাড়ির অপব্যবহার প্রভৃতি চরম অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের মাধ্যমে উক্ত নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে এবং বিরোধী দলের প্রার্থীদের জোর পূর্বক পরাজিত করেছে।"

৯ই মার্চ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাসদ সভাপতি মেজর (অবঃ) জলিল বলেন, "**প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব যেভাবে নির্বাচনের সময় প্রচলিত কোন ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না করে সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন এতে আমি তাকে জাতির পিতা বলতে ঘৃনাবোধ করি।**"

তিনি আরো বলেন, "নির্বাচনের দিন গণভবনেই নির্বাচনী কন্ট্রোলরুম স্থাপিত হয়েছিল এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিরোধী দলের প্রার্থীরা যখন ভোট গননায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই অকস্মাৎ বেতার টেলিভিশনে এই সকল কেন্দ্রের ফলাফল প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সন্দেহজনকভাবে দীর্ঘ সময় পর নিজেদের পছন্দসই ভোটের সংখ্যা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।" জাসদ সভাপতি আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সরকারকে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের তাবেদার বলে অভিহিত করে তাদের নির্বাচনী বিজয়কে হিটলার, মুসোলিনী, চিয়াংকাই সেকের বিজয়ের সঙ্গে তুলনা করেন।

৯ই জুলাই প্রেসক্লাবে ভাসানী ন্যাপের তৎকালীন সহ-সভাপতি ডাঃ আলিম আল রাজি বলেন, "ক্ষমতাসীন সরকার এক দলীয় স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিগত নির্বাচনে ক্ষমতার প্রকাশ্য অপব্যবহার, সন্ত্রাস সৃষ্টি, শক্তি প্রয়োগ করে ভুয়া ভোটদান, বিপুল অর্থ ব্যায়, বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে।" বিরোধী দলগুলো যাতে জনগণের কাছে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করতে না পারে সেজন্য ক্ষমতাসীন দল তাদের নিজস্ব রক্ষীবাহিনী, লালবাহিনী, নীলবাহিনীর হাতে বিপুল অস্ত্র দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণকে ভোটাদানে বিরতই শুধু করেনি; হয়রানির এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি সকল প্রচার মাধ্যম সরকারি দলের দলীয় স্বার্থে যদেচ্ছা ব্যবহারের উল্লেখ করে প্রচার মাধ্যমকে এক "ব্যাবিলিয়ন ক্যাপটিভ প্রেস" বলে অভিহিত করেন। জানুয়ারীতে প্রকাশ্যে রাজপথে দু'জন ছাত্র হত্যার কথা উল্লেখ করে ডাঃ রাজি বলেন, "ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন মুজিব সরকার যেভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, দু'শ বছরের ইতিহাসে তার নজির নেই।" তিনি হুশিঁয়ারীও উচ্চারণ করে বলেন, "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যত অন্ধকার।" নীল নকশার আওতায় সুপরিকল্পিত উপায়ে জনগণের সকল মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্র ছিনিয়ে নেবার উক্ত প্রচেষ্টা পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে সত্য হয়ে উঠে।

একতরফা পাতানো খেলার নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯১টিতে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রামের একটি কেন্দ্র থেকে প্রথমে ন্যাপের মোশতাক আহমদ চৌধুরীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলেও পরে তাকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়। সবকয়টি বিরোধী দল এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। মোশতাক আহমদ চৌধুরী এই নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি রীট আবেদন করেন। সম্পূর্ণ আইন বিভাগ তখন পুরোপুরিভাবে দলীয় স্বার্থের অনুগত বিধায় মোশতাক চৌধুরীর রীটের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সুবিচার পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১০ই মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় লীগের প্রবীণ নেতা জনাব আতাউর রহমান খান নির্বাচন প্রচারাভিযানের সময়, নির্বাচনের দিন ও ফলাফল ঘোষণার পর তার নির্বাচনী এলাকা ধামরাইতে সংগঠিত আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ নেতা কর্মী ও রক্ষীবাহিনীর সার্বিক সন্ত্রাসকে "দুঃস্বপ্নের কালোরাত্রি" বলে আখ্যায়িত করেন।

১১ই মার্চ যুবলীগের নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, "৭ই মার্চের নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, তারা রাজাকার, আল বদর, স্বাধীনতার শত্রু। এইসব বিদেশী চরদের মুজিববাদের নিড়ানী দিয়ে উৎখাত করা হবে।" পরদিন বায়তুল মোকাররমে শেখ ফজলুল হক মনি মুজিববাদ বিরোধীদের উৎখাত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনার কথা ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন- শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল ৩০ হাজারেরও বেশি লোককে। দেশপ্রেমিক বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, শ্রমিক নেতা, ছাত্রসমাজ, আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবর্গও এই শ্বেতসন্ত্রাসের হাত থেকে রেহাই পাননি। জাতীয় পরিসরে যেখানেই কেউ স্বৈরশাসনের বিরোধিতা করেছেন অথবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তাকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে নতুবা তাকে হতে হয়েছে অকথ্য নির্যাতনের শিকার।

যারাই প্রতিবাদ করেছিল, মৃত্যু অথবা অমানুষিক নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল তাদের।

১৯৭৩ সালের মধ্যেই যারা স্বৈরাচার এবং আওয়ামী অপশাসনের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছিল তাদের কে মৃত্যু কিংবা অকথ্য নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়।

১৯৭৩ সালে ঐ সময়ের উপমহাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক সাংবাদিক জনাব আবুল মনসুর আহমদ দৈনিক ইত্তেফাকে বিভিন্ন বিষয়ে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে অসীম সাহসের পরিচয় দেন।

'আজ আর একচেঞ্জ অব হার্ট নয়, চাই চেক অব হার্ট' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি বলেন, "মানুষের হৃদয়ের চার চেম্বারের মতই আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতির সকল ক্ষেত্রেই চারটি করিয়া চেম্বার আছে। প্রথমত: আমাদের সংবিধান দাড়াইয়া আছে চারটি স্বতন্ত্র মজবুত মূল নৈতিক খুঁটির উপর। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ (জাতীয়তা তন্ত্রই বেশি শুদ্ধ হইত) ও ধর্মনিরপেক্ষতা (এখানেও তন্ত্রযোগ করিলে ভাল হইত)। এই চারটি নৈতিক খুটিকে "স্বতন্ত্র" বলিলাম এই দন্ডে যে, সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, ওই চারটি খুঁটি এক ঘরের খুঁটি হইতে পারে না। খুঁটিগুলির উচ্চতা সমান নয় বলিয়াই তারা এক ঘরের খুঁটি হইতে পারে না। নীতি ও পন্থা হিসাবে এই চার বস্তুর মিল নাই একথাই বোধ করি সমালোচকরা বলিতে চান। তার মানে হৃদপিন্ডের চারটি চেম্বারের মধ্যে যেমন সহযোজক দরজা (কানেকটিং ভালব) আছে, আমাদের চার নীতির মধ্যে তেমন কোন কানেকটিং ভালব নাই। তারপর সংবিধানের বেলাতেও আমরা প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে টানিয়া বুনিয়া চারি চক্রে আনিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং যথাসম্ভব সফলও হইয়াছি। অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেটিভ ও জুডিশিয়ারী এই তিনটি ইন্সটিটিউশনকে 'নির্বাহী বিভাগ', 'আইন বিভাগ' ও 'বিচার বিভাগ' নামে সংবিধানে গুঞ্জায়েস করিয়াছি সত্য; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে যা অত্যাবশ্যক অথচ সংবিধানের কর্মবিভাগ বা দেশরক্ষা বিভাগে যার বিধান করা সম্ভব ছিল না; সেই রূপ একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করিয়া আমরা রাষ্ট্রকে চারটি শক্তি স্তম্ভের উপর দাড় করাইয়াছি। এই চারটি শক্তি স্তম্ভের সাথে পাঠকগণ চারটি মূলনীতি স্তম্ভের সাথে তালগোল পাকাইয়া ফেলিবেন না।"

তার ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধে শিল্পকারখানা সর্ম্পকে জনাব আবুল মনসুর আহমদ লেখেন, "হৃদয়ের চার চেম্বারের অনুকরণে আমরা শুধু আমাদের জাতীয় জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, পার্টি জীবনে ও সামাজিক জীবনে চার-বর্ণের প্রবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। অর্থনৈতিক জীবনেও উহার সম্প্রসারন করিয়াছি। 'মিনস অফ প্রডাকশন' অর্থাৎ উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানাকে সংবিধানেই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। যথা: রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা। এই তিন শ্রেণীর মালিকানা ছাড়া আর সব সম্পত্তি যা প্রডাকটিভ নয়, সেগুলি অটোম্যেটিক্যালী ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকার ব্যবস্থা করিয়া গোটা সম্পত্তি জগতকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া হৃদয়ের চার চেম্বারের সামাঞ্জস্য বিধান করিয়াছি। যাতে মিল কারখানাদির 'মিনস্ অফ প্রডাকশনকে' হরতাল স্ট্রাইকারদের দ্বারা আনপ্রডাকটিভ করিয়া অন্য প্রকার মালিকানার সৃষ্টি করিতে কেউ না পারে এবং ঐ পন্থায় চার প্রকার মূলনীতিতে যাতে কেউ বত্যয় ঘটাইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আমরা হরতাল-স্ট্রাইককে ন্যাশনালাইজ করিয়া ফেলিয়াছি। সরকারি দল ছাড়া অপর সকলের হরতাল স্ট্রাইক নিষিদ্ধ করিয়াছি।"

প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক প্রশ্নে একই প্রবন্ধে জনাব আবুল মনসুর আহমদ বলেন, "হৃদয়ের চার চেম্বারের প্রতি আমাদের এই সামগ্রিক ও সার্বজনীন আকর্ষণ দেখিয়া বিদেশী বন্ধুরা বিস্মিত

হইতে পারেন। কিন্তু তাদের সেই বিস্ময় সেই মুহূর্তেই কাটিয়া যাইবে যখন তারা জানতে পারিবেন যে, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতার নেতৃত্ব কেবলমাত্র আমাদের হৃদয়ের উপরই নির্ভরশীল। আমাদের নেতা প্রেমিক; তিনি দেশবাসীকে ভালোবাসেন; দেশবাসী তাকে ভালোবাসে। এ দেশে নেতা আর জনতার মধ্যে ভালোবাসা-বাসি ছাড়া আর কোন বৈষয়িক স্বার্থের সম্পর্ক নাই। পুরোটাই হৃদয়ের ব্যাপার। তাই হৃদয়ের চার চেম্বারের সাথে মিল রাখিয়াই আমাদের সামগ্রিক জীবনকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। হৃদয়ের অনুকরণেই আমাদের রাষ্ট্রীয় আর্থিক জীবনকে উপরের তলা নীচের তলা এই দুই তলা বিশিষ্ট করিয়াছি। হৃদয়ের অনুকরণেই আমরা উভয় তলাতেই অর্থাৎ অবিকল ভেনট্রিকস উভয়টাতেই লেফট রাইট রাখিয়াছি। সাধারণত: নেতার ভালোবাসা-বাসির ব্যাপারই হৃদয়ের চার চেম্বারের প্রতি আমাদের আসক্ত করিয়াছে ঠিকই। কিন্তু চারের প্রতি আকৃষ্ট হইবার আমাদের আরও কারণ আছে। আমাদের রাষ্ট্র সেক্যিউলার হইলেও আমরা নিজেরা আজও ধর্মবিরোধী হই নাই। ধর্মনিরপেক্ষ হইয়াছি মাত্র। আমাদের মধ্যে বিপুল মেজরিটি লোকই মুসলমান। আমরা মুসলমানেরা এখনও ধর্ম ছাড়ি নাই। তাই চারের মায়াও ছাড়িতে পারি নাই। আমাদের চার কিতাব, চার কলেমা, চার ফেরেশতা, চার মাযহাব, চার খলিফা, চার ইমাম এ অবস্থায় রাষ্ট্রের চার মূলনীতি, সমাজের চার মালিকানা নীতি, পলিটিকস এ চার পার্টি নীতি। এসবে আমাদের আকর্ষণ সহজাত। শুধু মুসলমানরা হইবে কেন? আমাদের দেশের হিন্দুদের ধর্মেও চারের প্রাধান্য রহিয়াছে। তাদের চার বেদ, চার বর্ন, চার যুগ এমনই চার যোগও আছে। এইভাবে আমরা চারের গোলকধাধাঁয় ঢুকিয়াছি। সরকারি দফতরে চার তাসের কর্মচারী বহাল হওয়ায় বাজারে আমরা চার কায়দায় ব্যবসা চালু করিয়াছি। কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, মজুতদারী ও চোরাচালানী আমরা ছাড়তে পারি না এই চারের মায়াতেই।

হার্টের চার চেম্বারের সবচেয়ে বড় ত্রুটি দেখা দিয়াছে 'জাতির পিতা' ও তার সন্তানদের সর্ম্পকের মধ্যে। জাতির পিতা তার সন্তানদের ভালোবাসেন, সন্তানরাও পিতাকে ভালোবাসে। সবাই পিতাকে অন্তর দিয়া ভালোবাসে বলিয়াই তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিণামে খুন-খারাবী। জাতির পিতা খুন-খারাবী বন্ধ করিতে সন্তানদের প্রথমে অনুরোধ পরে নির্দেশ অবশেষে ধমক দিয়েছেন। কিন্তু সন্তানেরা পিতার কথা শুনিতেছে না। পিতা ও কঠোর হইয়া সন্তানদের শাস্তি দিতে পারিতেছেন না। এটা ঘটিতেছে হৃদয়ের জন্যই। বিশেষত: হৃদয়ের চারটি চেম্বারের দোষেই। জাতির পিতা সকলের কল্যাণের জন্য যতই চেঞ্জ অফ হার্টের কথা বলিতেছেন সন্তানেরা ততই স্টেনগানের সাহায্যে এক্সচেঞ্জ অফ হার্ট করিতেছে। এটা অধিক দিন চলিতে দিলে সকলেরই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে।" এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর জনাব মনসুরের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মহল থেকে নানারকমের কটুক্তি শুরু হয়।

’৭১ এর চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, আওয়ামী কুশাসন এবং প্রতিরোধ

সংসদে সংবিধান গৃহিত হয়

১০ই এপ্রিল ১৯৭২ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিতাপের বিষয় ঐ সংসদের সব সাংসদরাই ছিলেন পাকিস্তানের সংবিধান এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এলএফও-এর আওতায় নির্বাচিত।

মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সংবিধান গঠনের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, “বর্তমান সংসদ গঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালের **LFO (Legal Frame Work)** এর অধিনে সংগঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের **LFO** মোতাবেক নির্বাচিত জাতীয় সংসদের দায়িত্ব ছিল পাকিস-ানের সংবিধান প্রণয়ন করা। আওয়ামী লীগ দল হিসাবে ছয় দফার ভিত্তিতে জনগণের কাছ থেকে ভোট গ্রহণ করেছিল। ছয় দফার দাবি ছিল পাকিস্তানের ভৌগলিক অখন্ডতা বজিয়ে রেখে প্রদেশ ভিত্তিক পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন কায়েম করা। অতএব স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কোন বৈধ অধিকার তাদের নেই। তিনি সর্বদলীয় জাতীয় কনভেনশন গঠন করে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জানান। তিনি বলেন, জাতীয় কনভেনশনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিই থাকবে না তাতে বিভিন্ন সংগঠন যাদের সদস্যরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রতিনিধিদেরও অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। এ ধরণের জাতীয় কনভেনশনের দ্বারা প্রণীত সংবিধান পরে গণভোটের মাধ্যমে গৃহিত হবে।”

আওয়াশী লীগ সরকার ঐ প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে ১২ই অক্টোবরের সংসদ অধিবেশনে তৎকালীন আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন প্রণীত সংবিধান গৃহিত হয়। যদিও সংবিধানে সরাসরিভাবে মুজিববাদের উল্লেখ ছিল না তবুও মুজিববাদের মূলনীতির উপর তথা ভারতীয় সংবিধানের নীতিমালার উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান বা শাসনতন্ত্র।

সরকার ঘোষণা করলো দেশে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করা হবে কিন্তু সংবিধানের ৪২নং ধারার মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানা বজিয়ে রাখা হলো। ৩৫, ৩৭, ৩৯ নং ধারার মাধ্যমে অতি চতুরতার সাথে মানুষের মানবিক অধিকারসমূহ কেড়ে নেয়া হলো। আওয়ামী লীগ বিরোধী শক্তিকে অতি নির্দয়ভাবে উৎপাটন করার জন্য সংবিধানে ৬৩(৩) ধারা সংযোজিত করে। ‘জননিরাপত্তার’ নামে আইয়ূব শাহীর বর্বরোচিত আচরণের মতই মুজিবের নেতৃত্বে বিনা বিচারে আটক এবং মিল কারখানায়, অফিস-আদালতে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার বিধানও সংবিধানে রাখা হয়।

শেখ মুজিব গণতন্ত্রকে হত্যা করে

সর্বশেষে শেখ মুজিব তার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য গণতন্ত্রকে হত্যা করে জাতির উপর বাকশালী একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগের (বাকশাল) একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বীজ নিহিত ছিল ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ রক্ষীবাহিনী আদেশ জারি করার মধ্যে।

জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে বিনা ওয়ারেন্টে ধরপাকড় এবং তল্লাশীর ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল ঐ আদেশের মাধ্যমে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির মুখে ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে প্রেসিডেন্ট জাষ্টিস আবু সাইদ চৌধুরীকে বিদায় নিতে হয়। ১৪ই জানুয়ারী ১৯৭৪ সংসদ অধিবেশন বসে। আব্দুল মালেক উকিলকে স্পীকার হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। ২৪শে জানুয়ারী ১৯৭৪ 'হ্যা' ভোটের মাধ্যমে জাতীয় রক্ষীবাহিনী আইন পাশ করা হয়।

১৩রা জানুয়ারী ১৯৭৫ সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। একই দিন বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারি করা হয় এবং সংবিধানের কতিপয় ধারা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ৬ই জানুয়ারী '৭৫ এক ঘোষণায় বলা হয় যে, সরকারি কর্মচারীরা সমবায় সমিতি ছাড়া অন্য কোন সংগঠনের সদস্য হতে পারবে না। এছাড়া ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দেয়ালের সব পোষ্টার মুছে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর ২০শে জানুয়ারী বসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংগঠিত সেই কলঙ্কিত অধিবেশন। ২৫শে জানুয়ারী সংসদে কোন রকমের বির্তক ছাড়া গণতন্ত্রকে পুরোপুরি সমাহিত করে পাশ করানো হয় চতুর্থ সংশোধনী। মাত্র এক বেলার সেই অধিবেশনে স্পীকার ছিলেন জনাব আব্দুল মালেক উকিল।

চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা সংসদ সদস্য না হলে ভোট দিতে পারবেন না। প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সংসদ সদস্য হবেন তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মন্ত্রী পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন, তবে রাষ্ট্রপতি তা কার্যকর করলেন কি করলেন না সে সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। ঐ অধিবেশনে 'জরুরী ক্ষমতা বিল' কোন আলোচনা ছাড়াই আইনে পরিণত হয়ে যায়। ২৫শে জানুয়ারী দুপুর ১:১৫ মিনিটে এক সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে জারিকৃত চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়, "এই আইন প্রণয়নের পূর্বে যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন না এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে। শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন। এই আইন প্রবর্তনের ফলে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন এমনিভাবে যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধিনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি ও একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তার অধিনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে যে ক্ষমতা নির্ধারণ করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র সেই ক্ষমতাই প্রয়োগ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতিকে তার দায়িত্ব পালনে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে। রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনায় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে কিংবা সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্য এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন প্রধানমন্ত্রী ও আবশ্যক মনে করলে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করতে এবং কার্যাবলীতে অংশ নিতে পারবেন তবে তিনি যদি সংসদ সদস্য না হন তাহলে ভোট দান করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন অথবা তার নির্দেশে উপ-রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে

পারবেন। মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সংশোধিত সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে দেশে শুধু একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা জাতীয় দল নামে অভিহিত হবে। সংশোধনীতে কার্যভারকালে তার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।" জাতীয় দলের ঘোষণায় বলা হয়, "কোন ব্যক্তি জাতীয় দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠন কিংবা ভিন্ন ধারার কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।"

ঐ সংশোধনীর পক্ষে ২৯৪ জন সাংসদ ভোট দেন। কেউ বিরোধিতা করেননি। সংসদের ২ঘন্টা ৫মিনিট স্থায়ী ঐ অধিবেশনে স্পীকার ছিলেন আব্দুল মালেক উকিল। বিলের বিরোধিতা করে তিনজন বিরোধী ও একজন স্বতন্ত্র সদস্য ওয়াক আউট করেন। এরা হলেন জাসদের আবদুল্লাহ সরকার, আব্দুস সাত্তার ময়নুদ্দিন আহমেদ ও স্বতন্ত্র সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আতাউর রহমান খান আগেই সংসদ অধিবেশন থেকে বেরিয়ে আসেন। বিলটি উত্থাপন করা হলে আওয়ামী লীগের দলীয় চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার প্রেক্ষিতে কোন প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ না দেবার আহ্বান জানান। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের জনাব আতাউর রহমান খান বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোচনার সুযোগ দানের জন্য স্পীকার জনাব মালেক উকিলকে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্পীকার তা নাকচ করে দেন। পরে কন্ঠভোটে চীফ হুইপের প্রস্তাব গৃহিত হয়। তারপর আইনমন্ত্রী মনরঞ্জন ধর সংসদে 'জরুরী ক্ষমতা বিল ১৯৭৫' পেশ করেন। চীফ হুইপ এ ক্ষেত্রেও মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণ বিধি প্রয়োগ না করার আবেদন জানালে বিষয়টি কন্ঠভোটে পাশ হয়। এখানে একটি বিষয় বিশেষ প্রানিধানযোগ্য। যদিও বিলটি সংসদে বিনা বাধায় পাশ হয়; তবে গণতন্ত্রের বিকল্প একনায়কত্বের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যেও দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী '৭৫ রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান এক আদেশবলে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' বা 'বাকশাল' গঠন করেন এবং নিজেকে দলীয় চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন। ঘোষণার ৩নং আদেশে বলা হয়, "রাষ্ট্রপতি অন্য কোন নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের দলীয় সকল সদস্য, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সবাই 'বাংলাদেশ-কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের' সদস্য বলে গন্য হবেন।"

এ আদেশ অমান্য করে বাকশালে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বঙ্গবীর জনাব ওসমানী ও ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন তাদের সাংসদ পদে ইস্তফা দেন।

বাকশালীরা

বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী এবং জনাব মঈনুল হোসেন যখন বিরোধিতা করে পদত্যাগ করেন তখন সুযোগ সন্ধানীদের অনেকেই বাকশাল এ যোগদান করার জন্য লাইন দিয়েছিল।

বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ ও মোজাফফর ন্যাপ শেখ মুজিবের এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নকে অভিনন্দন জানান। তথাকথিত জাতীয় দল গঠিত হওয়ার ফলে দেশের সব রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটে। আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ এবং মনি সিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টি সামগ্রিকভাবে বাকশালে যোগদান করেন। সংসদের বিরোধী দলের ৮জন সদস্যের মধ্যে ৪জন বাকশালে যোগদান করেন। প্রবীণ নেতা জনাব আতাউর রহমান খানও বাকশালে যোগদান করে সুবিধাবাদী চরিত্র ও রাজনীতির এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ২রা জুন '৭৫ বাকশালে যোগদানের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের কাছে ৯জন সম্পাদক আবেদন পেশ করেন। তারা হলেন বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদক ওবায়েদুল হক, জনাব নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বজলুর রহমান, মর্নিং নিউজের সম্পাদক জনাব শামছুল হুদা, বাসস এর প্রধান সম্পাদক জাওয়াদুল করিম, বাংলাদেশ টাইমস ও বাংলার বাণীর নির্বাহী সম্পাদক শহীদুল হক, দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং বিপিআই সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান। ৬ই জুন '৭৫ বাকশালের সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। তাতে দলের মহাসচিব মনোনীত হন মনসুর আলী। সচিব হন জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি, এবং আব্দুর রাজ্জাক। ঐ দিন বাকশালের কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য হিসাবে ১১৫জনের নাম ঘোষণা করা হয়। তাতে উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনী প্রধানরা, বিডিআর এর মহাপরিচালক, রক্ষীবাহিনীর পরিচালক, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রমুখকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

দলের কার্যনির্বাহী পরিষদে থাকেন: (১) শেখ মুজিবর রহমান (২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (৩) মনসুর আলী (৪) খন্দোকার মোশতাক আহমেদ (৫) আবু হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (৬) আব্দুল মালেক উকিল (৭) অধ্যাপক ইফসুফ আলী (৮) মনরঞ্জন ধর (৯) মহিউদ্দিন আহমেদ (১০) গাজী গোলাম মোস্তফা (১১) জিল্লুর রহমান (১২) শেখ ফজলুল হক মনি (১৩) আব্দুর রাজ্জাক।

কেন্দ্রিয় কমিটিতে থাকেন: (১) শেখ মুজিবর রহমান (২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (৩) মনসুর আলী (৪) আব্দুল মালেক উকিল (৫) খন্দোকার মোশতাক আহমেদ (৬) কামরুজ্জামান (৭) মাহমুদ উল্লাহ (৮) আব্দুস সামাদ আজাদ (৯) ইউসুফ আলী (১০) ফনিভূষণ মজুমদার (১১) ডঃ কামাল হোসেন (১২) সোহরাব হোসেন (১৩) আব্দুল মান্নান (১৪) আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (১৫) মনোরঞ্জন ধর (১৬) আব্দুল মতিন (১৭) আসাদুজ্জামান (১৮) কোরবান আলী (১৯) ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক (২০) ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (২১) তোফায়েল আহমেদ (২২) শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (২৩) আব্দুল মোমেন তালুকদার (২৪) দেওয়ান ফরিদ গাজী (২৫) অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী (২৬) তাহের উদ্দিন ঠাকুর (২৭) মোসলেম উদ্দিন খান (২৮) মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (২৯) একেএম ওবায়দুর রহমান (৩০) ডঃ ক্ষিতিশচন্দ্র মন্ডল (৩১) রিয়াজুদ্দিন আহমদ (৩২) এম বায়তুল্লাহ (৩৩) রুহুল কুদ্দুস সচিব (৩৪) জিল্লুর রহমান (৩৫) মহিউদ্দিন আহমদ এমপি (৩৬) শেখ ফজলুল হক মনি (৩৭) আব্দুর রাজ্জাক (৩৮) শেখ শহীদুল ইসলাম (৩৯) আনোয়ার চৌধুরী (৪০) সাজেদা চৌধুরী (৪১) তসলিমা আবেদ (৪২) আব্দুর রহিম (৪৩) ওবায়দুল আউয়াল (৪৪) লুৎফর রহমান (৪৫) একে মুজিবর রহমান (৪৬) ডঃ মফিজ চৌধুরী (৪৭) ডঃ আলাউদ্দিন (৪৮) ডঃ আহসানুল হক (৪৯)

রওশন আলী (৫০) আজিজুর রহমান আক্কাস (৫১) শেখ আবদুল আজিজ (৫২) সালাহউদ্দিন ইউসূফ (৫৩) মাইকেল সুশীল অধিকারি (৫৪) কাজী আব্দুল হাশেম (৫৫) মোল্লা জালাল উদ্দিন (৫৬) শামসুদ্দিন মোল্লা (৫৭) গৌর চন্দ্র বালা (৫৮) কাজী গোলাম মোস-ফা (৫৯) শামসুল হক (৬০) শামসুজ্জোহা (৬১) রফিকুদ্দিন ভূইয়া (৬২) সৈয়দ আহমদ (৬৩) শামসুর রহমান খান (৬৪) নূরুল হক (৬৫) এম এ ওহাব (৬৬) ক্যাপ্টেন সুজ্জাত আলী (৬৭) এম আর সিদ্দিক (৬৮) এমএ ওহাব (৬৯) চিত্তরঞ্জন সুতার (৭০) সৈয়দা রাজিয়া বানু (৭১) আতাউর রহমান খান (৭২) খন্দোকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (৭৩) সংপ্রু সাইন (৭৪) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (৭৫) আতাউর রহমান (৭৬) পীর হাবিবুর রহমান (৭৭) সৈয়দ আলতাফ হোসেন (৭৮) মোহাম্মদ ফরহাদ (৭৯) মতিয়া চৌধুরী (৮০) হাজী দানেশ (৮১) তৌফিক ইমাম সচিব (৮২) নূরুল ইসলাম (৮৩) ফয়েজ উদ্দিন সচিব (৮৪) মাহবুবুর রহমান সচিব (৮৫) আব্দুল খালেক (৮৬) মুজিবুল হক সচিব (৮৭) আব্দুর রহিম সচিব (৮৮) মঈনুল ইসলাম সচিব (৮৯) সহিদুজ্জামান সচিব (৯০) আনিসুজ্জামান সচিব (৯১) ডঃ এ সাত্তার সচিব (৯২) এম এ সামাদ সচিব (৯৩) আবু তাহের সচিব (৯৪) আল হোসাইনী সচিব (৯৫) ডঃ তাজুল হোসেন সচিব (৯৬) মতিউর রহমান টিসিবি চেয়ারম্যান (৯৭) মেজর জেনারেল কেএম সফিউল্লাহ (৯৮) এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দোকার (৯৯) কমোডর এমএইচ খান (১০০) মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান (১০১) একে নজিরউদ্দিন (১০২) ডঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী (১০৩) ডঃ মাযহারুল ইসলাম (১০৪) ডঃ এনামুল হক (১০৫) এটিএম সৈয়দ হোসেন (১০৬) নূরুল ইসলাম আইজি পুলিশ (১০৭) ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম (১০৮) ডঃ নূরুল ইসলাম (পিজি হাসপাতাল) (১০৯) ওবায়দুল হক (সম্পাদক অবজারভার) (১১০) আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (ইত্তেফাক) (১১১) মিজানুর রহমান (বিপিআই) (১১২) মনোয়ারুল ইসলাম (১১৩) ব্রিগেডিয়ার এএমএম নূরুজ্জামান (রক্ষীবাহিনী প্রধান) (১১৪) কামরুজ্জামান শিক্ষক সমিতি (১১৫) ডঃ মাজহার আলী কাদরী।

একই ঘোষণায় বাকশালের পাচঁটি অঙ্গ সংগঠনও গঠন করা হয়। সেগুলো হচ্ছে:
জাতীয় কৃষকলীগ,
জাতীয় শ্রমিক লীগ,
জাতীয় মহিলা লীগ,
জাতীয় যুবলীগ ও
জাতীয় ছাত্রলীগ। এগুলোর সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন যথাক্রমে ফনিভূষণ মজুমদার, অধ্যাপক ইউসূফ আলী, সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ ও শেখ শহীদুল ইসলাম। এসমস্ত সংগঠনের কেন্দ্রিয় কমিটিগুলোতে মোজাফফর ন্যাপ ও মনি সিংএর কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের গ্রহণ করা হয়। বাকশালের এ সূত্র ধরেই ১৬ই জুন 'সংবাদপত্র বাতিল অধ্যাদেশ' জারি করা হয়। তার বলে পার্টি নিয়ন্ত্রণাধীন শুধুমাত্র চারটি দৈনিক ও কয়েকটি সাপ্তাহিক বাদে সকল পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। গণতন্ত্রের হত্যাযজ্ঞ শেষে দেশ জুড়ে চলে তান্ডব উৎসব। রুদ্ধশ্বাস মানুষ জীবনের নিরাপত্তা হারিয়ে জন্মভূমিতেই বন্দী হয়ে পড়েন স্বৈরশাসনের নিষ্পেষনে।

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার সীমাহীন হয়ে পড়ে

শেখ মুজিব কর্তৃক বাকশাল কায়েম হবার পর রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার সব সীমা ছাড়িয়ে যায়।

জনতার সাথে রক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে বিভিন্ন স্থানে। শহরবাসীরা ঐসব হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন। ৮ই জুন মাইজদীতে জনতার সাথে রক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটে। ৯ই জুন ঐ হামলা ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। এর পিছনে কোনো রাজনৈতিক উস্কানি ছিল না। ঐ দিনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনার তদন্ত করার জন্য মাইজদী যেতে বাধ্য হন। তারপর ১০ই জুন '৭৩ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মালেক উকিল ঘোষণা করেন, "মাইজদীর ঘটনার জন্য দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।" কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সে খবর কোথাও ছাপা হয়নি। আজঅব্দি জানতে পারেননি এদেশের নির্যাতিত জনগণ সেখানে কি ঘটেছিল।

১০ই জুন বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট পার্টির এক সভায় দলীয় প্রধান জনাব মনি সিং উচ্চকন্ঠে বলেন, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীনের নেতৃত্ব এবং তাদের দেশীয় সহযোগী ভাসানী ন্যাপ উগ্রপন্থী জাসদ, মুসলিম লীগ ও জামায়াতপন্থীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে।" এরপর ১৯৭৩ সালের ১৯ই জুন ঢাকার প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণায় নির্দেশ জারি করেন, "শহরে বিনা অনুমতিতে মাইক ব্যবহার করা যাবে না।" মাইক ব্যবহারের উপর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল সুস্পষ্টভাবে বিরোধী দলের জনসভার উপর। মোজাফফর ন্যাপ বা সিপিবি-এর কোন প্রতিবাদ করেনি। বরং ২৪শে জুন মোজাফফর ন্যাপের সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, "তার দল বাস্তব অবস্থাতে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে সস্থা জনপ্রিয়তা অর্জনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।" ঐ জনসভাতেও তিনি মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীকে সাম্রাজ্যবাদের চর বলে অভিহিত করেন। ইতিমধ্যে মজুতদারী, চোরাচালানী, দুর্নীতিতে ছেয়ে যায় দেশ। রক্ষীবাহিনীর হামলা ও হত্যা বাড়তে থাকে। ১৯৭৩ সালের ২৭শে জুন পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে দেখা গেল যে, '৭২ সালের তুলনায় দ্রব্যমূল্য চারশ গুন বেড়েছে।

এই সময় ২৯শে জুন চট্টগ্রামে ঘটে এক চমকপ্রদ ঘটনা। চট্টগামের ইষ্টার্ণ রিফাইনারীর বাসের উপর রক্ষীবাহিনীর গুলিবর্ষণে নিহত হয় একজন কর্মচারী। গুরুতর আহত হয় দু'জন শ্রমিক। ইষ্টার্ণ রিফাইনারীর একটি বাস কর্মচারীদের রিফাইনারীতে নিয়ে যাবার পথে রক্ষীবাহিনীর একটি ট্রাককে ওভারটেক করে। এ কারণে রক্ষীবাহিনীর ক্রুদ্ধ সদস্যরা একটি রেল ক্রসিংয়ের মুখে ঐ গাড়ি ঘেরাও করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এমনি সামান্য ছুতোঁতেই রক্ষীবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে স্বাধীন এ দেশের সাধারণ মানুষকে।

এই সময় দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক নির্মল সেন (অনিকেত) মার্চের নির্বাচনের ক'দিন পরে লিখেছিলেন, "আমি স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই" শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ। লেখায় তিনি এক সপ্তাহের একটি ঠিকুজি তুলে ধরেন ১৩টি হত্যাকান্ডের। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন যে, এ খবর সব খবর নয়। সব খবর সংবাদপত্রে পৌঁছে না। সব খবর পৌঁছে না থানায়। দূর-দূরান্ত থেকে কে দেয় কার খবর? আর দিতে গেলে জীবনের যে ঝুঁকি আছে সে ঝুঁকি নিতেই বা কতজন রাজি? এই নির্বিচার হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করে নির্মল সেন জানতে চেয়েছিলেন -

(১) ১৯৭২ সাল হতে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কয়টি হত্যাকান্ডের কিনারা হয়েছে?

(২) কয়জন হত্যাকারী গ্রেফতার হয়েছে?

(৩) ক'টি গাড়ি হাইজ্যাক হয়েছে? সে হাইজ্যাকার কারা? কি তাদের পরিচয়? কি তাদের ঠিকানা?

(৪) কারা গ্রেফতার হয়েছে?
(৫) পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে, অভিযুক্তদের ধরা হলে ফোনের জন্য তাদের মুক্তি দিতে হয়। এ অভিযোগ কতটুকু সত্য? এই ফোন কারা করে থাকেন?
তিনি বলেন, "খুঁজে দেখতে হবে এই হত্যাকারীরা কাদের প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠছে। নইলে দিনের পর দিন হত্যা, রাহাজানীর খবর বের হয়? অথচ একটি অপরাধীরও শাস্তি হয় না। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে কি করে?" এ প্রশ্ন শুধু নির্মল সেনেরই ছিল না এ প্রশ্ন ছিল দেশের জনগণেরও। আওয়ামী লীগ সরকার এ প্রশ্নগুলোর কোন জবাব দিতে পারেনি।

চট্টগ্রামের রিফাইনারী কর্মচারীদের উপর গুলিবর্ষণের অকারণ হত্যার জন্য রক্ষীবাহিনীর কেউ সাজা পায়নি। উপরন্তু ১৯৭৩ সালের ২৭শে জুলাই প্রেসিডেন্টের অগণতান্ত্রিক ৫০নং ধারা অনুযায়ী রক্ষীবাহিনীকে দেয়া হল নতুন ক্ষমতা। তাতে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ডেপুটি লিডার ও তার উপরস্থ সকল অফিসারকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া অপরাধ করেছে সন্দেহে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও তল্লাশীর ক্ষমতা দেয়া হয়।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ২১শে অক্টোবর অভিযোগ করে যে, রক্ষীবাহিনী তাদের রাজবাড়ি জেলা শাখার সম্পাদককে গ্রেফতার করে পিটিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছে। ২৪শে অক্টোবর তারা অভিযোগ করেন যে, বাগমারার জাসদ নেতাকে রক্ষীবাহিনী খুন করেছে। একই অভিযোগ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ঐক্যজোটের মোজাফফর ন্যাপ, ১৬ই অক্টোবর পাবনার ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকে রক্ষীবাহিনীর গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে জেলা ন্যাপ কমিটি একটি বিবৃতি দেন। ২রা নভেম্বর মোজাফফর ন্যাপের সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করেন যে, তার কর্মীদের উপর রক্ষীবাহিনীর হামলা, হত্যা, নির্যাতন চলছে। তিনি বলেন, "১লা নভেম্বর সুনামগঞ্জ মহকুমার ন্যাপ প্রধান বঙ্কু দাসকে রক্ষীবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পীরগাছার ন্যাপ কর্মীদের নির্বিচারে মারধর করা হয়েছে। ৩০শে অক্টোবর নাটোরে ন্যাপ কর্মীকে রক্ষীবাহিনী অপহরণ করেছে।" সেই সঙ্গে পংকজ ভট্টাচার্য্য অনুনয় করেন যে, এদের উপর হামলা হলে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের শক্তিই বৃদ্ধি পাবে।
'৭৩ সালের ২৫শে অক্টোবর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মালেক উকিল জানান, "গ্রামরক্ষী দল গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যকে একটি করে শর্টগান দেয়া হবে। কাজের মেয়াদ শেষ হলে এসব অস্ত্র থানায় জমা দেয়া হবে।" তিনি আরো পরিষ্কার করে বলেন, "এ ব্যাপারে মহকুমা হাকিমের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং এম পির সাথে আলোচনা করে গ্রামরক্ষী দল গঠনের জন্য ওসির প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

এরপর ২৯শে নভেম্বর সরকারের অস্ত্র সংক্রান্ত এক ঘোষণায় বলা হয়, "রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মন্ত্রীগণ, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যরা লাইসেন্স ছাড়াই নিষিদ্ধ (প্রোহিবেটেড বোরের) অস্ত্র নিজেদের কাছে রাখতে পারবেন।" এর বৈধতার প্রশ্ন ছাড়াও এই সিদ্ধান্ত থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠে যে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা অবনতি ঘটেছিল।

'৭৩ সালের প্রারম্ভ থেকেই গ্রামে গ্রামে চলে রক্ষীবাহিনীর বর্বর, নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক অভিযান। মুজিব আমলের স্বৈরাচার ও বিরোধী নির্যাতনের একটি দলিল আত্মগোপনকারী কম্যুনিষ্ট নেতা শান্তি সেনের স্ত্রী শ্রীমতি অরুণা সেনের বিবৃতি। অরুনা সেন, রানী সিংহ ও হনুফা বেগমকে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার রামভদ্রপুর গ্রাম থেকে রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করেনি। তাদেরকে কোন আদালতেও হাজির করেননি। ঢাকার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয় এবং পরে সুপ্রীম কোর্টে তাদের পক্ষে রীট আবেদন করার পর কোর্টের নির্দেশে তাদেরকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার শুনানির সময় সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণযোগ্য অভিযোগ আনতে অক্ষম হওয়ায় সুপ্রীম কোর্ট অবিলম্বে তাদের তিনজনকেই বিনা শর্তে মুক্তিদানের নির্দেশ দেন। অরুণা

সেন ও অন্যান্যদের পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেছিলেন ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ ও ব্যারিষ্টার জমিরুদ্দিন সরকার।

মুক্তি পাবার পর আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যায়-নির্যাতনের স্বরূপ প্রকাশের জন্য শ্রীমতি অরুণা সেনের সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, "গত ১৭ই আশ্বিন রক্ষীবাহিনীর লোকেরা আমাদের গ্রামের ওপর হামলা করে। ঐদিন ছিল দূর্গাপূজার দ্বিতীয় দিন। খুব ভোরে আমাকে গ্রেফতার করে। গ্রামের অনেক যুবককে ধরে বেদম মারপিট করে। লক্ষণ নামের একটি কলেজের ছাত্র ও আমাকে ধরে তারা নড়িয়া রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার স্বামী শান্তি সেন ও পুত্র চঞ্চল সেন কোথায়? বলে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, তাদের ধরিয়ে দিন। আরো জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্ধ্যার দিকে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। লক্ষণকে সেদিন রেখে পরদিন ছেড়ে দেয়। সে যখন বাড়ি ফেরে, দেখি বেদম মারের ফলে সে গুরুতররূপে আহত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চার/পাঁচ দিন পর আবার তারা আমাদের গ্রামের উপর হামলা চালায়। অনেক বাড়ি তল্লাশী করে। অনেককে মারধর করে। কৃষ্ণ ও ফজলু নামের দু'জন যুবককে তারা মারতে মারতে নিয়ে যায়। আজও তারা বাড়ি ফিরে আসেনি। তাদের আত্মীয়রা ক্যাম্পে গিয়ে তাদের খোঁজ করলে বলে দেওয়া হয় তারা সেখানে নেই। তাদেরকে খুন করে গুম করে ফেলা হয়েছে বলেই মনে হয়। এরপর মাঝে মাঝেই তারা গ্রামে এসে যুবক ছেলেদের খোঁজ করত।
গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ রাতে রক্ষীবাহিনী এসে সম্পূর্ণ গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে। ভোরে আমাকে ধরে নদীর ধারে নিয়ে গেল। সেখানে দেখলাম, গ্রামের উপস্থিত প্রায় অধিকাংশ সক্ষম দেহী পুরুষ এমনকি বালকদের পর্যন্ত এনে হাজির করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের থানা সম্পাদক হোসেন খাঁ সবকিছুর তদারকি করছে। আমার সামনে রক্ষীবাহিনী উপস্থিত সকলকে বেদম মারপিট শুরু করে। শুনলাম এদের ধরতে গিয়ে বাড়ির মেয়ে-ছেলেদেরও তারা মারধর করে এবং অনেকক্ষেত্রে অশালীন আচরণ করেছে। এরপর আমাকে রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার হুকুম করল পানিতে নেমে দাড়াতে। সেখানে নাকি আমাকে গুলি করা হবে। আমি নিজেই পানির দিকে নেমে গেলাম। ওরা রাইফেল উচিঁয়ে তাক করল গুলি করবে বলে। কিন্তু পরষ্পর কী সব বলাবলি করে রাইফেল নামিয়ে নিল। আমি কাদাঁ-পানিতে দাড়িয়েই থাকলাম। কমান্ডার গ্রেফতার করা সবাইকে হিন্দু মুসলমান দুই কাতারে ভাগ করে দাড় করালো। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বলল, 'মালাউনরা আমাদের দুশমন। তাদের ক্ষমা করা হবে না। তোমরা মুসলমানরা মালাউনদের সাথে থেকো না। তোমাদের এবারের মত মাফ করে দেয়া হল।' এই বলে কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফা নামের দু'জন মুসলমান যুবককে রেখে বাকি সবাইকে এক একটা বেতের বাড়ি দিয়ে বলল, 'ছুটে পালাও'। তারা ছুটে পালিয়ে গেল। আমার পাক বাহিনীর কথা মনে পড়ল। তারাও বিক্ষুব্ধ জনতাকে বিভক্ত করতে এমনিভাবে সাম্প্রদায়ীকতার আশ্রয় নিয়েছিল। পার্থক্য শুধু তারা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়ীকতার আশ্রয় নিত আর এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধব্জাধারীরা ভন্ডামীর আশ্রয় নিচ্ছে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওরা কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফাসহ ২০জন হিন্দু যুবককে নিয়ে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। তিনজন ছাড়া এরা সবাই পেশায় জেলে। মাছ ধরে কোনরকমে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা সব আকুল হয়ে কান্নাকাটি করতে থাকল। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য! সন্ধ্যার সময় কলিমুদ্দিন, মোস্তাফা, গোবিন্দনাগ ও হরিপদ ঘোষ ছাড়া বাকি সবাই গ্রামে ফিরে এল। আমি গেলাম তাদের দেখতে। দেখলাম তারা সবাই চলতে অক্ষম। সর্বাঙ্গ ফুলে গেছে তাদের। বেত ও বন্দুকের দাগ শরীর কেটে বসে গেছে। চোখ-মুখ ফোলা। হাতপায়ের গিরোতে রক্ত জমে আছে। তাদের কাছে শুনলাম, সারাদিন দফায় দফায় তাদের চাবুক মেরেছে। গলা ও পায়ের সঙ্গে দড়ি বেধে পানিতে বার বার ছুড়ে ফেলে ডুবিয়েছে। পিঠের নিচে ও বুকের উপর পা দিয়ে দু'দিক থেকে দু'জন লোক তাদের উপর উঠে দাড়িয়েছে। মই দিয়ে ডলেছে। এদের অনেককেই আত্মীয়রা বয়ে এনেছে। এদের অবস্থা দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, যারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও একবেলা পেটপুরে খেতে পায়না, অনাহার, দুঃখ-দারিদ্রের জ্বালায় আজ অর্ধমৃত তাদের 'মরার উপর খাড়ার ঘাঁ'র অবসান কবে হবে? যে শাসকরা মানুষের সামান্য প্রয়োজন ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না, চুরি, ডাকাতি,

রাহাজানী, শোষণ, নির্যাতন যারা বন্ধ করতে পারছে না, তারা কোন অধিকারে আজ নিঃস্ব মানুষের উপর চালাচ্ছে এই বর্বর নির্যাতন? অবশেষে চরম নির্যাতন আমার উপরও নেমে এল। ৬ই ফেব্রুয়ারীর রাতে ভোর না হতেই রক্ষীবাহিনী ঘুম থেকে আমাকে তুলল। আমাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এলে দেখলাম রানীও রয়েছে। আমাদের নিয়ে তারা দুই মাইল দূরে ভেদরগঞ্জ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। রাস্তায় তারা রানীর প্রতি নানারকমের অশ্লীল উক্তি করেছিল। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখলাম সেখানে কলিমুদ্দিন, মোস্তাফা, গোবিন্দনাগ এবং হরিপদও রয়েছে। বুঝতে পারলাম তাদের উপর চরম দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে। বিশেষ করে কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফাকেই বেশি অসুস্থ দেখলাম। কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফা দুই ভাই। এদের সংসারে আর কোন সক্ষম ব্যক্তি নেই। অপরের জমিতে চাষ করে ওরা কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করে। এরা বিবাহিত ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জনক। আমরা ক্যাম্পে আসতেই অনেক রক্ষীবাহিনী এসে আমাদের ঘিরে দাড়াল। কেউ অশ্লীল মন্তব্য করে, কেউ চুল ধরে টানে, কেউ চড় মারে, কেউ খোঁচা দেয়। এমন সব বর্বরতা। কিছুক্ষণ পর আমাদের রোদের মধ্যে বসিয়ে রেখে তারা চলে গেল। সন্ধ্যায় আমাকে উপরে দোতালায় নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম রানীর হৃদয়বিদারী চিৎকার। প্রায় আধঘন্টা পর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে থেমে গেল। নিঃস্তব্ধ রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসছিল বেতের সপাং সপাং শব্দ আর পাশবিক গর্জন। রানীকে যখন এনে তারা কামরার মধ্যে ফেলল, রাত্রি তখন কত জানিনা। রানীর অচৈতন্য দেহ তখন বেতের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত। রক্ত ঝড়ছে। জ্ঞান ফিরলে রানী পানি চাইলো, আমি তাকে পানি খাওয়ালাম। রানী আস্তে আস্তে কথা বলতে পারল। রাত্রি তখন ভোর হয়ে এসেছে। রানীর মুখে শুনলাম উপরে ভেদরগঞ্জ ও ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সম্পাদকরা এবং ঐ দুই স্থানের ক্যাম্প কমান্ডাররা উপস্থিত ছিল। তারা শান্তি সেন ও চঞ্চলকে ধরিয়ে দিতে বলে এবং অস্ত্র কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করে। রানী কিছুই জানে না বলায় তাকে এমন সব অশ্লীল কথা বলে যা কোন সভ্য মানুষের পক্ষে বলা তো দূরের কথা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ ও গালি বর্ষণের পর ভেদরগঞ্জ ক্যাম্প কমান্ডার বেত নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাতাড়ি এমন পেটাতে থাকে যে তিনখানা বেত ভেঙ্গে যায়। আবার জিজ্ঞাসা করে, শান্তি ও চঞ্চল কোথায়? রানীর একই উত্তর। ক্ষীপ্ত হয়ে রানীকে তারা সিলিং এর সাথে ঝুলিয়ে দেয় এবং দুই কমান্ডার এবার একই সাথে চাবুক দিয়ে পেটাতে শুরু করে। মারার সময় অসহ্য যন্ত্রণায় রানী বলেছিল, 'আমাকে এভাবে না মেরে গুলি করে মেরে ফেলুন।' জবাবে একজন বলে, 'সরকারের একটা গুলির দাম আছে। তোকে সাতদিন ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলব। এখন পর্যন্ত মারার দেখেছোটা কি?' অল্পক্ষণ পরেই রানী অচেতন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের চাবুক চালানো বন্ধ হয়নি। যখন জ্ঞান ফেরে রানী দেখে সে মেঝেতে পরে আছে। পানি চাইলে তারা তাকে পানি দেয় নাই। ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রথমে আমাকে ও পরে রানীকে দোতালায় নেয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী ফজলু মিঞা ও ভেদরগঞ্জের সেক্রেটারী হোসেন খাঁ। তারা চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে বলল, তোমার স্বামী ও ছেলেকে ধরিয়ে দাও। অস্ত্র কোথায় আছে বলে দাও। তারা ডাকাত, অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি করে। আমি বললাম, তারা ডাকাত নয়। তারা সৎ দেশপ্রেমিক, আমার স্বামী রাজনীতি করেন এ কথা কে না জানে। দেশের সাধারণ লোকের অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় তিনি। রানীকে তারা একই প্রশ্ন করেন। রানী কিছুই জানে না বলায় তারা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে। ডামুড্যা ক্যাম্পের কমান্ডার করম আলী এবং ভেদরগঞ্জ ক্যাম্প কমান্ডার ফজলুর রহমান আমাদের অশ্লীল গালাগাল দিতে শুরু করে এবং আমাকে ও রানীকে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে রানীর বস্ত্র খুলে নেয়। তারপর আমাদের দু'জনকে দু'দিক থেকে চাবুক মারতে থাকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান হলে দেখি দু'জনেই মেঝেতে পরে আছি। রানীর সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমার গায়ে কাপড় থাকায় অপেক্ষাকৃত কম আহত হয়েছি। তবুও এই রুগ্ন বৃদ্ধ দেহে এই আঘাতই মর্মান্তিক। সর্বাঙ্গ ব্যাথায় জর্জরিত। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। নড়বার ক্ষমতা নেই। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে নারকীয় হাসি হাসছে। এদের হুকুমে দু'জন সিপাই আমাকে টেনে তুলল। আমি অতিকষ্টে দাড়াতে পারলাম। রানী পারল না। দু'জন রক্ষী তার দুই বগলের নিচে হাত

দিয়ে তাকে টেনে তুলল ও তার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিল। তারপর টানতে টানতে নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। কমান্ডার পেছন থেকে নির্দেশ দেয় ওকে ভালো করে হাটা নয়তো মরে যাবে। সকালে কমান্ডার কয়জন রক্ষীসহ রানীকে নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হল। বলল, 'বাচঁবিতো না, চল তোর মাকে দেখিয়ে আনি।' রানীর সর্বাঙ্গ ফুলে কালো হয়ে গিয়েছে। পা ফেলবার ক্ষমতা নেই। সে অবস্থায় তাকে হেচঁড়াতে হেচঁড়াতে দু'মাইল পথ টেনে নিয়ে যাওয়া হল। রানীর মা রানীকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে যান। কমান্ডার রানীকে তার মার মাথায় পানি দিতে বলে। রানীর মার জ্ঞান এলে রানীর চেহারা এমন কেন জিজ্ঞেস করায় কমান্ডার বলে পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। রানীকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানালে কমান্ডার বলে 'খাসী খাওয়ালে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।' এরপর আবার দু'মাইল রাস্তা হেচঁড়াতে হেচঁড়াতে তাকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা হল। ঐ দিন ছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪। হনুফাকেও তারা ধরে নিয়ে এল ঐদিন। করিম নামের আর একটি কৃষক যুবককেও ওরা ধরে এনেছে দেখলাম রামভদ্রপুর থেকে। তাকে এত মারা হয়েছে যে তার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। নড়িয়া থানার পন্ডিতসার থেকেও একজন স্কুল শিক্ষক ও দু'জন যুবককে এনেছে দেখলাম। বিপ্লব নামের একটি ছেলে নাকি মারের চোটে পথেই মারা যায়। রক্ষীবাহিনীর সিপাইরা বলাবলি করছিল। একজন জল্লাদ গর্জন করে বলছিল, 'দেখ এখনও হাতে রক্ত লেগে আছে!' শুনেছি মতি নামের আর একটি যুবককেও তারা পিটিয়ে মেরেছে। আর আমাদের ধরে আনার দু'দিন আগে কৃষি ব্যাংকের পিয়ন আলতাফকে পিটাবার পর হাত-পা বেধে দোতালার ছাদ থেকে ফেলে মেরে ফেলেছে। ৯ তারিখ দুপুরের অল্প পরে তারা হনুফা, রানী ও আমাকে নিয়ে গেল পুকুরের ধারে। সেখানে আমাদের একদফা বেত দিয়ে পিটিয়ে চুবানোর জন্য পানিতে নামাল। প্রথমে ওরা আমাদের সাতঁরাতে বাধ্য করল। আমরা ক্লান্ত হয়ে কিনারায় উঠতে চেষ্টা করি, ওরা আমাদের বাঁশ দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। পরিশ্রান্ত হয়ে যখন আমরা আর সাঁতরাতে পারছিলাম না তখন পানি থেকে তুলে আবার বেত মারতে থাকে। শেষের দিকে আমরা যখন আর সাতঁরাতে পারছিলাম না, তখন আমাদের পানিতে ডুবিয়ে দেহের উপর দু'পা দিয়ে দাড়িয়ে থাকত।

এভাবে আমাদের তিন দফা পেটানো ও চুবানো হয়। কিছুক্ষণ আগেই করিম মারের চোটে মরে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে আর একটি অল্প বয়সী যুবককে চুবিয়ে অচেতন করে ফেলেছিল। তাকে ঘাটলার উপর ফেলে রাখে। আমার আঁচল দিয়ে গা মোছানোর সময় হঠাৎ ছেলেটি চোখ খুলে তাকায়। আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না। রক্ষীরা তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরে শুনেছি ছেলেটাকে নাকি মেরে ফেলেছে। সন্ধ্যার অল্প আগে আমাদের পানি থেকে তুলে ভিজা কাপড়েই থাকতে বাধ্য করল। দারুন শীতে আমরা কাঁপছি। প্রচন্ড জ্বর এসে গেছে সকলের। এমনি করেই রাতভর ছালার চটের উপর পরে থাকলাম। পরদিন রাতে রানীকে আবার নিয়ে গেল দোতালায়। সেখানে আবার তাকে ঝুলিয়ে বেত মারল। ১১ তারিখে আবার রানীর ওপর চলল একই অত্যাচার। রানী জ্ঞান হারাল। রক্ষী সিপাইদের বলাবলি করতে শুনলাম 'রানী মরে গিয়েছে'। রানীর কাছে শুনলাম তার যখন জ্ঞান হল তখন সে দেখে তার পাশে ডাক্তার বসা। রানী জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে,আমি কোথায়?' ডাক্তার জবাব দেয়, 'আমি ডাক্তার, তুমি কথা বলো না।' কিছুক্ষণ পর ডাক্তার চলে গেলে রানীকে তারা ধরাধরি করে নিচে আমাদের কাছে নিয়ে এল।

একজন সিপাই রানী ও হনুফাকে বলল, 'তোরাতো মরেই যাবি। তার আগে আমরা প্রতি রাতে পাঁচজন করে তোদের ভোগ করব। তারা অবশ্য 'ভোগ' শব্দটি বলে নাই, বলেছিল অতি অশ্লীল কথা। একদিন রাতে দু'জন রক্ষী সিপাই ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দেয় এবং রানী ও হনুফার মুখ চেপে ধরে। ধস্তাধস্তি করে তারা ছুটে গিয়ে চিৎকার করে। চিৎকার শুনে ক্যাম্পের অন্য রক্ষীরা ছুটে আসে। কমান্ডারও আসে। ওরা তাকে সব বললে সে বলে, 'খবরদার এ কথা প্রকাশ করবি না। তাহলে মেরে ফেলব।'

রক্ষী সিপাইদের কারও কারও মাঝে মানবতাবোধের লক্ষণ পাচ্ছিলাম। তাদেরই একজন সিপাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছ?' প্রশ্ন শুনে সে চমকে উঠল। বলল, 'বাংলাদেশে লেখাপড়া দিয়ে কি করব? আমরা জল্লাদ, জল্লাদের আবার লেখাপড়ার দরকার কি?' এই বলে সে দে ছুট্। মনে হয় যেন চাবুক খেয়ে একটি ছাগল ছুটে পালাল। রক্ষী সিপাইদের কানাঘুষায় শুনছিলাম, আমাকে আর হনুফাকে অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দেবে আর রানী ও অন্যান্য পুরুষ বন্দীকে মেরে ফেলা হবে। ১২ই ফেব্রুয়ারী আমাকে ও হনুফাকে নিয়ে রক্ষীরা রওনা দিল। আমরা রানীকে ফেলে যেতে আপত্তি জানালাম। রানীও আমাদের সাথে যেতে খুব কান্নাকাটি করছিল। কমান্ডারের কাছে অনুনয়-বিনয় করছিল। কমান্ডার তার সহকর্মীদের সাথে কি যেন আলাপ করে সেদিন আমাদের পাঠানো স্থগিত রাখল। ১২তারিখ রাতেও ওরা আবার রানীকে ঝুলিয়ে হান্টার দিয়ে পেটায়। ১৩ তারিখে তারা রানীকে মারে না, কিন্তু নির্যাতনের নতুন কৌশল নেয়। দম বন্ধ করে রাখে। জোর করে চেপে ধরে রাখে নাক-মুখ-চোখ। এমনি করে জ্ঞান হারালে ওরা তাকে ছেড়ে দেয়।

১৯শে ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে ওরা আমাদের তিনজনকে নিয়েই রওনা দিল প্রায় চার মাইল দূরে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পের দিকে। কলিমুদ্দিন, মোস্তাফা, গোবিন্দ ও হরিপদ থেকে গেল। রক্ষীরা বলাবলি করছিল তাদের মেরে ফেলা হবে। আমরা কিছুদূর এলে ক্যাম্পের দিক থেকে চারবার গুলির আওয়াজ পেলাম। ভাবলাম ওদের বুঝি মেরে ফেলল। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আমাদের শরীরের অবস্থা এমন ছিল যে, হাটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তবু আমরা বাধ্য হচ্ছিলাম হাটতে। বোধ হয় আমাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে। বোধ হয় বেঁচে যাব। এ চিন্তাই আমাদের হাটতে শক্তি যোগাচ্ছিল। অনেক রাতে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সেখানে কিছুক্ষণ রেখে স্পীডবোট করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সর্বক্ষণ আমাদের কম্বল চাপা দিয়ে মুর্দার মত ঢেকে রাখা হল। বেদনা জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত শরীর। তার উপর কম্বল চাপা থাকায় শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম। যেন জ্যান্ত কবর! সমস্ত দিন আমাদের ওভাবেই রাখল। খেতে দিল না। শেষরাতে আবার কম্বল চাপা দিয়ে জিপে করে ঢাকার দিকে রওনা দিল। আবার সেই সুদীর্ঘ পথ জ্যান্ত কবরের যন্ত্রণা। ঢাকায় আমাদের প্রথমে রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে গেল। সে আমাদের খুব ধমকাল। সেখান থেকে নিয়ে গেল তেজগাঁ থানায়, তারপর লালবাগ থানায়। রাতে সেখানে থাকলাম। পরদিন পাঠাল সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে পাঁচদিন রাখার পর আমাদের নিয়ে এল তেজগাঁ গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে। জেলে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের মত রাখা হত। দিনরাত সেলে বন্দী। একই আহার্য দেয়া হত। সেখানে রাজনৈতিক অভিযোগে আরোও বন্দিনী আছেন। তার মধ্যে ১৭ই মার্চে গ্রেফতারকৃত জাসদ নেত্রী মোমতাজ বেগম আছেন। অস্ত্র আইনে সাজাপ্রাপ্ত পারভীন। আরও একজন আছেন নাম রুমা। সবাইকেই তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করে রাখা হয়েছে। সাধারণ কয়েদীদের মত খাটানো হচ্ছে। এর উপর জমাদারনীরা (মেয়ে সিপাই জমাদার) তাদের নিজেদের জামা-কাপড় সেলাই, কাথাঁ সেলাই, কাপড়-চোপড় ধোয়ানো সবকিছুই মেয়ে কয়েদীদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। রাজনৈতিক বন্দীরাও রেহাই পাচ্ছেন না।"

এমনই হাজার হাজার করুণ কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে আওয়ামী লীগের শাসন আমলে বাংলাদেশে। যার সবগুলো গুমড়ে মরেছে নির্বিচারে, প্রকাশিত হতে পারেনি। রক্ষীবাহিনীর বর্বরতার আর একটি চিত্র তুলে ধরা যাক। ঘটনাটি ঘটেছিল পাবনার বাজিতপুরের কোরাটিয়া গ্রামের কৃষক আব্দুল আলীর ছেলে রশীদকে খুন করার কাহিনী।

আবদুল আলীর সাক্ষাৎকারটা ছিল নিম্নরূপ :-
"আমার সামনে ছেলেকে গুলি করে হত্যা করল। আমার হাতে কুঠার দিয়ে বলল, 'মাথা কেটে দে, ফুটবল খেলবো।' আমি কি তা পারি! আমি যে বাপ। কিন্তু অকথ্য নির্যাতন কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে ছেলের মাথা কেটে দিয়েছি। রশীদ নাকি রাজনীতি করত আমি জানতাম না। একদিন মাতু আর শাহজাহান এসে ধরে নিয়ে গেল। আওয়ামী লীগ অফিসে সারারাত ওরা ওকে বেদম মার মারল। সকালে বলল

এক হাজার টাকা দিলে ছেড়ে দেবে। রশীদ স্বীকার করে এল এক হাজার টাকা দেবার। আমার কাছে টাকা চাইল। কিন্তু আমি দিন আনি দিন খাই, মজুর মানুষ। হঠাৎ তিন দিনের মধ্যে এক হাজার টাকা কোত্থেকে দেব? বললাম, তুই বরং পালিয়ে সিলেট চলে যা। রশীদ সিলেট চলে গেল। কিন্তু ১০-১২ দিন পর ফিরে এসে বলল, 'বাবা মন মানেনা তোমাদের ফেলে থাকতে।' সিলেট থেকে ফেরার পরই কঠিন অসুখে পড়ল। টাইফয়েড। অসুখ সারার পর একদিন তার মাকে বলল, 'মা আজ ভাত খাব।' তার মা শৈলমাছ দিয়ে তরকারী রানল। এমন সময় আওয়ামী লীগের পান্ডারা রক্ষীবাহিনীসহ বাড়ি ঘেরাও করল। অসুস্থ মানুষ। কোন রকমে বাড়ি থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে দৌড় দিল। বাবা আমার জানত না সেখানেও ঘাপটি মেরে বসে আছে আজরাইল। পাষন্ডরা দৌড়ে এসে ধরল তাকে। রশীদ সিরাজের পা ধরে বলল, 'সিরাজ ভাই, বিমারী মানুষ আমায় ছেড়ে দেন।' ছাড়ল না। তারপর বাপ-বেটা দু'জনকেই বেধে মার শুরু করল। কত হাতে পায়ে ধরলাম। এরপর মাতু গুলি করল রশীদকে। ঢলে পড়ল রশীদ। আমি নির্বাক তাকিয়ে রইলাম। মরার পর একজন বলল, 'চল ওর কল্লাটা নিয়ে যাই ফুটবল খেলব।' মাতু বলল, 'হ্যাঁ। তাই নেব। তবে ওর কল্লা আমরা কাটব না। তার বাবা কেটে দেবে।' বলেই আমার হাতে কুঠার দিয়ে বলল কেটে দিতে। আমার মুখে রা নেই। বলে কি পাষন্ডগুলো? চুপ করে আছি দেখে বেদম পেটাতে শুরু করল। বুড়ো মানুষ কতক্ষণ আর সহ্য হয়। সিরাজ এসে বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে বলল, 'এক্ষুনি কাট, নইলে তোকেও গুলি করব।' ইতিমধ্যে দেড় ঘন্টার মত সময় পার হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম না কাটলে ওরা সত্যি আমাকেও মেরে ফেলবে কিনা? শেষে কুঠার দিয়ে কেটে দিলাম মাথা। নিয়ে সউল্লাসে চলে গেল তারা। আল্লায় কি সহ্য করব?"

সিরাজ সিকদার হত্যা মামলায় রাজ্জাক, তোফায়েল এবং নাসিমসহ ৭জন অভিযুক্ত

শেখ মুজিবের হুকুমে সর্বহারা পার্টির প্রধান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ সিকদারকে অকথ্য নির্যাতনের পর বন্দী অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। এই হত্যা প্রসঙ্গে দৈনিক সংগ্রামে ৫ই জুন ১৯৯২ সালে যে প্রতিবেদন ছাপা হয় তা থেকে শুধু তার হত্যা সম্পর্কেই অনেক কিছু জানা যাবে তাই নয়; শেখ মুজিব সরকারের অধিনে তৎকালীন সার্বিক অবস্থা এবং সেই প্রেক্ষাপটে সর্বহারা পার্টির কার্যক্রম সম্পর্কে ও অনেক তথ্য জানা যাবে।

রাজ্জাক, তোফায়েল, নাসিমসহ ৭জন আসামী। সিরাজ সিকদার হত্যা মামলা দায়ের।

স্টাফ রিপোর্টার: - পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির নেতা জনাব সিরাজ সিকদারকে হত্যার দায়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল ও মোহাম্মদ নাসিমসহ ৭জনকে আসামী করে গতকাল বৃহঃস্পতিবার ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের (সিএমএম) আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিরাজ সিকদার পরিষদের সভাপতি শেখ মহিউদ্দিন আহমদ বাদী হয়ে এই মামলা দায়ের করেন। মামলার আসামীরা হলেন: (১) সাবেক পুলিশ সুপার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (২) আব্দুর রাজ্জাক এমপি (৩) তোফায়েল আহমদ এমপি (৪) সাবেক আইজি পুলিশ ইএ চৌধুরী (৫) সাবেক রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক বর্তমানে সুইডেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কর্নেল (অবঃ) নূরুজ্জামান (৭) মোহাম্মদ নাসিম এমপি গং।

আসামীদের বিরুদ্ধে ৩০২ ও ১০৯ নং ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার আর্জিতে বলা হয়, বিশিষ্ট প্রকৌশলী নিহত সিরাজ সিকদার ছিলেন একজন আজাদী পাগল মুক্ত বিবেকের অধিকারী ও স্বাধীনচেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি তার জীবদ্দশায় নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে প্রথমে শ্রমিক সংগঠন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং পরবর্তীতে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে কাজ করতে থাকেন। সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বের প্রতি জনসমর্থন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তৎকালীন সরকার প্রধান মরহুম শেখ মুজিবর রহমান ঈর্ষান্বিত হয়ে জনসমর্থন হারানোর কারণে, ক্ষমতাচ্যুতির ভয়ে ভীত হয়ে সর্বহারা পার্টির কর্মীদের ওপর দমন নীতি চালাতে থাকেন। এমনকি পার্টি প্রধান সিরাজ সিকদারকে হত্যার জন্য বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন।

আর্জিতে বলা হয় আসামীরা মরহুম শেখ মুজিবের সহচর ও অধিনস্থ কর্মী থেকে শেখ মুজিবের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও গোপন শলা-পরামর্শে অংশগ্রহণ করতেন এবং ১নং থেকে ৬নং আসামী তৎকালীন সময়ে সরকারের উচ্চপদে থেকে অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সহচরদের সাথে শেখ মুজিবের সিরাজ সিকদার হত্যার নীল নকশায় অংশগ্রহণ করেন। তারা এ লক্ষ্যে সর্বহারা পার্টির বিভিন্ন কর্মীকে হত্যা, গুম, গ্রেফতার, নির্যাতন ও হয়রানি করতে থাকেন। সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার ও হত্যার বিবরণ দিয়ে আর্জিতে বলা হয়, মরহুম শেখ মুজিব ও উল্লেখিত আসামীরা তাদের অন্য সহযোগীদের সাহচর্যে সর্বহারা পার্টির মধ্যে সরকারের চর নিয়োগ করেন। এদের মধ্যে ইএ চৌধুরীর একজন নিকট আত্মীয়কেও চর হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এভাবে ১৯৭৫ সালের ১লা জানুয়ারী চট্টগ্রামের নিউমার্কেট এলাকা থেকে অন্য একজনসহ সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করে ঐদিনই বিমানে করে ঢাকায় আনা হয়। ঢাকার পুরাতন বিমান বন্দরে নামিয়ে বিশেষ গাড়িতে করে বন্দীদের পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মালিবাগস্থ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সিরাজ সিকদারকে আলাদা করে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। ২রা জানুয়ারী সন্ধ্যায় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর বিশেষ স্কোয়াডের অনুগত সদস্যরা বঙ্গভবনে মরহুম শেখ মুজিবের কাছে সিরাজ সিকদারকে হাত ও চোখ বাধাঁ অবস্থায় নিয়ে যায়। সেখানে শেখ মুজিবের সাথে তার

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলীসহ আসামীরা, শেখ মুজিবের পুত্র মরহুম শেখ কামাল এবং ভাগ্নে মরহুম শেখ মনি উপস্থিত ছিলেন।

আর্জিতে আরো বলা হয়, প্রথম দর্শনেই শেখ মুজিব সিরাজ সিকদারকে গালিগালাজ শুরু করেন। সিরাজ এর প্রতিবাদ করলে শেখ মুজিবসহ উপস্থিত সকলে তার উপর ঝাপিঁয়ে পড়েন। সিরাজ সে অবস্থায়ও শেখ মুজিবের পুত্র কর্তৃক সাধিত ব্যাংক ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপকর্ম, ভারতীয় সেবাদাসত্ব না করার, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শেখ মুজিবের কাছে দাবি জানালে শেখ মুজিব আরো উত্তেজিত হয়ে উঠেন। সে সময় ১নং আসামী মাহবুব উদ্দিন তার রিভলবারের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করলে সিরাজ সিকদার মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শেখ কামাল রাগের মাথায় গুলি করলে সিরাজ সিকদারের হাতে লাগে। ঐ সময় সকল আসামী শেখ মুজিবের উপস্থিতিতেই তার উপর ঝাপিঁয়ে পড়ে কিল, ঘুষি, লাথি মারতে মারতে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। এরপর শেখ মুজিব, মনসুর আলী এবং দুই থেকে সাত নং আসামী সিরাজ সিকদারকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১নং আসামীকে নির্দেশ দেন। ১নং আসামী মাহবুব উদ্দিন আহমদ আসামীদের সাথে বন্দী সিরাজ সিকদারকে শের-এ-বাংলা নগর রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে নিয়ে যায়। এরপর তার উপর আরো নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে ২রা জানুয়ারী আসামীদের উপস্থিতিতে রাত ১১টার দিকে রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরেই সিরাজ সিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে ১নং আসামীর সাথে বিশেষ স্কোয়াডের সদস্যগণ পূর্ব পরিকল্পনা মত বন্দী অবস্থায় নিহত সিরাজ সিকদারের লাশ সাভারের তালবাগ এলাকা হয়ে সাভার থানায় নিয়ে যায় এবং সাভার থানা পুলিশ পরের দিন ময়না তদন্তের জন্য লাশ মর্গে প্রেরণ করে। কিন্তু সরকারি ঘোষণায় বলা হয়, বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করায় পুলিশ এনকাউন্টারে সিরাজ সিকদার নিহত হন। আর্জিতে উল্লেখ করা হয় যে, সিরাজ সিকদারকে হত্যার পর তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জাতীয় সংসদে ভাষণ দেয়ার সময় 'কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?' এই দম্ভোক্তি উচ্চারণের মাধ্যমে তার জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। বিলম্বে মামলা দায়ের করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, ঘটনার সাথে সাথে সিরাজের পিতা মরহুম আব্দুর রাজ্জাক মামলা দায়ের করতে যান। কিন্তু তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসন ও রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাসের ভয়ে পুলিশ মামলা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। শাসকদের সন্ত্রাসের মুখে মোকদ্দমা দায়ের করা যায়নি। দেশে অস্থির অগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রী পরিবেশের কারণে আইন-শৃঙ্খলার অস্বাভাবিক অবনতি, ক্ষমতায় থাকা একনায়কত্ব ফ্যাসিবাদী দলের ক্ষমতার দাপটে ভয়ভীতি ও সন্ত্রস-তায় দীর্ঘ ১৭বছর এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জননেতার বিচার নীরবে কেঁদে ফিরেছে। ঐ অবস্থায় মরহুমের পরিবার ও সহকর্মীদের পক্ষ থেকে এজাহার ও মামলা দায়েরের ক্ষুদ্রতম সাহসও কারো ছিল না এবং এখনও নেই। বাদী নিজে সিরাজ সিকদারের আদর্শের এক তরুণ, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই আর্জি পেশ করছে।"

এ আর্জির প্রেক্ষিতে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম দরখাস্তখানা তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশ জারি করেন। বাদী পক্ষে মামলা পেশ করেন এডভোকেট ফরমান উল্লাহ খান। তাকে সহায়তা করেন জনাব মোঃ আফজাল হোসেইন। এভাবে চরম নিষ্ঠুরতায় পার্টি নেতা সিরাজ সিকদারের হত্যার পর অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে এবং সরকারি নিষ্পেষণে সর্বহারা পার্টির সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দেয়। জাতীয় পরিসরে পার্টির প্রভাব ও কর্মকান্ড এবং শক্তি ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে। নেতৃত্বের দুর্বলতায় কর্মীরা উদ্দামহীন হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। ফলে জনগণও হতাশ হয়ে সন্দিহান হয়ে উঠে সর্বহারা পার্টির ভবিষ্যত সম্পর্কে। এভাবেই সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর সাথে সাথে হঠাৎ করে জেগে উঠা গণমানুষের মুক্তির এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় স্বৈরশাসনের আগ্রাসী জিঘাংসায়।

শেখ কামাল প্রধানমন্ত্রীর জেষ্ঠ পুত্র ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টা করে

১৯৭৩ সালের শেষের দিকে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় অবস্থা। সেই সময় ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয় শেখ কামাল।

১৯৭৬ সালের শেষ নাগাদ দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। দেশে বিশৃংখলা সরকারের হাতের বাইরে চলে যায়। প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত লোকজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কিচ্ছা-কাহিনী তখন প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছিল। জনগণ খোলা দুর্নীতি ও লুটপাটের বিরোধিতা করছিল। দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্দ্ধগতি দৈনন্দিন জীবন সামগ্রী সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে গিয়ে দাড়িয়েছিল। জীবনধারণের নুন্যতম প্রয়োজন মেটাতে জনগণের তখন নাভিশ্বাস অবস্থা। এই অবস্থায় সরকার ৬৩ কোটি টাকার নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়লো। এতে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেল। ঐ নৈরাজ্যিক সময়ে এক লোমহর্ষক ব্যাংক ডাকাতি সংঘঠিত হয় রাজধানী ঢাকায়। প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশ ধাওয়া করে ডাকাতদের। ধাওয়াকালে দু'পক্ষেই গুলি বিনিময় হয়। ৬ জন ডাকাত ধরা পড়ে। এই ৬ জনের একজন ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের জেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল। শেখ কামালসহ কয়েকজন দুস্কৃতিকারী আহত হয় পুলিশের গুলিতে। কিন্তু পুলিশের বিবৃতিতে পরে বলা হয়, "দুস্কৃতিকারীদের ধাওয়াকালে দুর্ঘটনাক্রমে শেখ কামাল ও তার সঙ্গীরা পুলিশের গুলিতে আহত হয়।"

মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং আইনী সাহায্য প্রদান কমিটি' গঠন করা হয়

'মানুষের জীবন যখন প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল, জীবনের নিরাপত্তা হয়ে উঠেছিল অনিশ্চিত ঠিক তখনই কিছু বিবেকবান নাগরিক মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং আইনী সাহায্য প্রদান কমিটি গঠন করেন।

এ সময় ৩১শে মার্চ ১৯৭৪, জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সভায় মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ আহমদ শরীফ। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন কবি সিকান্দার আবু জাফর। এ ছাড়া মীর্জা গোলাম হাফিজকে আইন পর্যালোচনা সাব কমিটির, ডঃ আহমদ শরীফকে প্রকাশনা সাব কমিটির, বিনোদ দাশগুপ্তকে তথ্য অনুসন্ধান সাব কমিটির চেয়ারম্যান, এনায়েতউল্লাহ খানকে কোষাধ্যক্ষ, মওদুদ আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক ও সৈয়দ জাফরকে সহ-সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির ঐ সভায় জনগণের মৌলিক অধিকার ও তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ প্রস্তাবও গৃহিত হয়। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল :-

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'গণতন্ত্র' রাষ্ট্রের একটি নিয়ামক নীতি হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। ৩১, ৩২ এবং ৩৩ নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শাসনতন্ত্র মোতাবেক জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে এবং প্রত্যেক নাগরিকই নিজেকে গ্রেফতার ও আটকের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আইনের সাহায্য প্রার্থনা করার অধিকার ভোগ করবেন।

(২) কিন্তু এরূপ সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা সত্বেও উপরোক্ত শাসনতান্ত্রিক ওয়াদা এবং নাগরিক অধিকার খেলাপ করা হচ্ছে বলে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত খবর পাওয়া যায়। এসব খবরে জানা যায় যে, কোন আদালতে হাজির না করেই অসংখ্য লোককে গ্রেফতার করে আটক রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে এবং যে সব সংস্থার নাগরিকদের অধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার কথা তাদের হাতেই অনেক লোক শারীরিকভাবে গুম হয়ে যাচ্ছে।

(৩) কাজেই যেসব দায়িত্বশীল নাগরিক আইনের শাসনের বিশ্বাসী তাদের মতামত সংগঠিত করা দরকার। এবং এই কাজের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও শান্তিকামী ব্যাপক জণগণের মৌলিক অধিকার হরণের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অভিহিত করে জনমত সংগঠিত করা প্রয়োজন। যাতে শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত আইনের শাসনের নিশ্চয়তাকে নগ্নভাবে উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি নিপীড়নের কাজ চলছে তা প্রতিরোধ করা যায়।

(৪) এর সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি দায়িত্ব পালন করতে হবে। অনেকক্ষেত্রে আটক ব্যক্তিগণকে বিনা বিচারেই ধরে রাখা এবং অনেককেই আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই সাজা দেয়া হচ্ছে। সুতরাং এ ধরণের আটক ব্যক্তিদেরকে আইনের সাহায্য দেয়া প্রয়োজন।

(৫) আইনের এই সাহায্য দেয়ার জন্য উপযুক্ত সংগঠন ও ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

(৬) তহবিল ছাড়া সংগঠনের প্রয়োজনীয় কাজ যথাযথভাবে চালানো সম্ভব নয়। কাজেই সুষ্টভাবে এই কাজ চালানোর জন্য একটি তহবিল সৃষ্টি করাও প্রয়োজন।

(৭) এই কমিটির কাজ শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কমিটিকে একটি কার্যকর সংগঠন পরিণত করার জন্য এবং সারাদেশের জনগণ যাতে আইনের সাহায্য পেতে পারে তার জন্য জেলা পর্যায়ে এমনকি তার নিম্ন পর্যায়ে ও এই কমিটি গড়ে তুলতে হবে। যাতে করে নিম্ন আদালতেও জনগণ আইনের সাহায্য লাভ করতে পারে।

(৮) এই সংগঠন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাগরিক অধিকার রক্ষামূলক সমিতিগুলোর সঙ্গেও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখবে। ঐ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত প্রস্তাবলী ছিল নিম্নরূপ :-

দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১,৩২ এবং ৩৩ নং ধারায় ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে যে সমস্ত অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে সেগুলো নানান সরকারি বাহিনী ও প্রশাসন যন্ত্রের দ্বারা খর্ব বা হরণ করা হচ্ছে শুধু তাই নয়; নতুন নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংবিধানে প্রদত্ত অনেক অধিকারকে ইতিমধ্যেই কাগুজে অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। এই সভা সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারসমূহের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই সমস্ত আইন প্রত্যাহার করে নেয়া এবং বিভিন্ন সরকারি বাহিনীও প্রশাসন যন্ত্র কর্তৃক ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ ও হামলা বন্ধ করার জন্য সাধারণভাবে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তিকে কোন কারণ না দেখিয়ে অনির্দিষ্টিকালের জন্য আটক রাখা, যে কোন সংবাদপত্রকে যে কোন সময় বন্ধ করে দেয়া এবং ব্যক্তির মৌলিক অধিকারসমূহের উপর যে কোন প্রকার হামলার তীব্র নিন্দা করা হচ্ছে। সভা বিশেষ ক্ষমতা আইনকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং বর্তমান সংবিধানের বিরোধী বলে মনে করছে এবং তা বাতিল করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

রক্ষীবাহিনী আইনের মাধ্যমে যে সমস্ত ক্ষমতা রক্ষীবাহিনীর হাতে অর্পন করা হয়েছে সে ক্ষমতাগুলি এতকাল পুলিশের হাতেই একান্তভাবে ন্যস্ত ছিল। যে ক্ষমতা পুলিশের হাতে এতকাল ন্যস্ত ছিল এবং এখনও ন্যস্ত আছে সে একই ক্ষমতা আবার একটি নতুন বাহিনীর হাতে আইনের মাধ্যমে নতুন করে অর্পন করার উদ্দেশ্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের প্রচেষ্টা নয় বরং নানা ক্ষেত্রে যারা সরকারি নীতির সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার হরণ এবং তাদের উপর রাজনৈতিক নির্যাতন পরিচালনা করাই হল এর প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় রক্ষীবাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদপত্রে বহু বিবরণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। কমিটি রক্ষীবাহিনীর এই নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করছে এবং রক্ষীবাহিনী আইন বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সভা বর্তমান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য ব্যক্তিকে বিনা বিচারে এবং কোন কারণ না দেখিয়ে এ দেশের নাগরিকদের জেলে আটক রাখার নীতি ও কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করছে এবং বিনা বিচারে আটক সকল বন্দীর আশু মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত হয়েছে। সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সরকার বিভিন্ন বিরোধী মতালম্বী সংবাদপত্রের ওপর নিয়মিত হামলা করে সংবাদপত্র সম্পাদক ও কর্মীদের উপর রাজনৈতিক নির্যাতন চালাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে প্রচলিত সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারসমূহ নিজেরাই খর্ব ও হরণ করেছে। দৈনিক গণকন্ঠের ওপর সামপ্রতিক হামলা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই সভা বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এবং মৌলিক অধিকার

সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির কার্যকরী সংসদের সদস্য গণকন্ঠ সম্পাদক জনাব আল মাহ্‌মুদসহ অন্যান্য আটক বা গ্রেফতারী পরোয়ানাপ্রাপ্ত সংবাদপত্র কর্মীদের মুক্তি ও তাদের বিরুদ্ধে জারিকৃত পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে।

২৯শে অক্টোবর সারাদেশে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। একই দিন মজুতদারী আর কালোবাজারের দায়ে আওয়ামী লীগের আর একজন সংসদ সদস্য গ্রেফতার হন। ৩০ তারিখে লবন মজুতের জন্য আওয়ামী লীগের এমপি ডঃ শামসুদ্দিন আহমদকে গ্রেফতার করা হয়।

এ অবস্থায় মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির উদ্যোগে ১লা নভেম্বর ১৯৭৪ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে শিক্ষক, আইনজীবি, চিকিৎসক, লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, চিত্রশিল্পী ও ছাত্রসহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা বাংলাদেশের বর্তমান মন্বন্তর প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সমাবেশে যোগদান করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বুদ্ধিজীবিদের এত বিরাট সমাবেশ ইতিপূর্বে আর অনুষ্ঠিত হয়নি। 'মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির' সভাপতি সিকান্দার আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুই ঘন্টার উপর এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন এডভোকেট মির্জা গোলাম হাফিজ, ডঃ আহমদ শরীফ, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ, এনায়েত উল্লাহ খান, কামরুন্নাহার লাইলী, নিজামুদ্দিন আহমদ, মহিউদ্দিন আলমগীর, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মুহাম্মদ জাকারিয়া এবং বদরুদ্দিন উমর। সমাবেশে বিদ্যমান মন্বন্তর পরিস্থিতি ও মৌলিক আধিকার সম্পর্কে ১৭টি প্রস্তাব গৃহিত হয়। সমাবেশের পর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গন থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত যায় এবং সেখানেই সমাবেশের কর্মসূচী শেষ হয়। সমাবেশে গৃহিত প্রস্তাববলীর বিবরণ:-

১৯৭৪ সালের ১লা নভেম্বর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মন্বন্তরের গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাকেও অতিক্রম করেছে এবং এই মন্বন্তর, বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্টি হয়নি বরং শাসকশ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের গণবিরোধী নীতি ও কর্মকান্ডেরই প্রত্যক্ষ পরিণতি। সমাবেশের প্রস্তাবে এই মন্বন্তরকে 'প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা' বলে বর্ণনা না করে একে মন্বন্তর বলে ঘোষণার জোর দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবে বৈদেশিক সাহায্যের একটি শ্বেতপত্র ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

সমাবেশের প্রস্তাবে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনে সরকারের বিরোধিতার নিন্দা করে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করার দাবি জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে বিরোধী দলসমূহের প্রতি উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের আহ্‌বান জানানো হয়। এছাড়াও রেশনিং এলাকা সম্প্রসারন ও টেষ্ট রিলিফ চালু করার দাবি জানানো হয়। সমাবেশের প্রস্তাবে লঙ্গরখানার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেখানে নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন সমাবেশে রেডক্রসের চেয়ারম্যান হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়। রাজনৈতিক নির্যাতন বন্ধ ও মিথ্যা মামলায় আটক ও বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবি জানানো হয়।

দেশবাসীর মৌলিক অধিকার প্রশ্নে জুলাই মাসে 'মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি'-র কার্যনির্বাহী পরিষদ জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির ক্রমাবনতি এবং এ বিষয়ে সরকারি নীতি লক্ষ্য করে এক বিবৃতিতে বলেন, ''বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে সরকার বিরোধী মতামত ও সরকার বিরোধী ব্যক্তিদের দমন করার জন্য রক্ষীবাহিনীকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। তারা 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' এর অস্ত্র দ্বারা নিজেদেরকে সজ্জিত করেছেন। বাহ্যতঃ সমাজ বিরোধী লোকদের মোকাবেলা করার জন্য প্রণীত এই আইন বস'ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলোর ওপর দমন

নির্যাতনের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' এর স্থল ও দারুন অপব্যবহার এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বেপরোয়া রক্ষীবাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে সরকার মূলতঃ ব্যাপকভাবে জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন।

সব ধরণের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেই রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং রক্ষীবাহিনী আইনের মধ্যেও তাদেরকে আদালতে উপস্থিত করার যে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা আছে তা না করে তাদের উপর তারা হিংসাত্মক শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অস্বাভাবিক নির্যাতন ও তাদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টির কাহিনী বিভিন্ন সংবাদপত্রে এমনকি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের মাধ্যমেও ফাঁস হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ সরকার বিরোধী দলীয় মতামতকে দমনের চেষ্টা করছেন শুধু তাদেরকে জেলে দিয়ে এবং নির্যাতন ও শারীরিকভাবে খতম করেই নয়; তারা এর জন্য ১৪৪ ধারাও দেশব্যাপী জারি করেছেন। বাহ্যতঃ এটা তারা করেছেন দুই মাস পূর্বে আরম্ভ করা তাদের তথাকথিত শুদ্ধি অভিযানের সুবিধার জন্য। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হল এ দেশে বিরোধী মতামত প্রকাশ ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে সংগঠিত হতে না দেওয়া। আর একটি বিষয়ে আমরা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। একমাত্র সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই মত প্রকাশে যারা ইচ্ছুক তাদেরকে তা প্রকাশ করার অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে ভয়ানক রকম কড়াকড়ি করে এবং নিউজপ্রিন্টের কোটা দিতে অস্বীকার করে সরকার বর্তমানে বিরোধী দলীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোর প্রকাশনা ক্ষেত্রে নিদারুন অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন। উপরে উল্লেখিত ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি কারাগারের অবস্থার উন্নতি ও রাজনৈতিক বন্দীদের আশু মুক্তি দাবি করছে।

জনগণের আশা এবং প্রত্যাশা এবং নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতা

জনগণ সর্বকালে ত্যাগের বিনিময়ে কিছুই পায়নি কিন্তু নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করে ফুলে ফেপে কলাগাছ হয়েছেন।

সদ্যমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ। অনেক আশার বাংলাদেশ। জনগণকে সোনার বাংলার যে স্বপ্ন নেতারা এতদিন দেখিয়ে এসেছেন তা বাস্তবায়িত করার সুযোগ এসেছে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে। জাতীয় পরিসরে মুক্তি সংগ্রাম শ্রেণীভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে-চুড়ে একাকার করে দিয়েছে। ফলে শ্রেণীভেদের অহমিকা ভুলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা : নেতারা তাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠি এবং দলীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জাতীয় স্বার্থে জনগণকে একত্রিত করে তাদের দেশপ্রেম এবং কর্মউদ্দীপনাকে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পূর্ণগঠন করে গড়ে তুলবেন এক সোনার বাংলা। সমৃদ্ধ এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ভর করে বিশ্ব পরিসরে সর্গবে মাথা উচুঁ করে দাড়াবে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক। অতীত ঐতিহ্য, নিজস্ব স্বতন্ত্রতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুদূরপ্রসারী বিচক্ষণতা, সঠিক দিক নির্দেশনা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, কঠিন পরিশ্রম সর্বোপরি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতিকে আত্মমর্যাদাশীল করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাংলাদেশকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে উন্নতির চরম লক্ষ্যে। সুখী সমৃদ্ধ এবং গতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলে তার সুফল প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেবার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। লাখো শহীদের রক্তের বদলে অর্জিত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে অর্থবহ।

কিন্তু জনগণের মনে অনেক সন্দেহ। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের রাজনীতিতে কাজের চেয়ে কথার ফুলঝুরি ঝরেছে বেশি, তার চেয়ে বেশি থেকেছে প্রতিশ্রুতি। 'ক্ষমতায় গেলে জনগণের সার্বিক মুক্তি এনে দেব' এ ধরণের গালভরা বক্তব্য জনগণ হামেশাই শুনে এসেছে দীর্ঘকাল থেকে। কিন্তু 'যেই গেছেন লংকা সেই হয়েছেন রাবন' অর্থাৎ ক্ষমতায় গিয়ে বক্তৃতাকারীরাই নির্মমভাবে পদদলিত করেছেন জনগণ এবং জনগণের দাবিকে। এর মূলে রয়েছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গণবিচ্ছিন্নতা। দেশের ব্যাপক জনগণের সাথে তাদের কোন সংযোগ নেই। এখানে শাসকের সাথে শাসিতদের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। তাই শাসক গোষ্ঠির বক্তৃতা-বিবৃতি সাধারণ মানুষকে আলোড়িত করে না। তারা যখন যা খুশি তাই বলেন, তাই করেন। নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে তাদের নীতি ও কাজ হালাল করে নেন। জনগণ ঘুরে ফিরে একই প্রতারণার শিকারে পরিনত হয় বারবার। মোহ এবং ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ রাজনীতিকরা নির্দ্বিধায় বিসর্জন দেন সাধারণ গণমানুষের স্বার্থ।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৪৭ সাল হতে পরবর্তিকালে যত সরকার এসেছে তারা প্রত্যেকেই মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন ধূঁয়া তুলেছে। ১৯৪৭ সালে সুবিধাবাদী নেতৃত্ব ধূঁয়া তুললেন ইসলামের। ধর্মপ্রাণ মানুষ অতি সহজেই মোহিত হয়েছিল সেই ধূম্রজালে। ১৯৫২ সালে তারা ভাষা আন্দোলনকে আখ্যায়িত করলেন ইসলাম বিরোধী সংগ্রাম বলে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে এলান করলেন মৌলিক গণতন্ত্রের। মানুষ বারবার আশাহত হয়েছেন এসমস্ত সরকারের কাছ থেকে। তাদের বিভিন্ন সব শ্লোগান পরিণত হয়েছে শুধু ফাঁকা আওয়াজে। সাধারণ মানুষের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার বোঝা ক্রমান্বয়ে গিয়েছে বেড়ে। গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে সামাজিক সংকট। অর্থনৈতিকভাবে তারা হয়েছেন দেউলিয়া। পরিণামে জনগণ হয়েছে পশ্চাদমুখী। তাই শুনতে পাই তাদের আক্ষেপ, "পাক আমলেই ভালো ছিলাম। বৃটিশ আমলে ছিলাম আরও ভালো।" ১৯৭১ সালের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতাদের মন-মানসিকতায় কোন গুনগত পরিবর্তন আনতে পারেনি। তাই তারাও তাদের পূর্বসুরীদের মত সদ্য

স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পন করেই পুরনো কায়দায় ধুঁয়া তুললেন মুজিববাদ কায়েম করতে হবে। কিন্তু মাত্র সাড়ে চার বছরের মাথায় যখন মুজিববাদের অসাড়তা পূর্ণমাত্রায় প্রমাণিত হল তখন জনাব শেখ মুজিব আবারো একই কায়দায় সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী প্রণয়ন করে এবং জরুরী আইন ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা নিজ হাতে কুক্ষিগত করে একনায়কত্ব ও একদলীয় শাসন বাকশাল কায়েম করেন। নজীরবিহীন তার এই শাসনতান্ত্রিক ক্যু'কে তিনি তার 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন। তার এই সর্বক্ষমতা হরণের ফলে বাহ্যিকভাবে অবস্থা স্থিতিশীল মনে হলেও দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। এই অবনতির একটি প্রধান কারণ ছিল শেখ মুজিব ও তার সরকার মনে করত কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি এবং ক্ষমতাবলয়ের লোকজনের মাঝে সুখ-সুবিধা বন্টন করে তাদের খুশি রাখতে পারলেই ক্ষমতায় থাকার সমর্থন লাভ করা যায়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, আদর্শ অথবা নীতিগত বিশ্বাসের অভাব সর্বোপরি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের সমস্যাদি এবং সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রামের মাধ্যমে সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের পূর্ণগঠনের সমস্যা সম্পর্কে তার জ্ঞানের অভাবের জন্যই শুধুমাত্র সুখ-সুবিধা বন্টনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। যে কোন নীতি নির্ধারনের ব্যাপারে তিনি তার অভিমতকেই প্রাধান্য দিতেন। কারো কোন যুক্তিই তার কাছে গ্রহণযোগ্য হত না। তার এই সবজান্তা ভাবও তার প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। পার্টি ও রাষ্ট্র সম্পর্কের ব্যাপারেও তার যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব ছিল। ঐ ধরণের মানসিকতার জন্যই ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের সাথে শেখ মুজিবের মতবিরোধ ঘটে। জনাব খানের অভিমত ছিল প্রশাসনকে নির্দলীয় রাখতে হবে। প্রশাসনের উপর কোন প্রকার দলীয় প্রভাবের ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ বিঘ্নিত হবে। কিন্তু শেখ মুজিব তার এই মনোভাবের বিরোধিতা করে যুক্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, "পার্টির আনুগত্যকে প্রাধান্য দিতে হবে প্রশাসনকে তাদের নিরপেক্ষতা বর্জন করে। শুধু তাই নয় আওয়ামী লীগের দলীয় সদস্যদের কাজকে সহায়তা করাই হবে প্রশাসনের সার্বিক দায়িত্ব এবং এভাবেই আওয়ামী লীগের প্রভাব বাড়তে সহযোগী হতে হবে প্রশাসনিক যন্ত্রকে।" শেখ মুজিবের দাপটের কাছে জনাব আতাউর রহমান খানকে নিশ্চুপ থাকতে হয়। ফলে ১৯৫৬-৫৭ সালে শেখ মুজিব যখন শিল্পমন্ত্রী তখন তার বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়। তিনি তার সরকারি ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে তার প্রিয়জন ও পার্টির লোকদের অনেক পারমিট, ব্যাংক লোন, ইনডেটিং লাইসেন্স, শিল্প কারখানা গড়ার পারমিশন প্রভৃতি করিয়ে দেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও তিনি তার স্বভাবসুলভ প্রথায় তার পার্টির লোকজনদের নানাভাবে খুশি রাখার চেষ্টা করেন। কাউকে দেয়া হয় টাকা, কাউকে চাকুরী, কাউকে অযৌক্তিক পদোন্নতি, কাউকে বানানো হয় রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। এভাবেই দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই অযোগ্য ও অসৎ পরিচালকগণ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মেশিনপত্র, স্পেয়ার পার্টস, কাচাঁমাল ভারতে পাচাঁর করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠেন। সব রকম দেশী ও বিদেশী আমদানিকৃত পন্য সরবরাহ করা হত লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলারদের মাধ্যমে। তাদের সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগের সুপাত্রগণ!

তাদের কেউই পেশাগতভাবে ব্যবসায়ী ছিল না। তারা তাদের লাইসেন্স পারমিটগুলো মধ্যসত্ব ভোগী হিসাবে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিত। ফলে জিনিসপত্রের দাম অনেকগুন বেড়ে যেত। এছাড়া পাকিস্তানী নাগরিকদের পরিত্যাক্ত ৬০,০০০ বাড়ি আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এভাবেই শুধু নয়, আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের যোগ-সাজসে পাট, চাল, অন্যান্য কাচাঁমাল ও রিলিফের বিস্তর মালামাল ভারতে পাচাঁর করা হয়। এরই ফলে ব্যাঙের ছাতার মত দেশে একশ্রেণীর হঠাৎ করে আঙ্গুল ফুলে ভূঁইফোড় বড়লোকের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আমার সাথে শেখ মুজিবের একান্ত আলাপের সময় প্রধানমন্ত্রীর একটি মন্তব্য উল্লেখ্য।

মুজিব পরিবারের সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কারণে আমি প্রায়ই যেতাম ৩২নং ধানমন্ডিতে। কখনো তিনি ডেকে পাঠাতেন, কখনো যেতাম স্বেচ্ছায়। এমনই একদিন দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তাকে বলেছিলাম,
-দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আপনার পার্টির লোকজনদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আপনি জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন।
জবাবে তিনি বলেন,
-আমার দলের লোকজন কি পাক আমলে নির্যাতন ভোগ করে নাই? তারা কি ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই? তারা কি বিষয়-সম্পদ খোয়ায় নাই? আজ যদি তারা কিছুটা সুযোগ-সুবিধা পেয়েই থাকে তাইলে দোষের কি আছে? তাদেরতো আমি ফালাইয়া দিতে পারি না। এতে কেউ বেজার হইলে আমি কি করতে পারি।

এমন একটি জবাবের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মনে মনে ভেবেছিলাম, আজতো তিনি জাতীয় নেতা, রাষ্ট্রের কর্ণধার। জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শুধু দলীয় স্বার্থ বড় করে দেখা কি তার উচিত? জাতিই বা সেটা আশা করে কি? এ বিষয়ে আর আলাপে না গিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিলাম এক অর্বণনীয় অস্বস্তি নিয়ে। শাসকদলের এই সমস্ত নব্য পুজিঁপতিরা জাতীয় অর্থনীতিতে কোন প্রকার বিনিয়োগ করেননি, তারা শুধু যা ছিল সেটাকেই লুট করে বড়লোক হয়েছেন। জাতীয় সম্পদ শুষে নিয়ে খোকলা করে দিয়েছেন অর্থনীতিকে। এভাবে পাকিস্তানের ২২ পরিবারের মত রাতারাতি বাংলাদেশ কয়েক হাজার পরিবার সৃষ্টি করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের প্রভাবে পরিচালিত দল আওয়ামী লীগের মাধ্যমে শেখ মুজিব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। জ্ঞানের অভাব নাকি জনতাকে বোকা বানাবার অতি চালাকি বোঝা মুশকিল! শুধু যে কর্মীরা অসৎ হয়ে উঠেছিল, তা নয়। মুজিব পরিবারের সদস্যগণ ও তার আত্মীয়-স্বজনও দুর্নীতি ও চোরাচালানে জড়িয়ে পড়েন। শেখ মুজিবের অতি বিশ্বাসভাজন গাজী গোলাম মোস্তফা জাতীয়ভাবে 'কম্বল চোর' উপাধি পান এবং রিলিফের জিনিসপত্র নিয়ে কেলেংকারী ও চোরাচালানের জন্য আর্ন্তজাতিকভাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি রেডক্রসের চেয়ারম্যান ছিলেন। শেখ মুজিবের ছোট ভাই শেখ নাসের শুধু খুলনায় বাড়িঘর এবং অবাঙ্গালীদের ব্যবসা-বাণিজ্য হাতিয়েই ক্ষান্ত হননি। ভারতে চোরাচালানের রিং লিডারও ছিলেন তিনি। শেখ মুজিবের প্রত্যেকটি ভাগীনা (শেখ মনি, আবুল হাসনাত, শেখ শহিদুল ইসলাম) মামুর জোরে শুধু যে রাজনৈতিক আধিপত্যই বিস্তার করে রাতারাতি নেতা বনে যান তাই নয়; অসৎ উপায়ে অর্জিত ধনদৌলতের পাহাড় গড়ে তোলেন তারা। শেখ মুজিবের পুত্রদ্বয় বিশেষ করে শেখ কামালও অসৎ উপায়ে টাকা-পয়সা আয় করতে থাকে। এক ব্যাংক ডাকাতির সাথে শেখ কামালের জড়িত হয়ে পড়ার ব্যাপারে পূর্বেই বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

আওয়ামী সরকারের আমলে দুর্নীতি সম্পর্কে বিখ্যাত সাংবাদিক জনাব লরেন্স লিফসুলজ ৩০শে আগষ্ট ১৯৭৪ সালে **Far Eastern Economics** এ লিখেন, "অসৎ কাজ ও অসাধু তৎপরতা কোন আমলেই নতুন কিছু নহে। কিন্তু ঢাকাবাসীদের অনেকেই মনে করেন যেভাবে মুজিব আমলে সরকারের ছত্রছায়ায় খোলাখুলিভাবে দুর্নীতি ও জাতীয় সম্পদের লুটপাট হয়েছে তার নজির ইতিহাসে বিরল।" স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে লুটপাট ও দুর্নীতির ফলে কোনরূপ অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক সুফল লাভ করা সরকারের পক্ষে ছিল অসম্ভব। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কহীন পরগাছার মত গজিয়ে উঠা নব্য ধনীদের বিলাসবহুল জীবনধারা ও সহজ উপায়ে অর্জিত অর্থের অস্বাভাবিক অপচয় জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছিল একদিকে, অন্যদিকে তাদের নীতি বর্জিত ক্রিয়াকর্ম সরকার ও সরকারি দলের ভাবমুর্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল জনসাধারণের চোখে। আওয়ামী লীগের পক্ষে সেই হারানো মর্যাদা আর কখনো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। মানুষের আকাশচুম্বি চাহিদা এবং সীমিত জাতীয় সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কিছু লোককে ফায়দা দিতে পারলেও বেশিরভাগ জনগণের কাছ থেকে সরকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে সোনার

বাংলায় গড়ে তুলে সুষম সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে আওয়ামী লীগ সরকার এ ধরণের পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতি প্রতিষ্ঠিত করবে সমাজের প্রতি স্তরে, এটাকে জনগণ জাতীয় বেঈমানীর সমান বলেই মনে করেছিল। আওয়ামী নেতৃত্বের প্রতি তারা বীতঃশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জনগণের আস্থা হারায় আওয়ামী লীগ। শুধু তাই নয় জনগণের সাথে সাথে ক্ষমতাবলয়ের বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের আস্থা থেকেও বঞ্চিত হয় আওয়ামী সরকার। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল প্রশাসন, ছাত্র ও যুব সমাজ, মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা বাহিনী।

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের ৮ কোটি লোকের অন্নের সংস্থান করা ছিল অতি দুরূহ কাজ। বৈদেশিক বন্ধুরাষ্ট্রগুলো এবং সাহায্য সংস্থাগুলো মুক্তহস্ত নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের জন্য। তাদের সহানুভূতির ফলে ১৯৭৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সর্বমোট ১৩৭৩ মিলিয়ন ডলার ঋণ ও অনুদান লাভ করতে সমর্থ হয়। এছাড়া ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত **UNROB** এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণের রিলিফ সাহায্যও দান করা হয় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে।

মাওলানা ভাসানী ছিলেন দিব্যদৃষ্টির অধিকারী

বাংলাদেশের পরিসীমা সম্পর্কে মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পরিষ্কার। কিংবদন্তীর নেতা আমাদের শেষ বৈঠকে সেটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে তিনি লন্ডন গিয়েছিলেন অপারেশনের জন্য। আমিও তখন লন্ডনেই অবস্থান করছিলাম। খবরটা তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। খবর পেয়েই তিনি একদিন আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধু সাংবাদিক জনাব গাজীউল হাসান খানের মাধ্যমে ডেকে পাঠান। সময়মত আমি ও গাজী তার ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম সকাল ১০টার দিকে। হাসপাতাল থেকে অপারেশনের পর বাংলাদেশ দূতাবাসই তাকে সেই ফ্ল্যাটে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম তার পুত্র জনাব নাসের খান ভাসানী মাওলানা সাহেবের ঘরে উপস্থিত রয়েছেন। হুজুর আধশোয়া অবস্থায় বিছানায় চোখ বন্ধ করে নিশ্চুপ হয়ে কি যেন ভাবছিলেন! অপারেশনের ক্ষত তখনও শুকায়নি। চলাফেরা, পথ্য সব কিছুই রেসট্রিকটেড। আমরা এসেছি শুনে তিনি চোখ মেলে আমাকে ইশারায় তার বিছানায় গিয়ে বসতে বললেন। আমি তার আদেশ অনুযায়ী তাঁর শিয়রে গিয়ে বসলাম। গাজী কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিল। সালাম দোয়ার পর হুজুর জিজ্ঞেস করলেন,

-নাস্তা করছস?

-হ্যাঁ হুজুর, নাস্তা কইরাই আইছি। জবাব দিলাম।

-ভালো কথা। তাইলে আমারে নাস্তা খাওয়া। আমি ডিম খামু। স্বল্প দূরে দাড়িয়ে থাকা জনাব নাসের ভাসানীর সাথে চোখাচোখি হল। নিচুগলায় তিনি আপত্তি জানালেন। বললেন,

-ডাক্তারকে না জানিয়ে ডিম দেয়া ঠিক হবে না। ক্ষেপে গেলেন মাওলানা। জেদ ধরে বসলেন ডিম তিনি আজ খাবেনই। অগত্যা দু'টো ডিমের পোঁচ করে আনলেন নাসের ভাসানী। ডিমের প্লেটটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ইশারায় সেটা আমাকে দিতে বলে তাকে বাহিরে গিয়ে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত দিলেন মাওলানা। নাসের ভাসানী চলে গেলেন। গাজী বসে আছে চুপচাপ। হুজুর বললেন,

-নে শুরু কর। খাওয়াইয়া দে।

আমি আস্তে একটু একটু করে চামচ দিয়ে তাঁকে ডিম খাওয়াতে শুরু করলাম। এ বয়সে অপারেশনের ধকলে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কথা বলছিলেন অতি ক্ষীণ স্বরে। খাওয়ার ফাকেই তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে নিলেন। লন্ডনে কবে এলাম? কেন এলাম? পরিবার কোথায়? সবকিছুরই সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম। খাওয়া শেষে মুখ ধুইয়ে মুছে দিলাম। খাওয়ার পর কিছু ঔষধ খাওয়ার ছিল সেগুলোও তাকে খাইয়ে দিলাম। এবার তাকে কিছুটা রিলাক্সড মনে হচ্ছিল। পাশে বসে আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। লক্ষ্য করলাম, মাওলানা যেন কোন এক গভীরে তলিয়ে গেছেন। বেশ অনেকক্ষণ পর হঠাৎ করেই বলা শুরু করলেন,

-বাবা, ৯৭ বছরের বেশি বয়স হইয়া গেছে। কবে আছি, কবে নাই কে জানে! তবে একটা কথা তোরে কইয়া যাইবার চাই। এ বুড়া সারাজীবনে যা করতে পারে নাই তুই ও তোর সাথীরা সেটা কইরা বাংলাদেশের ১০কোটি জনগণরে বাচাঁইছোস জালেমের হাত থ্যাইকা। এ বুইড়া তোদের দোয়া দিতাছে, আল্লাহ তোদের হায়াত দারাজ করুক। বলেই তিনি আমার মাথায় গায়ে তার ক্ষীণ হাত বুলিয়ে শরীরে, বুকে ফুঁক দিলেন। তার চোখের কোল ঘেষে তখন পানি বেরিয়ে এসেছে। চোখ বোঁজা অবস্থায় তিনি আমার জন্য দোয়া করছিলেন বিড়বিড় করে। কাছে বসেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম না কোন সুরা বা আয়াত পড়ছিলেন তিনি। আমি তার অশ্রুধারা মুছিয়ে দিয়ে আবেগে বিহ্বল হয়ে বসে রইলাম। আমার প্রতি তার স্নেহ ও মমতা দেখে আমার চোখ দু'টোও অশ্রুসজল হয়ে উঠল। কেমন যেন এক ঐশ্বরিক স্তব্ধতায় মহীয়ান হয়ে চোখ বুজে ছিলেন

কিংবদন্তীর নায়ক বাংলাদেশের মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী। সে এক অভূতপূর্ব পরিবেশ! অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তার হাত ধরে নিশ্চুপ বসে থাকলাম। তিনি চোখ খুললেন,
-বাবা, তোর জায়গা লন্ডন না, দেশে যাইতে হইবো।
হুজুরের কথার জবাব কি দেব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সে সময় আমাদের সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কিছু রাজনৈতিক বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। ভাবছিলাম হুজুরকে সব খুলে বলবো কিনা। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনিই বলে উঠলেন,
-জিয়ার সাথে মতের অমিল হইছে; সেইডা আমি জানি; কিন্তু জিয়ারই সব ভুল। আমি গিয়া তারে বুঝামু। কথা শুনলে ভালো আর না বুঝলে আমি জানি কি করতে অইবো। তুই তৈরি থাকিছ। তবে বাবাজান একটা কথা। বুড়া মানুষের কথাটা মন দিয়া হুনিস। যে কাজ শুরু করছস তার শেষ বহুদূরে। বাংলাদেশের মধ্যেই চোখ বন্ধ কইরা উট পাখি হইয়া বইসা থাকলে চলব না। চোখ খুইলা চাইতে হইবো সীমানার বাইর। কথাটা একটু ভাল কইরা চিন্তা কইরা দেখিছ।
কথা বলতে বলতে তিনি বেশ কিছুটা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। আমি আস্তে আস্তে তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম,
-হুজুর আপনি দোয়া করবেন যাতে আমি আমার নিয়তে কায়েম থাকতে পারি। আল্লাহ্পাক যেন আমারে সুযোগ দেন যাতে একজন মুজাহিদ হিসাবে আপনার ইশারা অনুযায়ী সঠিক রাস্তায় বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে প্রয়োজনে কোরবান করতে পারি।

আমার জবাব শুনে বিছানায় শুয়েই তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। তার উষ্ণতা ও আন্তরিকতায় আমার বুক ভরে উঠেছিল। ডাক্তার এসে গেছে। আমাদের বিদায় নিতে হবে। সালাম করে আমি আর গাজী বেরিয়ে এলাম। বুকের মাঝে গেথে নিয়ে এলাম মহান নেতার অমূল্য দিক নির্দেশ। সেটাই মাওলানা ভাসানীর সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। এর অল্প কিছুদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। তার মৃত্যুতে জাতি হিসেবে আমরা হারালাম একজন জনদরদী অভিজ্ঞ মুরুব্বী এবং দূরদর্শিতা সম্পন্ন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ।

অর্থনৈতিক সংকট, হতাশা, শেখ মুজিবের ভারত তোষণ নীতি এবং দুর্নীতিপরায়ন অত্যাচারী সরকার সর্ম্পকে জনগণের নেতিবাচক মনোভাব, আইন-শৃঙ্খলা ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য সবকিছু মিলিয়ে দেশে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে তখনকার সবকয়টি প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক দল। আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অগ্রণীর ভূমিকায় এগিয়ে আসেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী। দেশের সাধারণ গণমানুষের মুক্তির স্বপ্ন চিরজীবন দেখেছেন মাওলানা ভাসানী। মার্কসীয় দর্শনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের মুক্তি আসতে পারে এটা সম্পূর্ণভাবে মাওলানা ভাসানী কখনই মেনে নেননি। ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাষ্ট্রীয় ধারণাকে তিনি অধুনাকালের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লিবক রাষ্ট্রীয় চেতনায় বাস্তবায়িত করে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি এনে রাষ্ট্রীয় দুঃশাসনের অবসান করতে চেয়েছিলেন তিনি। তার রাজনৈতিক চিন্তার ব্যাখ্যায় তিনি সর্বদা স্রষ্টা ও সৃষ্টির হকের কথা বলতেন। এ সমস্ত কিছু নতুন কথা নয়। ইউরোপীয় রাজনৈতিক দর্শন, ক্রিশ্চিয়ান সোস্যালিজম ও আঞ্চলিক সাম্যবাদ, ইউরো কম্যুনিজম এর মধ্যেও একই ভাবধারা বিরাজমান। ইন্দোনেশিয়ার সুকার্নো চেয়েছিলেন ধর্ম, জাতীয়তাবাদ এবং কম্যুনিজমকে একত্রিকরণের মাধ্যমে 'নাসাকম' কায়েম করতে। পরে কম্যুনিজম বাদ দিয়ে সে জায়গায় সোস্যালিজম গ্রহণ করে তিনি স্থাপন করেন 'নাসাসোস'। মাওলানা ভাসানী চেয়েছিলেন ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ে কায়েম করতে 'হুকুমতে রব্বানিয়া'। ১৯৭১ সালে ভারতে নজরবন্দী হিসেবে মাওলানা ভাসানীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব সাইফুল ইসলাম যখন শেষ বিদায় নিয়ে দেশে ফিরছিলেন তখন মাওলানা ভাসানী তাকে বলেছিলেন,
-চাইছিলাম লন্ডন যাব, প্রবাসী সরকার গঠন করব। কিন্তু কুটুম বাড়ি বেড়াইয়া গেলাম। অনেক বড় স্বপ্ন দেইখা দায়িত্ব কান্ধে নিয়া আমার সাথে আসছিলা। স্বপ্ন আমারও ছিল, বাংলার দুঃখী গরীব মানুষের মুক্তির স্বপ্ন। সেটা পাইতে হইলে আর একটা লড়াই লড়তে হইবো। এতো রক্ত

ঝরাইলো কিন্তু দ্যাশের মানুষ তো মুক্তি পাইবো না। আধা স্বাধীনতা নিয়া দ্যাশে ফিরলে আবার লাইগবো খটাখটি, তাই ভাইবতাছি----।
-হুজুর কথা ঠিক! কিন্তু সে লড়াইতো বাইরের দুশমনের সাথে সরাসরি নয়। দেশের মধ্যেই সে লড়াই ঘরে ঘরে।
-সেই জন্যই আরও কঠিন আরও হিংসার মনডা পোক্ত কইরা নিয়া যাইতে হইবো।

একাত্তরের বিচক্ষণ নেতা তার অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতের যে অবস্থা দেখেছিলেন ঠিক সে অবস্থাই পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছিল মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী-বাকশালী চক্র বাংলার মাটিতে স্বৈরশাসনের একনায়কত্ব কায়েম করে। স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে জনগণকে মুক্ত করার সংগ্রামে অগ্রণীয় ভূমিকা গ্রহণ করে অকুতোভয় মাওলানা ভাসানী ১৯৭১ সালে জনাব সাইফুল ইসলামের কাছে তার ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ঠিক সেই দায়িত্বই আন্তরিকভাবে পালন করেন। দেশ ও জনগণের স্বার্থের প্রশ্নে আপোষহীন ছিলেন মাওলানা। না ভারতের প্রতি দুর্বলতা, না পাকিস্তানের পায়রবী। প্রয়োজনে চৈনীক নীতির তিরষ্কার, মার্কিনীদের অবিশ্বাস, সোভিয়েতের সমালোচক - এই হল সিংহ পুরুষ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

মুজিবের সময় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

মুজিব সরকারের 'দাস-প্রভু' সম্পর্ক জনগণের মনে ভারত বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে।

পাকিস্তানী বাহিনীর সারেন্ডারের পর ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশী সরকারের অনুরোধে বাংলাদেশে থেকে চলে যায়। বিজয়ী সেনা হিসেবে বা অন্য কোন কারণেই হোক চলে যাবার আগে তারা হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র, ভারী কামান, ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদ, যুদ্ধের অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং মিল কারখানার মেশিনপত্রও খুলে নিয়ে যায় ভারতে। তারা অধিকৃত শহর ও সেনানিবাসগুলো থেকে আসবাবপত্র, ফিটিংস ফার্নিচার, এমনকি কমোড-বেসিন পর্যন্ত খুলে নিয়ে যেতে থাকে। অনিক পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর ইস্যুতে ছাপা হয়, "ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে সর্বমোট ১০০০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র, মেশিনপত্র, যুদ্ধ-সরঞ্জাম ও কাচাঁমাল ভারতে নিয়ে যায়।" স্বাধীনতার পর খুলনায় ডেপুটি কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত জনাব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ভারতের কাছে সরকারিভাবে এক প্রটেষ্ট নোটের মাধ্যমে জানান যে, তার জেলা থেকে ভারতীয় বাহিনী লক্ষ লক্ষ টাকার মালসামগ্রী অন্যায়ভাবে ভারতে নিয়ে গেছে। তিনি ভারতীয় বাহিনীর এ ধরণের লুটপাটের ঘোর বিরোধিতা করেন। ভারত ও পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে আগেও চোরাকারবার চলতো। কিন্তু বাংলাদেশ হবার পর চোরাকারবারের মাত্রা বেড়ে যায় চরমভাবে। স্বাধীনতার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সীমান্ত সম্পূর্ণ খোলা রাখা হয়। মাওলানা ভাসানী দাবি করেন, "বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক নিয়ে যাওয়া অস্ত্র ও যুদ্ধসম্ভার এবং চোরাচালানের মাধ্যমে সর্বমোট ৬০০০ কোটি টাকা মুল্যের জিনিসপত্র ও কাঁচামাল ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত সময়ে চোরাচালানের মাধ্যমে ২০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের দ্রব্য সামগ্রী ভারতে পাচাঁর হয়েছে বলে দাবি করেন বাংলা সংবাদপত্র অনিক। বাংলাদেশ সরকার দেশে ফিরেই ভারতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রফতানির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা উঠিয়ে নেয়। এর ফলে খোলা বর্ডার দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে উৎপাদিত পাট ও পাটজাত দ্রব্যের একটি বৃহৎ অংশ ভারতে চলে যাওয়ার পথ আরো সুগম হয়। ১লা জানুয়ারী ১৯৭২ সরকার বাংলাদেশী টাকার মান কমিয়ে দিয়ে ভারতীয় রুপির সমপর্যায়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সরকার একই সাথে আরো ঘোষণা করে, ১৬ই ডিসেম্বরের আগে পাট ও পাটজাত সংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্যের ব্যাপারে রফতানির সকল চুক্তি বাতিল বলে গন্য করা হবে। দি বাংলাদেশ অবজারভার ২/১/১৯৭২ সংখ্যায় লেখে, "ব্যবসায়ী এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে উল্লেখিত সরকারি তিনটি সিদ্ধান্তই ভারতের স্বার্থে প্রণীত হয়েছে। ভারতীয় সরকারের চাপের মুখেই এ ধরণের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।" এরপর সরকার কর্তৃক টাকার মান কমাবার পর পাটের দাম পুনঃনির্ধারণ করার ফলে সৎভাবে ব্যবসা করার চেয়ে চোরাচালান অনেক লাভজনক হয়ে দাড়ায়। ফলে বাংলাদেশের জীবন সোনালী আশের রপ্তানী হ্রাস পায়। এতে জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রার আয় কমে যায় এবং জাতীয় সঞ্চয়ও কমে যায়। উৎপাদনে ভাটা পড়ে। ১৯৭৪ সালে রহস্যজনকভাবে নাশকতামূলক কার্যকলাপের ফলে অনেক জায়গায় পাটের গুদাম আগুনে পুড়ে যায়। গুদামে ভরা কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য এভাবে পুড়ে যাওয়ার ফলে পাট শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের প্রচন্ড ক্ষতি হয়। গুদামে আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা করতে গিয়ে পাটমন্ত্রী ১৯৭৪ সালে সংসদে বলেন, "আগুন লেগে প্রায় ১৩৯২ মিলিয়ন টাকার শুধু পাটই পুড়ে যায়। পাটজাত দ্রব্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।" প্রচন্ড এই ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে BJMC এবং BJTC সরকারি ভুর্তুকির উপর চলতে থাকে। আজঅব্দি পাট শিল্পক্ষেত্রে সরকার কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে চলেছে। একদিনের সোনালী আশঁ আজ জাতির গলায় হয়ে পড়েছে ফাঁস।

পক্ষান্তরে যে ভারত কখনোই পাট রফতানি করতে পারত না, এমন কি পাটের অপর্যাপ্ত উৎপাদনের ফলে অনেক জুট মিল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতে হয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশের

অভ্যুদয়ের পর অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। ১৯৭৩ সালে ভারত ১ মিলিয়ন বেল পাট রফতানি করে বিদেশের মার্কেটে এবং ১৯৭৪ সালের মধ্যে শুধু যে তাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলগুলোই আবার ফুল শিফটে চালু করা হয় তা নয়; তারা ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তে আরো নতুন দু'টো মিল স্থাপন করে। দুই সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত বর্ডার চুক্তি বাংলাদেশের কোন উপকার না করে চোরাচালানের পথকেই প্রশস্ত করে দিয়েছিল। পরে জনগণের জোর আন্দোলন ও দাবির মুখে সরকার ঐ চুক্তি বছর শেষ না হতেই বাতিল করতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে চারটি ঋণ চুক্তি এবং একটি বাণিজ্য চুক্তি সই করে। কিন্তু চুক্তিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় দিক থেকে গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে চুক্তি অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে ভারতের বিমুখিতা বাণিজ্য ঘাটতির সৃষ্টি করে। ভারত বাংলাদেশের জন্য টাকা ছাপায়। সেই কারণে নকল নোটে সারাদেশ ছেয়ে যায়। ফলে দু'দেশের সরকার বিব্রত হয় জনসম্মুখে। নকল টাকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করে। দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের স্বল্পতা এবং উচ্চ মূল্য জনগণের জীবনকে যতই আঘাত করতে থাকে ততই জনগণ ভারত বিরোধী হয়ে উঠে। কালোবাজারী, মুনাফাখোররা বৈধ ব্যবসার পরিবর্তে ভারতে চোরাচালান করে বেশি ফায়দা লাভের মানসিকতা জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এভাবে একদিকে সরকার ও জনগণ এবং অপরদিকে বাংলাদেশের জনগণ ও ভারত সরকারের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক জাতীয় সম্পদ লুন্ঠন, ভারতীয় আমলাদের জাতীয় প্রশাসনে হস্তক্ষেপ, সীমান্ত দিয়ে অবাধ চোরাচালান, ভারতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ভারতে বাংলাদেশী মুদ্রা ছাপানো, রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি, বাংলাদেশের টাকার মূল্য কমানো, ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে অবস্থান এসমস্ত কারণগুলিই ক্রমান্বয়ে জনগণের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠে বাংলাদেশের জনগণ।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারত সরকার শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে বলে ভুল করে যে বীজ বপন করেছিল তারই প্রতিফল 'ভারতীয় শোষণ' হিসাবে ক্রমশঃ বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মনে শিকড় গড়তে থাকে। বন্ধুবেশে বাংলাদেশকে শোষণ করে, জাতীয় সম্পদ লুটপাট করে, বাংলাদেশকে তাদের পশ্চাদভূমি ও মার্কেটে পরিণত করে তাদের নিয়ন্ত্রণে একটি করদ রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার নীল নকশায় আওয়ামী লীগ তাদের সহযোগী এ ধারণাও প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীর মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠে। তাদের এ ধারণা আরো জোরদার হয় ভারত কর্তৃক সিকিম দখল করে নেয়ার পর। জনগণের এ চেতনার যথার্থ মূল্য না দিয়ে আওয়ামী সরকার এবং ভারত সরকার এ ধরণের বৈরী মনোভাব দূর করার জন্য কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। ফলে এর প্রভাব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয়ে উঠে সুদূরপ্রসারী। এভাবে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই দু'দেশের সম্পর্কে ফাঁটলের সৃষ্টি হয়। সরকারি পর্যায়ে যদিও বা সম্পর্ক বন্ধুসুলভ ও অটুট বলে আখ্যায়িত করা হয় তবুও এটাই সত্যি যে বাংলাদেশের জনগণ ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠে সেই দিন থেকেই যেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ থেকে সবকিছু পাঁচার করতে শুরু করল ভারতে এবং দু'দেশের সীমান্ত খোলা রাখা হল ভারতেরই স্বার্থে।

স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের ভেতর ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান দেশে বিদেশে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশ সরকার দেশ শাসন করতে অক্ষম সে ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় বাংলাদেশ সরকারকে। এতে করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ব্যাপারেও প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তান ও তার স্বপক্ষের শক্তিগুলো এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে আর্ন্তজাতিকভাবে প্রচারণা চালাতে থাকে যে, বাংলাদেশ ভারতীয় দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ভারত অন্যায়ভাবে পাকিস্তানের একটি অংশকে জবরদখল করে রেখেছে। তাদের এ প্রচারণার ফলে এবং বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর অবস্থানের বাস্তবতায়

আর্ন্তজাতিকভাবে অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে অসম্মত হয়। দেশে ফিরে শেখ মুজিব যদিও বা ভারতীয় বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন কিন্তু জনগণ তাদের জাতীয় সম্পদ লুন্ঠন ও অন্যান্য কার্যকলাপে তাদের ভবিষ্যত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠে। মুজিব জনগণের মনোভাব বুঝতে পারেন কিন্তু তার তেমন বিশেষ কিছুই করার ছিল না। মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার পর ভারত সরকারের বাংলাদেশে তাদের সামরিক বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত ও তার বিরুদ্ধে জনরোষের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার কোন যুক্তিই তখন ভারতের পক্ষেও দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। শুধু তাই নয়, 'নন এলাইনড মুভমেন্টে' এর প্রবক্তা এবং পঞ্চশীলা নীতির প্রতিষ্ঠাতা দেশগুলোর একটি হয়ে অন্য দেশে তার সেনাবাহিনী রাখার জন্য বিশ্ব পরিসরে ভারতের ভাবমুর্তিও ক্ষুন্ন হচ্ছিল এবং ভারতকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার চাপে ব্যবস্থা গৃহিত হয় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ভূখন্ড থেকে সরিয়ে নেয়া হবে। কিন্তু এর পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়- প্রবাসী সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তা রদবদল করে স্বাক্ষরিত হবে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি এবং দুই প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত ইশতেহার। চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ধারাও সংযুক্ত করা হবে চুক্তিতে।

এ চুক্তি এবং যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয় দুই প্রধানমন্ত্রীর মাঝে ১৯শে মার্চ ১৯৭২ সালে যখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবের আমন্ত্রনে প্রথমবার বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সফরের সময় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ট্রানজিট ট্রেড এবং বর্ডার ট্রেড বজিয়ে রাখা হবে। দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়গুলোর দু'দেশের কর্মকর্তারা ছয় মাস অন্তর নিয়মিতভাবে মিলিত হয়ে মতবিনিময় ও কার্যপ্রনালী নির্ধারণ করবেন। ঐ সময় 'জয়েন্ট রিভার কমিশন'ও সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি, সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তির আলোকেই প্রণীত হয়েছিল। এভাবেই দেশে ফিরে এসে শেখ মুজিব বাংলাদেশকে পূর্বের সুইজ্যারল্যান্ড বানাবার ঘোষণা দিয়ে মূলতঃ ভারতের একটি করদ রাজ্যেই পরিণত করলেন সদ্যমুক্ত বাংলাদেশকে। তিনি চালনা এবং চট্টগ্রামের বন্দর পরিষ্কারের অজুহাতে সোভিয়েত ও ভারতীয় নৌ বাহিনীকেও আমন্ত্রন জানান। এভাবেই বাংলাদেশকে রুশ-ভারত অক্ষ শক্তির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তানের পরাজয়ের পর উপমহাদেশের আধিপত্যবাদী ভারত নিজেকে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে দাবি করে ঘোষণা দেয়, "দক্ষিন এশিয়া থেকে বিজাতীয় সবশক্তিকে চলে যেতে হবে।" শুধু তাই নয়; উপমহাদেশের জন্য ভারত এক নতুন 'মনরোডকট্রেন' তৈরি করে। ফলে উপমহাদেশের সব ছোট দেশগুলো ভারতীয় আধিপত্যবাদের শিকারে পরিণত হওয়ার আশংকায় ভীত হয়ে পড়ে। ভারতের জন্য এত কিছু করার পরও শেখ মুজিব পানি সমস্যা, সীমান্ত নির্ধারন, সমুদ্রসীমা এবং অর্থনৈতিক জলসীমা নির্ধারণ, সমুদ্রে জেগে ওঠা দ্বীপসমূহের দখল প্রভৃতি মূল সমস্যাগুলোর বিষয়ে ভারতের কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারেননি। শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় জাতীয় রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলেন। এর ফলে জনমনে সন্দেহ হয় শেখ মুজিব ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই ভারতের পরামর্শে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলেছেন।

১৯৭৫ সালের এপ্রিলে ভারত সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে সিকিম দখল করে নেবার পর দক্ষিন এশিয়া উপমহাদেশের জনগণ বিশেষভাবে ভারতীয় আগ্রাসন ও আধিপত্য সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগ বাদে দেশের অন্যসব রাজনৈতিক দলগুলো ভারতের সাথে ২৫ বছরের চুক্তিকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরুপ মনে করে অবিলম্বে ঐ চুক্তি নাকচ করে দেবার দাবি জানায়। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সাত দলীয় এ্যাকশন কমিটি সরকারের কাছে যে ১৫ দফা দাবি উত্থাপন করেন তার প্রথম দাবিই ছিল ভারতের সাথে অসম মৈত্রী চুক্তি বাতিল করতে হবে। তারা অভিমত প্রকাশ করেন বাংলাদেশের ভবিষ্যতের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বজিয়ে রাখার নীল নক্শা অনুযায়ী এ চুক্তি করা হয়েছে এবং সমগ্র

উপমহাদেশের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণকে পাকাপোক্ত করার জন্য এই চুক্তি সহায়ক হবে। পাঠকদের অবগতির জন্য ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির কয়েকটি ধারা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে বোধ করছি।

চুক্তির ৬নং অনুচ্ছেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৮, ৯ এবং ১০নং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সমস্ত অনুচ্ছেদগুলো দুই দেশের পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে। অনুচ্ছেদ ৮-এ বলা হয়, "কোন দেশ অপর দেশের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক জোটে যোগ দিতে পারবে না এবং অপর দেশের বিরুদ্ধে কোন রকম সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারবে না এবং তার সীমানাধীন স্থল, জল এবং আকাশ অপর রাষ্ট্রের সামরিক ক্ষতি অথবা অপর রাষ্ট্রের সংহতির প্রতি হুমকিস্বরূপ কোন কাজে ব্যবহার করতে দিতে পারবে না।" অনুচ্ছেদ ৯-এ বর্ণিত রয়েছে, "প্রত্যেক পার্টিই অন্য পার্টির বিপক্ষে কোন তৃতীয় পার্টিকে যে কোন সামরিক সংঘর্ষে কোন প্রকার সাহায্য দিতে পারবে না। যদি কোন পার্টি আক্রমণের শিকার হয় কিংবা আগ্রাসনের হুমকির মুখাপেক্ষি হয়, তবে অনতিবিলম্বে দুই পার্টিই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেই আক্রমণ কিংবা আগ্রাসনের হুমকির মোকাবেলা করার জন্য। এভাবেই দুই দেশের শান্তি ও সংহতি বজিয়ে রাখা হবে।" অনুচ্ছেদ ১০-এ বর্ণিত আছে, "এই চুক্তির পরিপন্থী কোন প্রকার অঙ্গীকার কোন পার্টিই অন্য কোন দেশ বা একাধিক দেশের সাথে খোলাভাবে কিংবা গোপনে করতে পারবে না।" স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য এ ধরণের কোন চুক্তির কি প্রয়োজন ছিল? ভারত বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র। বাংলাদেশের তিন দিকই ঘিরে রয়েছে ভারত। পূর্বদিকে সামান্য সীমান্ত রয়েছে বার্মার সাথে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। অনেকের মতে পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত এ ধরণের কোন চুক্তির প্রয়োজন ছিল না। যেখানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোন বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা নেই বিধায় কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া চুক্তির ৮, ৯ এবং ১০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য সামরিক সাহায্য চাওয়ার মানে দাড়ায় বাংলাদেশ ভারতের কাছে সম্পর্কের দিক দিয়ে হীনভাবে অনুগত।

চুক্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্কে যে শর্ত ছিল তার ফলে ভারত একটি অগ্রবর্তী শিল্পে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি প্রকৌশলিক সাহায্য, ভারী এবং মাঝারি যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্প ও কৃষি দুই ক্ষেত্রেই অবকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। ভারতের অর্থনীতি ও শিল্প কাঠামো বাংলাদেশের চেয়ে আকারে অনেক বড় ও উন্নত। তারা প্রায় প্রয়োজনীয় সবকিছুই নিজেরা তৈরি করে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট ও দুর্বল। শিল্প ক্ষেত্রেও অনগ্রসর। প্রয়োজনীয় তেমন কিছুই বাংলাদেশে তৈরি হয় না। সে ক্ষেত্রে দুই দেশের মাঝে উল্লেখিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অর্থনৈতিক সহযোগিতার মানেই হচ্ছে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে সব বিষয়ে একটি বাজারে পরিণত করা। অর্থনৈতিক সহযোগিতার নামে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে ভারতের বিশাল অর্থনীতির অঙ্গীভূত করে নেয়া। চুক্তিতে ব্যক্ত ইচ্ছানুযায়ী ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং গঙ্গা অববাহিকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুব্যবস্থা করার ধারার প্রভাব হচ্ছে অনেক সুদূরপ্রসারী। সাহায্য ও সহযোগিতার যে কোন চুক্তি যদি অসম দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়, একটি বৃহৎ এবং ক্ষমতাশালী এবং অপরটি ছোট এবং দুর্বল রাষ্ট্র তাহলে সেই চুক্তির সুবিধা সাধারণভাবেই পাবে তুলনামূলকভাবে যে দেশ বড় ও শক্তিশালী। এ অকাট্য সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের অনেকেই এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু তাদের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগের ভেতরের ভারতপন্থীদের প্ররোচণায় শেখ মুজিব ২৫ বছরের আত্মঘাতী মৈত্রী চুক্তি সই করেছিলেন।

সার্বভৌমত্বের মত বিষয়েও ভারতের সাথে বাংলাদেশের স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে। স্থলসীমা ছাড়াও, ইকোনমিক জোন সম্পর্কে দু'দেশের ভিন্ন অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জলসীমা নির্ধারণ করতেও দীর্ঘ সময় লাগবে। আর্ন্তজাতিক আইন অনুযায়ী আমাদের উপকূলের সমুদ্র সীমানাও এ পর্যন্ত ঠিক

করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৪ সালে বিতর্কিত কিছু জায়গার ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা ভারতের কাছ থেকে পাইনি। সমুদ্রসীমা ও ইকনোমিক জোন সর্ম্পকে ভারতের অবস্থানের ভিন্নতার কারণে যে ছয়টি তেল কোম্পানী ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। তাদের একটি কোম্পানী এ্যাসল্যান্ড অয়েল কোঃ-কে তৈলকুপ খনন করতে বাধা দেয় ভারত। ভারতীয় প্রতিবাদের মুখে ঐ তেল কোম্পানীকে খনন কার্য বন্ধ করে ফিরে চলে যেতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কয়েক জায়গায় নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও কিডন্যাপিং এর মত পদক্ষেপের মাধ্যমে কোম্পানীগুলোকে ভয়ও দেখান হয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার কিছুই করতে পারেনি। বঙ্গোপসাগরের মুখে জেগে ওঠা ভূ-খন্ড বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। হারিয়াভাঙ্গা নদীর মোহানায় দক্ষিণ তালপট্টি নামের এক ভূ-খন্ড জেগে উঠেছে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। মালিকানা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে দুই সরকারের মাঝে সমঝোতা হয় যৌথ সার্ভের মাধ্যমেই তালপট্টির মালিকানা নির্ধারন করা হবে। কিন্তু হঠাৎ করে সমঝোতার বরখেলাপ করে ভারতীয় নৌ বাহিনী একদিন তালপট্টি দখল করে নিয়ে সেখানে ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে দেয় একতরফাভাবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পানি ভাগাভাগির সমস্যা। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অসংখ্য নদী-নালার পানিই হচ্ছে কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের জীবন। দেশের বেশিরভাগ নদ-নদীর উৎপত্তি হয়েছে উত্তরে হিমালয় পর্বতমালায় এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা, যমুনা, গোমতি, মুহুরী, সুরমা, খোয়াই, কুশিয়ারা, পদ্মার প্রবাহের উপরেই নির্ভরশীল বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। আর্ন্তজাতিক নদী গঙ্গার উপর একতরফাভাবে ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ নির্মান করায় জনগণের উপর নেমে এসেছে এক দুর্বিষহ অভিশাপ। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ আজ মরু প্রায়। নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে; একই হারে বাড়ছে লবনাক্ততা। লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশ ও প্রকৃতির পরিবর্তন আজ বাংলাদেশের জন্য এক হুমকির সৃষ্টি করেছে। গঙ্গার পানি বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোকের জীবনসংস্থানের জন্য অতি প্রয়োজন। ফারাক্কা বাঁধের ফলে পানির অপ্রতুলতা দু'দেশের মধ্যে তিক্ততাই বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের জনগণের প্রয়োজনের প্রতি সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে একটি ন্যায়সংগত সমাধান খুঁজে পাবার চেষ্টা না করা হলে বাংলাদেশ-ভারত সর্ম্পকের আরো অবনতি ঘটবে ভবিষ্যতে। ভারত তিস্তা নদীর উপরও বাঁধ দিয়েছে একতরফাভাবে। এ নদীর পানি ভাগাভাগির ব্যাপারেও তারা এখন পর্যন্ত কোন আলোচনা করছে না। বাঁধ দেয়ার ফলে নদীতে পানির প্রবাহ কমে গেছে। ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের চারটি জেলা ক্ষতিগ্রস' হচ্ছে। এছাড়া ভারত খোয়াই, গোমতি এবং আরো প্রায় দশটা নদীতে বাঁধ দিচ্ছে একতরফাভাবে, কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়াই। এর ফলে খরার সময় বা শুষ্ক মৌসুমে কৃষির জন্য যে পরিমাণ পানির প্রয়োজন হবে কৃষকরা তা পাবে না। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং গঙ্গা অববাহিকার পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য ভারত ইতিমধ্যে আবার এক লিংক ক্যানালের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। তারা চাচ্ছেন ক্যানাল খুড়ে ব্রহ্মপুত্র থেকে পানি সরবরাহ করা হবে গঙ্গা ও হুগলী নদীর নাব্যতা বাড়াবার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কোন যুক্তিতেই এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলেই বিশেষজ্ঞরা মত পোষণ করেন। যদিও মৈত্রী চুক্তিতে বলা হয়েছে, "আমাদের দুই দেশের মাঝে সীমান্ত হবে শান্তি ও বন্ধুত্বের অনন্তকালের সাক্ষী।" কিন্তু সামরিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথার ভিন্ন মানেও খুজে পাওয়া যায়।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অংশগুলোকে একত্রিকরণের মাধ্যমে একটি অখন্ড প্রতিরোধ ব্যবস্থা কায়েম করার যে সামরিক উদ্দেশ্য ভারত অনেকদিন ধরে মনে পোষণ করে আসছে তার সাথে স্বাধীনতার পরপর আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচারণা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার 'বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র আর গরীব দেশের জন্য কোন বড় আকারের সেনা বাহিনীর প্রয়োজন নেই' এর একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। ভারতের লক্ষ্য অর্জন করার জন্যই আওয়ামী সরকার এ ধরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। অনন্তকালের শান্তি আর বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব শুধুমাত্র দুই দেশের মধ্যে

সামরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনার সব পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমেই। রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সময় ও বাস্তবতার সাথে পরিবর্তনশীল। তাছাড়া দু'টি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে যেখানে রয়েছে হাজারও সমস্যা সেখানে অনন্তকালের শান্তি আর বন্ধুত্বের গ্যারান্টি পাওয়া অসম্ভবই শুধু নয় অবাস্তবও বটে। বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনীতি যেখানে সম্পুরক না হয়ে অনেকক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতামূলক এবং অসম অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ফলে যেখানে চোরাচালান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে দুর্বল প্রতিরক্ষা বাহিনীর তত্ব কি করে জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত করতে পারে? তথাকথিত অনন্তকালের শান্তিই বা কি করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভ

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক ধরণের সমস্যাই থাকতে পারে। তাই বলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সেগুলোর সমাধান করা যাবে না এমনটা ভাবাও যেমন ঠিক নয় তেমনি দু'দেশের মধ্যকার সব সমস্যা সংঘাতের মাধ্যমেই শুধু নিরসন করা সম্ভব এ ধারণাও সঠিক নয়। দু'দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দূরদর্শিতা, পরিপক্কতা, গতিশীলতা ও মানবিক দৃষ্টিকোন দিয়ে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার আন্তরিকতাই শুধু গড়ে তুলতে পারে বন্ধুত্ব। এর জন্য পোষাকি চুক্তির প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে অবিশ্বাস, দমন নীতি, একে অপরকে ঠকাবার প্রচেষ্টা যেখানে প্রকট সেখানে স্বাক্ষরিত চুক্তিও কোন কাজে আসে না।

“এক নেতা এক দেশ শেখ মুজিবের বাংলাদেশ!”

এ ধরণের শ্লোগান কোনভাবেই গণতান্ত্রিক নয়। হিটলারের জার্মানির ফ্যাসিস্ট নাজিদের অথবা মুসোলিনির ইতালির ফ্যাসিস্টদের শ্লোগানের সাথে এর মিল খুজে পাওয়া যায়। ব্যক্তি পুজাঁ যে কোন নেতার জন্য ভালোর চেয়ে মন্দই ডেকে আনে। ইতিহাসে এ ধরণের বহু নজির রয়েছে।

১৯৭৫ সালের আগে আইনজীবিরা সুপ্রীম কোর্ট এবং হাই কোর্টের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে অনেক বিষয়ে রায় দেন। সরকার কর্তৃক বেআইনীভাবে আটককৃত অনেক রাজবন্দীদের তারা মুক্তিও দিয়েছিলেন সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। রক্ষীবাহিনীর অসামাজিক বেআইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে আইনজীবিরা বিশেষভাবে সমালোচনা করতে থাকেন। কোন একটি কেসের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট রায় দানকালে বলে, “দেশের প্রচলিত সব আইন ও প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন করে জাতীয় রক্ষীবাহিনী তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।” সুপ্রীম কোর্ট অভিমত প্রকাশ করে, “রক্ষীবাহিনী কোন আইনের ভিত্তিতে তাদের কার্যকলাপ জারি রেখেছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।” এ ব্যাপারে **Far Eastern Economic Review** এর জানুয়ারীর ১০তাং ১৯৭৫-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন **Mujib’s Private Army’** এর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আইনজীবিদের সরকার বিরোধী কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে শেখ মুজিব আইন বিভাগের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার জন্য আদেশ জারি করেন। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে তার অধ্যাদেশে বলা হয়, “দেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ দেশের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগ করা হবে। প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে যেকোন বিচারককে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে তার খারাপ ব্যবহার কিংবা অযোগ্যতার কারণে।” ফলে আইন বিভাগ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় প্রধানের ত্রিয়াণকে পরিণত করা হয়।

জনগণের ফান্ডামেন্টাল রাইটস ও মানবিক অধিকার কায়েম রাখার জন্য সুপ্রীম কোর্টের সাহায্য নেবার পথও বন্ধ করে দেন শেখ মুজিবর রহমান। সংশোধিত বিধিতে বলা হয়, “এ আইনের বলে সংসদ গণতান্ত্রিক কোর্ট, ট্রাইবুনাল কিংবা কমিশন গঠন করতে পারবে। এসমস্ত গঠিত করা হবে জনগণের ফান্ডামেন্টাল এবং মানবিক অধিকারগুলো যে সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের পার্ট থ্রি-তে বর্ণিত রয়েছে সেগুলোর নিশ্চয়তা প্রধান করার স্বার্থে।” এভাবেই সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং দেশের সব আইন তার মুঠোয় নিয়ে শেখ মুজিব দেশে কায়েম করলেন স্বৈরাচারী একনায়কত্ব। শ্লোগান তোলা হল, ‘এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ’!

এ শ্লোগান গণতান্ত্রিক শ্লোগান নয়। এটা ছিল নাৎসী জার্মানীর হিটলার কিংবা ইটালীর মুসলিনির শ্লোগান। ব্যক্তি পুজাঁ কোন নেতার ভাবমুর্তিকে উজ্জ্বল করার পরিবর্তে তার চরম ক্ষতিই সাধন করেছে। এর নজির ইতিহাসে অনেক খুজে পাওয়া যাবে।

১৯৭৫ সালের ২১শে জুন রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সারা বাংলাদেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। ১৬ই জুলাই শেখ মুজিব ৬১ জন জেলা গভর্ণরের নাম ঘোষণা করেন। তারা ১লা সেপ্টেম্বর থেকে জেলা প্রশাসনের সর্বময় অধিকর্তা হয়ে বসবেন সেটাই ছিল সরকারি সিদ্ধান্ত। ৬১জনের মাঝে ৪৪ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতারা এবং বাকি ২৭ জন ছিলেন বাছাই করা সাংসদ। জাতীয় সংসদের মধ্য থেকে বাছাই করে নেয়া সদস্যবৃন্দ। নিয়োজিত গভর্ণরদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন প্রাক্তন **CSP** অফিসার, ৬ জন ছিলেন প্রাক্তন **EPCS** অফিসার, কাদের সিদ্দিকী, সেনা বাহিনীর একজন কর্নেল এবং পার্বত্য চট্টগাম থেকে দু’জন উপজাতীয় নেতা।

এই ৬১জন গভর্ণরদের বিশেষ রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। প্ল্যান অনুযায়ী ১৬ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালে প্রশিক্ষণ শেষে তারা যার যার জেলায় গিয়ে তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ

করবেন। তাদের প্রত্যেকের অধিনে দেয়া হবে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অর্ধেক ব্যাটেলিয়ন। তারা সরাসরিভাবে শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের কাছেই জবাবদিহি থাকবেন। রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রতি গভর্ণরের অধিনে একটি পূর্ণাঙ্গ রক্ষীবাহিনীর ব্যাটেলিয়ন নিয়োগ করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল। এসমস্ত গভর্ণরদের অধিনে রক্ষীবাহিনী নিয়োগ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের অধিনস্থ জেলায় বাকশাল বিরোধীদের সমূলে নির্মূল করে মুজিব ও তার পারিবারিক শাসন বংশানুক্রমে বাংলাদেশের মাটিতে পাকাপোক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য বাংলাদেশকে ভারতের পদানত একটি করদ রাজ্যে পরিণত করা।

নির্যাতন ও সংগ্রাম

আওয়ামী বাকশাল শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের আন্দোলন বিশদ পর্যালোচনার দাবি রাখে।

আওয়ামী-বাকশাল বিরোধী আন্দোলনকালে বিভিন্ন বিরোধী দলগুলো সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। তাদের দলীয় অবস্থা, আন্দোলনের স্বরূপ, দলীয় নীতি ও কার্যপ্রনালী, সাফল্য, ব্যর্থতা, দলীয় দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্ন তৎপরতা প্রভৃতি বিষয় এবং তাদের প্রতি জনসমর্থন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারা যাবে এ আলোচনার মাধ্যমে। বিচ্ছিন্নভাবে তাদের দলীয় প্রতিরোধ স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে কতটুকু কার্যকরী ছিল এবং তারা কি কখনও একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে পারত কি না সে সম্পর্কেও জনগণের মনোভাব বোঝা যাবে। সে সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি কেন? ঐক্য গঠন করার পথে বাধা ছিল কোথায়? ঐক্য প্রতিষ্ঠার আদৌ কোন চেষ্টা হয়েছিল কিনা? এসমস্ত বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধ সংগ্রামের মূল উৎপাটন করার ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী সরকার কি নীতি গ্রহণ করেছিল এবং তারা তাদের উদ্দেশ্যে কতটুকু সফলকাম হয়েছিল, এসমস্ত প্রশ্নের জবাব খুজে পাবার মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক পট পরিবর্তনের যুক্তিকতা।

গোড়া থেকেই আওয়ামী-বাকশালী বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী। কিন্তু তার সেই বিরোধিতার আগুন সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে জাতিকে সংগঠিত করতে পারেনি তার দল। '৭১ এর সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভাসানী ন্যাপের দলীয় কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর ভেঙ্গে পড়া সেই দলকে আবার গড়ে তোলার কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করার মত অবস্থা ছিল না মাওলানা ভাসানীর। বার্ধক্যের জড়া এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যই ছিল এর প্রধান কারণ।

আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসনের বিরোধিতা করেছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই জন্ম হয়েছিল জাসদের। ষাটের দশকের প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের একাংশ দাবি জানায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই কায়েম করতে হবে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ। জনাব সিরাজুল আলম খানই ছিলেন এ দাবির মূল প্রবক্তা। জনাব আসম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকেই জনগণের মধ্যে এ দাবির পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা করেন এবং এ দাবির পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই গ্রুপ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদ অধিবেশন বাতিল করে দিলে ১লা মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীন বলে দাবি তোলেন। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রসিদ্ধ বটতলায় জনাব রব সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এর পরদিনেই এক সভায় শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে হঠাৎ করেই জনাব সিরাজ স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে এক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। রব-সিরাজ গ্রুপ মনে করেন ইয়াহিয়া সরকারের সাথে শেখ মুজিবের আলোচনার ফলে জনগণের বিপ্লবী চেতনা নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল; তাই তারা শেখ মুজিবকে সব আলোচনা বন্ধ করে দেবার জন্য অনুরোধ জানান। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত ছাত্রলীগের ঘোষণাপত্র এর সাক্ষ্য দেয়। ঘোষণাপত্রটি প্রকাশ করেছিলেন জনাব মোহাম্মদ ইকরামুল হক, ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধকালে তারা জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী সরকারের প্রতি আস্থা প্রদর্শন না করে জনাব তাজুদ্দিনকে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করার পরামর্শ দেন ও তাদের কথা মেনে নেবার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। ফলে জনাব তাজুদ্দিনের সাথে তাদের মত পার্থক্য দেখা দেয়। জনাব তাজুদ্দিন তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবের উপর এই গ্রুপের প্রচন্ড প্রভাব ছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে

তাজুদ্দিন যখন তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তখন তারা বুঝতে পারলেন প্রবাসী সরকারের অধিনে মুক্তিযুদ্ধ করলে তারা তাদের প্রভাব ও ক্ষমতা দু'টোই হারাবেন। তাই তারা পরবর্তিকালে ভারতীয় সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থা 'র' প্রধান জেনারেল ওবান সিং এর সহায়তায় তাজুদ্দিন সরকারের আওতার বাইরে মুজিব বাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনীর সার্বিক কর্তৃত্ব ছিল তাদের হাতে। ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এ বিশেষ বাহিনী গড়ে তুলতে ভারত সরকার সাহায্য প্রদান করে। যদিও মুজিবের ফিরে আসার পর তার প্রধান্যই বজায় রাখার জন্য আপাতঃ দৃষ্টিতে এ বাহিনী গঠন করা হয়েছে বলে জনগণ মনে করে।

কিন্তু রব-সিরাজ গ্রুপ মুজিব পূজায় কতটুকু বিশ্বাস রাখতেন সেটা ছিল একটা বড় প্রশ্ন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭২ সালেই ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, এর মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেন সর্বদা পর্দার অর্ন্তরালে থাকা নেপথ্যের নায়ক জনাব সিরাজুল আলম খান। বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর সমন্বয়ে ৩১শে অক্টেবর ১৯৭২ সালে মেজর জলিলকে প্রেসিডেন্ট এবং জনাব রবকে সাধারণ সম্পাদক করে আত্মপ্রকাশ ঘটে নতুন রাজনৈতিক দল 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' বা জাসদ-এর। নতুন রাজনৈতিক দলের মূল তাত্বিক গুরু হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব সিরাজুল আলম খান। জাসদের অভিমত ছিল- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন জাতির মুক্তি সংগ্রামের রূপ নিচ্ছিল ঠিক তখনই তাকে বন্ধ করে দেয়া হয় চক্রান্তের মাধ্যমে। স্বাধীনতা সংগ্রামকাল থেকেই জাসদ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে আসছিলেন বলে তারা দাবি করেন। তাদের সেই প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পট পরিবর্তনের পর। তারা দাবি তোলেন জনগণের ৮% সমর্থনপুষ্ট আওয়ামী লীগ জাতীয় সম্পদের ৮৫% লুট করে নিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করছে। (জাসদের ১৯৭৩ সালের ঘোষণাপত্র দ্রষ্টব্য)। জাসদ নিজেকে সত্যিকারের সর্বহারাদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ (**BCL**) এর গণসংগঠক হিসাবে দাবি করে। বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট লীগ গঠন করেন জনাব সিরাজুল আলম খান। এটি ছিল একটি গোপন সংগঠন। যুদ্ধকালীন সময় থেকে জাসদের জন্ম পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৫ সালে সরকারি আদেশে বন্ধ করে দেয়ার আগ পর্যন- বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ কতৃর্ক গণকন্ঠ নামে একটি জনপ্রিয় পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। অতি পরিচিত ও বিখ্যাত প্রগতিশীল কবি আল মাহমুদ ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক।

দেশের অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলোর মতই দেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলি জনগণের কাছে তুলে ধরে জাসদ। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগের ছাত্রফ্রন্ট বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলনে ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে তৎকালীন জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বসমূহের বিশ্লেষন করে জাতীয় বিপ্লবকে বিজয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে দ্বন্দ্বগুলোর অবসান ঘটানোর জন্য বিপ্লবের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে দলিলে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ সমাজতন্ত্রের উত্তরণে তিনটি ধাপ নির্ণয় করে বলে, "স্বাধীনতা সংগ্রামের তৃতীয় ধাপের পরিসমাপ্তি ঘটবে আওয়ামী লীগ ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের সাথে সর্বহারাদের রক্তক্ষয়ী ভবিষ্যত সংগ্রামের মাধ্যমে।" সংসদীয় রাজনীতিকে স্বার্থবাদী মহলের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হাতিয়ার হিসাবে বর্ণনা করা হয়। গ্রামের সামন্তবাদীর অবশেষ, মধ্যসত্বভোগী এবং উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের সর্বহারাদের শত্রু শ্রেণী বলে অভিহিত করা হয় সেই দলিলে। তাদের দলিলে বলা হয় জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার শাসন কায়েম হওয়ার আগে জনগণ বর্হিঃশোষণের শিকারে পরিণত হবে কারণ আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদের পদানত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগের তত্ব অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পরিচালিত হবে মূলতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঋন ও অনুদানের মাধ্যমে। তবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হবে রুশ ও ভারতের দ্বারাও। এজন্য প্রয়োজনীয় শোষণমূলক অর্থনৈতিক সম্পর্কের নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাদের রিপোর্টে বলা হয়- যুক্তিহীন এবং অন্যায়ভাবে ঢাকার পরিবর্তে দিল্লীতে ইন্দো-বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ মনে করে কোন এক পর্যায়ে গণচীন

বাঙ্গালীদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে। এই প্রেক্ষিতে যদিও কম্যুনিষ্ট লীগ আর্ন্তজাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের দ্বন্দ্বের বাইরে নিজেদের রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল; তথাপি চীনপন্থী অন্যান্য সাম্যবাদী লেনিনবাদী জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে বন্ধুসুলভ মনোভাব পোষণ করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছিল রিপোর্টে। জাসদ মুক্তি বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের মাঝ থেকে দলীয় সদস্য রিক্রুট করতে থাকে। সেনাবাহিনীর মধ্যেও তাদের প্রকাশনী লাল ইশতেহার এর মাধ্যমে গোপন সেল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে জাসদ।

২০শে জানুয়ারী ১৯৭৪ সালে জাসদ, বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ এবং জাতীয় শ্রমিক লীগ (জাসদপন্থী) যুক্তভাবে বাংলাদেশের উপর মার্কিন, রুশ এবং ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরোধিতা করে এক হরতালের ডাক দেয়। হরতালের সময় নেতারা শিক্ষক এবং শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানান। তারা বাংলাদেশের সর্বোপরিসরে দুর্নীতি, বিশেষ জরুরী আইন, সরকারের স্বজনপ্রীতি এবং বিশেষভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে পারমিট লাইসেন্স বিতরণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দেশব্যাপী সেদিন পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ১৭ই মার্চের মধ্যে সরকার তাদের দাবি না মানলে তারা ঘেরাও এর হুমকি দেন। ১৭ই মার্চ জাসদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করে। পুলিশ ঘেরাও ভঙ্গ করে। পুলিশের গুলিতে ৩জন নিহত ও ১৪ জন গুরুতরভাবে আহত হন। মেজর জলিল, জনাব রব এবং আরো ৪০জন জাসদ কর্মী আহত অবস্থায় বন্দী হন। গোপন সংগঠনের অন্যান্য নেতাদের সাথে জনাব সিরাজুল আলম খান সেদিন পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে তারা গ্রামাঞ্চলে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। সেদিনের ঘটনাকে অনেকে চরম হঠকারী প্ররোচণা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জাসদ সম্পর্কে তার 'স্বাধীনতার স্পৃহা সাম্যের ভয়' গ্রন্থে লেখেন, "মুসলিম লীগের ঘর ভেঙ্গে একদা আওয়ামী লীগ বের হয়ে এসেছিল। অনেকটা সেই পদ্ধতিতেই আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে বের হয়ে এসেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ। এরা নিজেদেরকে বলছে র‍্যাডিকেল-চরমপন্থী। তাদের তরুণ ও বিরাট কর্মী বাহিনী যে সমাজতন্ত্রের ডাকেই এই দলে এসে যোগ দিয়েছিল তাতে সন্দেহের কোনই কারণ নেই। কিন্তু নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা মনে হয় সমাজতন্ত্রী ছিলেন না। আওয়ামী লীগারই ছিলেন আসলে। তাদের ইচ্ছা ছিল শেখ মুজিবকে নিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠন করবেন। কিন্তু শেখ মুজিব তার অবস্থান ছেড়ে বিপ্লবী হতে রাজি হননি ফলে এরা এগিয়ে গেছেন নিজেদের পথ ধরে। এদের দলের নামের সঙ্গে 'জাতীয়' এর যোগাযোগ আপতিক ঘটনা বলে মনে হয় না। এরাও জাতীয়তাবাদীই ছিলেন। নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থই দেখছিলেন (যার সঙ্গে তাদের নিজেদের ভবিষ্যত ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত)। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের আওয়াজ দিয়েছেন যাতে লোক জড়ো করা যায়, নায়ক হওয়া যায় নতুন প্রজন্মের ও নতুন বাংলাদেশের। শেখ মুজিব যদি আর না ফেরেন তাহলে বামপন্থীদের কি করে মোকাবেলা করা যাবে তার আগাম ব্যবস্থা হিসেবে এরা একাত্তরে মুজিব বাহিনী গড়েছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের রাজনীতি ছিল বুর্জুয়াদের রাজনীতিই। যদিও তাদের আওয়াজগুলো ছিল 'বিপ্লবী'; ফলে তাদের নেতারা জাতীয় পুর্নগঠনের আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকেই সমর্থন দান করে যাচ্ছিলেন এতে বিস্ময়ের কোন অবকাশ নেই।"

তার এই বক্তব্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার ভার রইলো পাঠকদের উপর। জাসদের এবং মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি প্রক্রিয়া থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠে। ভারতীয় সরকার চার খলিফার মাধ্যমে প্রথমে মুজিব বাহিনী, পরে খলিফাদের মূল ব্যক্তিত্ব জনাব সিরাজুল আলম খানের প্রচেষ্টায় জাসদ সৃষ্টি হওয়ায় বিশেষভাবে উপকৃত হয়। শুধু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং 'র' প্রধান জেনারেল ওবান সিং এর সাথেই জনাব সিরাজুল আলম খানের বিশেষ সম্পর্ক ছিল তা নয়; সংগ্রামকালে ১৯৭১ সালে ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণের সাথেও জনাব সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। ১৯৭১ সালে জনাব সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্রনেতারা দিল্লী গিয়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তাজুদ্দিনের বিরোধিতা করে তাদের নেতৃত্বে মুজিববাহিনী গঠন করার প্রস্তাব পেশ করলে ভারত সরকার প্রধান শ্রীমতি ইন্দীরা গান্ধী

ও 'র' প্রধান জেনারেল ওবান সিং তাদের সেই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন মূলতঃ দু'টো সুদূরপ্রসারী কারণে।

প্রথমত: স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে এদের গুটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে।

দ্বিতীয়ত: এ বাহিনীর মাধ্যমে মুজিব ও তার সরকারকে সম্পুর্ণভাবে ভারতীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল করে তুলে শেখ মুজিবকে নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে। অনেকের মতে জাসদকে আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল ভারতের ক্ষমতা বলয়ের একাংশের সমর্থন ও মদদেই। জাসদের মূল্যায়ন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে যেভাবেই করা হোক না কেন একটি সত্যকে কোন ঐতিহাসিকই অস্বীকার করতে পারবেন না- স্বৈরাচারী নির্যাতনের হাত থেকে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জন করার জন্য জাসদের ডাকে হাজার হাজার নিবেদিত প্রাণ কর্মী আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। নেতারা কে কি ভেবেছিলেন সেটা নিশ্চয়ই গবেষণার বিষয়, তবে কর্মীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মধ্যে ছিল না কোন খাঁদ কোন কলুশতা। মুজিবের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তাদের বীরোচিত সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিটি প্রজন্ম। তাদের রক্ত প্রেরণা যোগাবে প্রতিটি বাংলাদেশী দেশপ্রেমিককে তাদের ভবিষ্যত সংগ্রামে। তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার সঠিক মূল্যায়নের মাঝে খুজে পাওয়া যাবে ভবিষ্যতের সঠিক দিক নির্দেশনা। আওয়ামী-বাকশালী শাসনের বিরোধিতা করেছিল বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী (BCPL)। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পিকিংপন্থী ৫টি কম্যুনিষ্ট গ্রুপ একত্রিত হয়ে যে বিপ্লবী সমন্বয় কমিটি কোলকাতায় গঠন করেছিল তাদেরই চারটি গ্রুপের ঐক্যের মাধ্যমে স্বাধীনতার পর সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী। এ পার্টিতে যোগ দেয় (১) কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি (২) পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি র্মাকসবাদী, লেনিনবাদী (৩) খুলনার কিছু কম্যুনিষ্ট কর্মী জনাব মারুফ হোসেন ও ডঃ সাইদুর দাহারের নেতৃত্বে। (৪) জনাব নাসিম খানের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক কম্যুনিষ্ট। এই দলের নেতারা মনে করেন পূর্ব বাংলায় কম্যুনিষ্টরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকায় স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিষ্টদের পক্ষে নেতৃত্ব দান করা সম্ভব হয়নি। তাই তারা কম্যুনিষ্ট ঐক্য গঠন করে অসম্পূর্ণ বিপ্লব সম্পুর্ণ করার আহ্বান জানান। 'একটি ঐক্যবদ্ধ কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে তুলুন' শিরোনামের একটি ইশতেহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট সংহতি কেন্দ্র এ আহ্বান ঘোষণা করে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এরই ফলে গঠন করা হয় বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী (BCPL)। এই পার্টি প্রকাশ্য এবং একই সাথে গোপন কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। BCPL বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন নামে একটি ছাত্রফ্রন্টও গঠন করেন। শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য গঠন করা হয় বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন। পরবর্তিকালে বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী দল তাদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (UPP) গঠন করেন। ১৯৭৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জনাব নাসিম আলী খান এই রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করেন। UPP এর রাজনৈতিক দর্শনের সাথে BCPL এর দর্শনের মিল পাওয়া যায়। দু'টো দলের মতেই বাংলাদেশের জাতীয় বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে যায় ১৯৭১ সালে, যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল বুর্জুয়াদের হাতে। দু'দলই অভিমত পোষণ করে সোভিয়েত রাশিয়া একটি সংশোধনবাদী দেশ এবং রাশিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ করা। ভারতকে ও দু'টো দলই সম্প্রসারণবাদী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে। কিন্তু দু'টো দলই ভারতের নকশাল আন্দোলনের সমালোচনা করে এবং আন্দোলনকে শৃঙ্খলাহীন হঠকারীতা বলে আখ্যায়িত করে। (দ্রষ্টব্য: বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমল সেনের ১৯৭২ সালের ঘোষণাপত্র।) UPP এর তুলনায় তাদের গণসংগঠন শ্রমিক এবং ছাত্রসংগঠন অনেক দুর্বল ছিল ফলে দেশব্যাপী তাদের আবেদনও ছিল কম এবং অঞ্চলভিত্তিক। যদিও BCPL এর বেশিরভাগ নীতি আদর্শের সাথে মিল ছিল দেবেন সিকদার ও আবুল বাশারের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) মূল সমন্বয় কমিটির অপর

একটি দলের তবুও সামান্য কয়েকটি বিষয়ে মত পার্থক্যের ফলে এ দলটি **BCPL** এর সাথে ঐক্য স্থাপন করা থেকে বিরত থাকে। এই দলটি বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানী নির্যাতনকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল কারণ বলে আখ্যায়িত করে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের উপর ভারতের আধিপত্যকেই মূল দ্বন্দ্ব বলে নির্ধারণ করে। এ দলের নেতৃবৃন্দ অভিমত পোষণ করেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তি সংগ্রামে গণচীনের কম্যুনিষ্ট পার্টিই মুখ্য ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে **BCPL** নেতৃবৃন্দের অভিমত ছিল কিছুটা নমনীয়। এ ব্যাপারে বিশদভাবে জানতে হলে পাঠকদের ১৯৭২ সালে 'পূর্ববাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টির আবেদন' নামে সলিডারিটি সেন্টার অফ বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত ইশতেহারটি এবং 'বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলুন' **BCPL** কর্তৃক প্রকাশিত ইশতেহার দু'টি পড়ে দেখতে হবে। সিকদার-বাশার গ্রুপের পার্টিকে পরে বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি বলা হয়। এই দলও প্রকাশ্য এবং গোপন রাজনীতি পাশাপাশি চালিয়ে যাবার পক্ষে ঘোষণা দেয়। এ দলেরও নিজস্ব ছাত্র, শ্রমিক সংগঠন গঠন করেন নেতৃবৃন্দ। কৌশলগত কারণে এ দলটি সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের পক্ষে মত দেয়। **BCPL** এবং **UPP** দু'টো দলই প্রকাশ্য গণসংগঠন এবং পার্টি সেল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এদের ছাড়া আরো চারটি রাজনৈতিক সংগঠন শুধুমাত্র তাদের গোপন পার্টি সেল এবং গোপন সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে তাদের তৎপরতা চালাতে থাকে। এই চারটি দলের দু'টো দল ছিল **EPCP(ML)** থেকে বেরিয়ে আসা কম্যুনিষ্টদের নিয়ে গঠিত। তৃতীয় দলটি ছিল পূর্ববাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা একটি অংশ। পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে সিকদার-বাশারও গঠন করেছিল **BCP** (বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি)।

চতুর্থ দলটি ছিল এসমস্ত দলগুলোর উৎস থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে গড়ে ওঠা সর্বহারা পার্টি (পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি)। বিপ্লবী নেতা সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন। এ আন্দোলন থেকেই পরে গড়ে উঠে সর্বহারা পার্টি। ১৯৭৫ সালে মুজিব সরকারের হাতে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এই পার্টির নেতৃত্ব দেন। এ দলের নেতৃত্বে মূলতঃ ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ। যার ফলে তাদের বিপ্লব সম্পর্কীয় গবেষণা এবং প্রচারণা অন্যান্য পার্টিগুলোর চেয়ে ছিল ভিন্নতর এবং অধিক কার্যকরী। লাল ঝানডা এবং সংবাদ বুলেটিন ছাড়াও এ পার্টি নিয়মিতভাবে তাদের কেন্দ্রিয় কমিটির বৈঠক সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর লিখিত দলিল প্রকাশ করতো। বেশিরভাগ দলিলগুলো জীবিত অবস্থায় ছিল সিরাজ সিকদারের নিজ হাতে লেখা। তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সুবিন্যাস্ত এবং প্রচার মাধ্যম ছিল অতি উত্তম। দেশের যে কোন প্রান্তে তাদের প্রকাশিত দলিলপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। সর্বহারা পার্টি অন্যান্য প্রগতিশীল ও বিপ্লবী পার্টিগুলোর সাথে একমত হয়ে মত প্রকাশ করে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে তড়িঘড়ি করে শেষ করে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসীন হওয়ায় বাংলাদেশের বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আওয়ামী লীগ সরকারকে তারা ভারতের পুতুল সরকার বলে অভিহিত করেন। পার্টির প্রকাশনায় প্রচারিত হয় স্বাধীনতার পর ভারতের সহায়তায় ক্ষমতায় বসে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে লুটপাট করে ভারতীয় নীল নক্শা বাস্তবায়নের পরিল্পনাকেই সহায়তা করতে থাকে। সর্বহারা পার্টি মনে করে রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টির মাধ্যমে ভারত বিকল্প প্রথায় বাংলাদেশে তাদের স্বার্থ বজিয়ে রাখার উদ্দেশ্য তাদের সামরিক অবস্থানকেই অটুট রাখে। বাংলাদেশ আওয়ামী সরকারের অধিন মার্কিন ও রুশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের হুমকির সম্মুখীন বলেও সর্বহারা পার্টি জনগণকে হুশিঁয়ার করে দেয়। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের আহ্বানকে সর্বহারা পার্টি ট্রটস্কাইডপন্থী হঠকারীতা বলে আখ্যায়িত করে। কারণ জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করার আগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয় বলে পার্টির তাত্বিকরা অভিমত প্রকাশ করেন। তারা আরো বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে জাতীয় বিপ্লব সম্পূর্ণ করা অসম্ভব কারণ তারা চারিত্রিকভাবে জাতীয় বুর্জুয়াদের প্রতিনিধি নয়, তারা হল সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের দালাল এবং মুৎসুদ্দি শ্রেণীর প্রতিনিধি। সর্বহারা পার্টির মতে বাংলাদেশের অসম্পূর্ণ বিপ্লবকে ধাপে ধাপে চুড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের। বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার জন্য

সর্বহারা পার্টি কৃষক, শ্রমিক, নিপীড়িত জনতা, বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গোষ্ঠির সমন্বয়ে গড়ে তোলে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট নামে একটি গণসংগঠন। সর্বহারা পার্টির তাত্বিকরা মনে করেন যেহেতু বাংলাদেশ তিন দিক দিয়েই ভারত বেষ্টিত, সেক্ষেত্রে বিপ্লবের জন্য বাইরের কোন সাহায্য পাওয়া হবে অতি দুঃষ্কর। তাই বিপ্লবীদের নিজস্ব শক্তির উপরই মূলতঃ নির্ভরশীল থাকতে হবে। সিরাজ সিকদারের গতিশীল নেতৃত্বে এবং সর্বহারা পার্টির বিপ্লবী কার্যক্রমে মুজিব সরকারের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। অসীম সাহসিকতার সাথে সর্বহারা পার্টির সদস্যরা একের পর এক সফল অভিযান চালিয়ে সরকার ও তার বিভিন্ন বাহিনীকে নাজেহাল করে তুলতে সমর্থ হয় অতি অল্প সময়ে। তাদের সাফল্যে দেশজুড়ে সাড়া পড়ে যায়। তরুণ সমাজের কাছে পার্টির ভাবমুর্তি বেড়ে যায়। ফলে তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে দলে দলে জনগণের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকজন সর্বহারা পার্টিতে যোগ দিতে শুরু করে এবং পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে। এত অল্প সময়ে এ ধরণের জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব হয়নি। জাসদের চেয়েও ক্রমান্বয়ে সর্বহারা পার্টি বেশি জনসমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়।

১৯৭৩ সালের ২রা ডিসেম্বর এক বিবৃতির মাধ্যমে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী সর্বহারা পার্টিকে সমর্থন জানান এবং সিরাজ সিকদারকে অভিনন্দন জানান। ১৯৭৫ সালের ২রা জানুয়ারী শেখ মুজিবের নির্দেশে রক্ষীবাহিনীর শেরেবাংলা নগরের ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় অকথ্য নির্যাতনের পর বীর মুক্তিযোদ্ধা সর্বহারা পার্টির শীর্ষ নেতা জনাব সিরাজ সিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

এভাবে চরম নিষ্ঠুরতায় পার্টি নেতা সিরাজ সিকদারের হত্যার পর অর্ন্তদন্ধ ও নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে এবং সরকারি নিষ্পেষণে সর্বহারা পার্টির সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দেয়। জাতীয় পরিসরে পার্টির প্রভাব ও কর্মকান্ড এবং শক্তি ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে। নেতৃত্বের দুর্বলতায় কর্মীরা উদ্দামহীন হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। ফলে জনগণও হতাশ হয়ে সন্দিহান হয়ে উঠে সর্বহারা পার্টির ভবিষ্যত সম্পর্কে। এভাবেই সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর সাথে সাথে হঠাৎ করে জেগে উঠা গণমানুষের মুক্তির এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় স্বৈরশাসনের আগ্রাসী জিঘাংসায়।

জনাব তোহা ও শরদীন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বে সাম্যবাদী দল গোপন সংগঠন হিসেবে মুজিব বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করছিল। মূলতঃ পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি ভেঙ্গে ১৯৬৮ সালে পিকিংপন্থী হিসাবে এ দলের উৎপত্তি ঘটে। স্বাধীনতার পর এই দল তাদের মুখপত্র গণশক্তির মাধ্যমে দাবি জানায়, ‘‘বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা অর্জন করেনি। রুশ-ভারত চক্র মুলতঃ বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের প্রতিষ্ঠিত মুজিবের পুতুল সরকারের মাধ্যমে।’’ সর্বহারা পার্টির মতই সাম্যবাদী দল বাংলাদেশের রক্ষীবাহিনীকে পরোক্ষভাবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর উপস্থিতি বলেই মনে করে। কারণ এই রক্ষীবাহিনী সর্বোতভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যেই গঠন করা হয়েছিল। সাম্যবাদী দল অভিমত প্রকাশ করে যে, রক্ষীবাহিনী তৈরি করে তাদের সাথে যৌথভাবে ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতায় সরকার বিরোধী আন্দোলনগুলোকে দমন করার চেষ্টা করছে। মুজিব তার সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্যই রক্ষীবাহিনী তৈরি করার ভারতীয় প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। সর্বহারা পার্টির মতই সাম্যবাদী দল একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করে এবং একই সাথে গোপনে গণবাহিনী সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রধানত: ঢাকা, রাজশাহী, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর জেলাতেই সাম্যবাদী দল তাদের ঘাটি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে ঐ জেলাগুলোতেই তাদের সরকার বিরোধী সংগ্রাম তীব্রতা লাভ করে। প্রগতিশীল এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো স্বৈরাচারী সরকার বিরোধী ভূমিকায় মূল্যবান অবদান রাখলেও দলীয় মতবিরোধ ও পার্থক্য নিয়ে দলগুলো একে অপরের প্রকাশ্য সমালোচনা ও নিন্দা করতে থাকে।

সাম্যবাদী দল সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে **BCPL** এবং **BCP** এর অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করে। **BCPL** এবং **BCP** আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের উপর নির্ভরশীল বলে দাবি করলে সাম্যবাদী দল এ বক্তব্যের সমালোচনা করে বলে, "আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের পুতুল সরকার। তাকে ভারতের উপর নির্ভরশীল বলা মানেই হচ্ছে তাদের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখা।" সর্বহারা পার্টির সমালোচনা করে সাম্যবাদী দল বক্তব্য দেয়, "সাম্যবাদী দল সর্বহারা পার্টিকে একটি হঠকারী গ্রুপ বলেই মনে করে। এ গ্রুপ আত্মম্ভর সিরাজ সিকদারের ভুল প্ররোচণায় পরিচালিত হচ্ছে।" সর্বহারা পার্টি বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বন্দ্বকে প্রধান্য দেওয়ায় সাম্যবাদী দল সর্বহারা পাটির্কে তাত্বিক দিক দিয়েও ভুল এবং দুর্বল বলে দাবি তোলে। সাম্যবাদী দলের তত্ব অনুযায়ী, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের পক্ষ এবং বিপক্ষ শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বই মূল দ্বন্দ্ব। (দ্রষ্টব্য: সাম্যবাদী দলের প্রকাশিত ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দলিল- 'বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল', ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ- 'এক ভূইফোড় বিপ্লবী সম্পর্কে') একইভাবে জাসদ সম্পর্কে সাম্যবাদী দলের অভিমত ছিল, আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা তরুণ নেতাদের সমন্বয়ে ভারতই এই সংগঠন গড়ে তোলায় সাহায্য করে। মুজিব ও তার অনুগতদের নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যেই ভারত জাসদ গঠনে মদদ যোগায়। (দ্রষ্টব্য: এপ্রিল-মে ১৯৭৩ সালে গণশক্তিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় 'ইস্পাত কঠিন শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকে গড়ে তুলুন') জনযুদ্ধ **EPCP (ML)**-এর মুখপাত্র হিসেবে সেই সময় আব্দুল হকের সম্পাদনায় বের হত। পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) থেকে বেশিরভাগ কর্মীকে বের করে এনে জনাব তোহা এবং শরদীন্দু দস্তিদার সাম্যবাদী দল গঠন করলেও জনাব আব্দুল হক পার্টির নাম পরিবর্তন না করার প্রশ্নে অটল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) বা **EPCP (ML)** নামে একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এই গ্রুপটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অস্বীকার করে। স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারতীয় আগ্রাসন বলে **EPCP (ML)** আখ্যায়িত করে। জনযুদ্ধের মাধ্যমে আগ্রাসী শক্তির কবল থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করার লাইন গ্রহণ করে **EPCP (ML)**। এই দল তাদের নাম না বদলানোয় সরকারি নির্যাতনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। গ্রুপের বেশিরভাগ সদস্যই মারা যায় নতুবা কারাবন্দী হয়। জনাব আব্দুল হককে বন্দী অথবা হত্যা করার সরকারি সব প্রচেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়।

পূর্ব বাংলা কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) **EBCP (ML)** এবং সাম্যবাদী দলের মধ্যে তত্বগতভাবে খুব একটা ব্যবধান দেখা যায় না। তবে **EBCP (ML)** কৃষক ও সামন-বাদের অবশেষের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্বকে বেশি প্রধান্য দেয়। এ দল ভারতের বিপ্লবীদের সাথে একত্রিতভাবে বিশেষ করে নকশালীদের সাথে সম্পর্ক রেখে বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার ঘোষণা ব্যক্ত করে। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য প্রায় বিপ্লবী সব দলগুলোর কাছে নকশাল আন্দোলন একটি চরমপন্থী হঠকারীতা বলেই গৃহিত হয়। নকশালীদের দলগুলো বিশ্বাস করতেও রাজি ছিল না। আত্রাই, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে **EBCP (ML)** বিশেষভাবে তৎপরতা চালায়। প্রগতিশীল ও বামপন্থী তৎকালীন প্রায় সবগুলো দলই একমত প্রকাশ করে যে, বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লব ১৯৭১ সালে অসমাপ্ত থেকে যায়। মুজিব সরকার বাংলাদেশের উপর রুশ-ভারতের আধিপত্য কায়েমে সহযোগিতা করে। মুজিব সরকার মূলতঃ ভারতের একটি পুতুল সরকার।

উপরের পর্যালোচনা থেকে একটা জিনিসই পরিষ্কার হয়ে উঠে। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রবীণ নেতৃত্বের চেয়ে নবীনরাই সংগ্রামে অভূতপূর্ব গতিশীলতার সৃষ্টি করে। তারা যখন জনসমর্থন পেয়ে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত তখন পুরনো নেতৃত্ব তাত্বিক কচকচানি নিয়েই ব্যস্ত থেকে নিজেদের দেউলিয়াপনা প্রকাশ করে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাদের দেউলিয়াপনা, নেতৃত্বের লোভ, ভাববাদী তাত্বিক চর্চা, সন্দেহপ্রবণতা, একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস প্রভৃতি কারণেই স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা উল্লেখযোগ্য বা আশানূরূপ অবদান রাখতে ব্যর্থ হন। ফলে ক্রমশঃ তারা জনগণ থেকে সম্পূর্ণভবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। নবীন প্রজন্ম তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। নেতাদের

অনেকের ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকলেও এটাই বাস্তব সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের ব্যর্থতা সাফল্যের চেয়ে অনেক বেশি সেটাও আজ প্রমাণিত। অতীতে বিভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ যখন সত্যিকারের মুক্তির জন্য পরিস্থিতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তখন নেতাদের ভ্রান্ত ও নেতিবাচক ভূমিকার ফলেই ইপ্সিত লক্ষ্য জনগণ অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণ সর্বদা চলেছে আগে আর নেতারা চলেছেন পেছনে। আমাদের দেশের জনগণের সংগ্রামের ঐতিহ্যে এটাই বড় সত্য। লজ্জাকর হলেও এ সত্যকে খন্ডাবার উপায় নেই। সত্যকে মিথ্যা করার প্রচেষ্টা থেকেছে সর্বকালে। কিন্তু সত্যকে মেনে নিয়ে এগুলেই আশানূরূপ ফল পাওয়া যায়। মিথ্যার আবর্তে পাওয়া যায় শুধু বঞ্চনা ও প্রতারণা। ব্যর্থতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে না চাইলে নতুন প্রজন্মকে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে চলতে হবে ভবিষ্যতপানে। তারুণ্যের উদ্দাম ও গতিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে প্রবীণরা নবীনদের পথ থেকে সরে দাড়ালেই অক্ষুন্ন থাকবে তাদের সম্মান। আর যদি তারা স্বার্থপরের মতো নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টা করেন তবে তারুণ্যের প্লাবনের দুর্বার স্রোত তাদের টেনে নিয়ে ফেলবে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। সময়কে হাতের মুঠোয় পুরে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে সময়ের দাবিকে মেনে নেয়াটাই হবে নেতাদের জন্য কল্যাণকর। আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন সচেতন মুক্তিযোদ্ধারা। সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা হয়ে উঠেছিলো অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার এবং লুটপাটের বিরোধিতার সংগ্রামে উজ্জ্বল প্রতীক। তারা লড়েছেন বিভিন্ন অবস্থানে থেকে। কেউ তাদের নিজস্ব এলাকায় জনগণের প্রতিরোধ গড়ে তোলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন, কেউ সংগ্রাম করেছেন রাজনৈতিক বিরোধী দলের ছত্রছায়ায়। কেউ বা লড়েছেন সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে। তাদের এ বহুমুখী ধারার সচেতনাকে সাংগঠনিক রূপ দেবার প্রচেষ্টা না থাকায় প্রতিরোধ দানা বেধে উঠতে পারেনি। যারা রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছিলেন দলীয় গন্ডির মাঝেই তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের মাঝে যে দেশপ্রেম জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে সুষ্ঠ নেতৃত্বের অধিনে সুসংহত করতে পারলে বাংলাদেশের বর্তমান অনেক সংকটের অবসান হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদিও তৎকালীন সরকার তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশকে বাড়তি সুবিধাদী দিয়ে হাত করার চেষ্টা করেছিলেন তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা তাদের সততা, দেশপ্রেম সামান্য প্রলোভনে কারো কাছে বিক্রি করে দেননি।